আগুনের ফুলকি

— বিপ্লবী উপন্যাস —



বিমলপ্রতিভা দেবী

প্রকাশক
হারাধন চট্টোপাধ্যায়
১১, যদুভট্টাচার্য্য লেন,
কলিকাতা।

মূল্য—চার টাকা আট আনা

প্রিণ্টার
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪২-এর পরের যুগ; প্রেসিডেন্সী জেলের অভ্যন্তর। তখনো আগুন জ্বলছে ভারতবর্ষেব নানা স্থানে। সে আগুনের ছোঁয়াচে কয়েদখানার কালো অন্ধকারেও আমাদের মুখ লাল হয়ে উঠছে।…

জন-যুদ্ধের যুগ। চাবুক-খাওয়া শ্বাপদের মত দেশ তখন চাপা গর্জনে মুখর। কারা-অভ্যন্তরে আমরা জনযুদ্ধ-বিরোধীরা আক্রোশে অস্থির হয়ে উঠেছি।

যুদ্ধের ভারতবর্ষ, সে ভারত দুর্ভিক্ষের—নৃশংস মৃত্যু ও সহিংস সংগ্রামের।

এ সংগ্রামের সঙ্গে আকৈশোর নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলাম। স্বপ্ন দেখেছি বিপ্লবের, নূতন ভারতবর্ষের। আজও সে ভারতবর্ষের জন্ম হয় নি, গন্তব্যের দূরত্ব হ্রাস পায় নি; কিন্তু জানি, তা হবে! সূর্যোদয়ের দূরাগত ছটায় উদয়-বনানীর কালো সীমান্তে আলোক-তীর্থের চাপা পদধ্বনি, বুঝি প্রতীক্ষা অবসানের 'মহৎ মুহূর্ত' আর দূরচারী নয়!…

মাটিতে ফশল ফলল না, খরার উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু সার্থক-সংগ্রামের কল্পনা করতে ইতস্তত: করি নি। ভারতের মাটিতে যা ঘটবে বলে ভাবি, বইএর পাতায় তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করলাম। সময় ছিল প্রচুর। সাহিত্য করার খানিকটা দুঃসাহস আর কি!

কিন্তু শাসনের দাপট ছিল অসহ্য; ভারতের মাটিতে এমন ঘটনা কখনো যে ঘটা সম্ভব, ব্রিটিশ-সিংহ তা ভারতেও পারত না। "নতুন দিনের আলো"র পরিণাম এ বইটারও না ঘটে, তাই অন্য একটা দেশ বেছে নিয়ে কিছুটা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলাম।

এই পট-ভূমিকায় বিপ্লবীর উচ্চাশাকে সারা-জীবনের স্বপ্নকে এই

ক'টা পাতায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছি, সাহিত্যিক হবার জন্য নয়, না-লিখলে পারতাম না বলে।...

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি দিন, আমাদের অবিরামভাবে আরেকটা মহা-যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। শ্রমিক বিপ্লবের যদি দেরী ঘটে, এ যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না। গত যুদ্ধের যে-বীভৎসতা কল্পনা করতে পেরেছি, এ বইএর পাতায় যুদ্ধের সে বীভিষীকার রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। আজ ভাবি, সত্যকার ভয়াবহতার তুলনায় তা কত তুচ্ছ! আবার যুদ্ধ কি হবেই?

সর্দার একবল সিং বেদীর অর্থ-সাহায্য না পেলে এ-রাই যে কখনো ছাপাখানার দরজা ডিঙোতে পারত না, সেটা কৃতক অন্তরে স্বীকার করি।

মুদ্রাকরের ত্রুটীর জন্য বইখানির কয়েক জায়গায় ছাপায় ভুল আছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন নিজগুণে, তাঁরা যেন সে ত্রুটী ক্ষমা করেন।

কলিকাতা

সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আগুনের ফুল্‌কি

সিরিন বন্দিনী। ইরাণের কঠিন কারার ছোট্ট একটি ঘরে বসে ভাবে। ভাবে, অতীত, বর্ত্তমান আর আশা-উদ্দীপনায় ভরা ভবিষ্যতের কথা! হাতে খাতা, কলম—কিন্তু এত চিন্তা মনে ভিড় করে জড়ো হয় যে লেখার কথা ভুলে যায়!

পাহাড়ের উপর কারাগার। কঠিন উঁচু পাচিল দিয়েও প্রকৃতির দানকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। শোভা এখানে অনুপম। পাহাড়ের গায়ে পথ। সে-পথে পথিকের আনাগোনা, জন-মানবের গতি এবং ক্রিয়া, অনেক-কিছুই ঐ পাঁচলিকে ফাঁকি দিয়ে দেখা যায়,—মানুষের নির্ম্মমতাকে তুচ্ছ করে' কঠিন পর্ব্বত যেন দরদে অনিন্দ্যসুন্দর!

কারাগারের ঠিক উপরেই পল্‌টনের ছাউনি। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সূচনায় এই সুরক্ষিত ছাউনি বহুদেশী সেনা এবং অফিসারে পূর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের দরুণ এদেশে দুর্য্যোগের মাত্রা সীমাহীন। সহরে লোকের বসতির মাঝে ফৌজের আস্তানা। সহরে, গ্রামে, সহর-তলীতে, সেনা-শিবির, এয়োরোড্রোম, সৈন্যদের জন্য প্রমোদ-ভবন, পানশালা—সর্ব্বত্র ট্রাক্, লরী, জীপের গেরাজ। পথে-ঘাটে পলটনের ভিড়—প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণাঙ্গ নানা জাতির নানা বর্ণের সামরিক, বেসামরিক জনতায় সমাকীর্ণ। সর্ব্বত্র সাজ-সাজ রব। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজের জাল প্রায় গুটিয়ে এসেছে,—সর্ব্বশ্রেণীর লোকই

আজ যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আজ যুদ্ধের বিভীষিকা-ভরা কাজে জড়িয়ে পড়েছে। ধাপ্পাবাজ সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদীব দল নানা-রকম ফাঁকা বুলি আওড়াতে কসুর করছে না,—দেশের গৌবব, জাতির সম্মান, শৌর্য্য-বীর্য্য, দেশ-রক্ষা, দেশের জন্য প্রাণ দিলে স্বর্গে অমর আসন হবে" এমনি সব ঘোরালো ফাঁপানো বুলি নানা রকমে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি রাখছে না। যুদ্ধের যোগান দিতে দেশের ধন-সম্পদ, আহার্য্য, বসন সব জিনিষই মহার্ঘ্য, তুর্লভ। যান-বাহন সামরিক প্রযোজনে সীমাবদ্ধ। নিত্য-প্রযোজনীয় সামগ্রী সঙ্কুচিত, জীবন-যাত্রার মান একেবারে সব নীচের স্তরে নেমে গেছে। এর উপব প্রতিপক্ষের বিমান-আক্রমণে ঘর-বাড়ী ছারখার। সহর ছেড়ে গ্রামে পালিযে অর্থ-উপার্জ্জনে উপায়হীন হয়ে ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যু বরণ করা—এমন যাদের অবস্থা, তাদের কাছে এ সব অর্থ-হীন বুলির কোন মূল্য নেই। দেশ-রক্ষা কার জন্য? আত্মরক্ষা কে করবে? আত্ম বলতে কার কি আছে? সাম্রাজ্য-বাদী আর ধনতন্ত্রীর জনগণকে নিঃস্ব করে' শোষণ করে' ধনতন্ত্রীরা তাদের সাম্রাজ্য-লিপ্সা স্বার্থ-পরিতৃপ্তির জন্যই তো এই নরমেধ যজ্ঞ সুরু করেছে। সে নরমেধ-যজ্ঞে আহুতি—এই সব অপ্রস্ফুট-মুকুল জীবন্ত মানুষে সৈন্য সমাবেশ—বৃথা এরা যাবে ধ্বংশ হয়ে!

প্রতিদিন তার ক্ষুদ্র সেলের জানলার ধারে সিরিন বসে থাকে, আর শিবিরের পানে চেয়ে ভাবে ঐ সব ভাগ্যহতের কথা।

এ শিবিরটা খুব বড় এবং বহুদূর-প্রসারিত। শিবিরের মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। অফিসার আর সৈন্যরা সেখানে ব্যায়াম করে, কুচকাওয়াজ করে, নূতন সৈন্য এলে তাদের শিক্ষা দেয়,—প্যারেড, ড্রিল, ব্যাণ্ডবাদ্য সবই এখান থেকে দেখতে শুন্‌তে পাওয়া যায়।

কোন কোন দিন ওরা মার্চ্চ করে রণবাদ্য বাজিয়ে, যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে পথ চলে। সে সময় সিরিন আর স্থির থাকতে পারে না। তার সমর-কামী মন নেচে ওঠে ঐ সমর-বাদ্যের সুরে,—মার্চ্চের তালে-তালে পড়তে থাকে তার পা। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন আর দেহ ভেঙ্গে ফেলবার জন্যই এ সব বন্ধন, কঠিন শৃঙ্খলে জড়িত এই বন্দীশালা সব যায় স্তব্ধ হয়ে। দিনের পর দিন বসে সে দেখে ঐ পল্টনের ছাউনিগুলো। একদিকের সারে আছে ছোট ছোট অনেকগুলো তাঁবু, রং সাদা ধপধপে, মনে হয় যেন ছোট ছোট পাল তোলা নৌকো। কখনও মনে হয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওগুলো হাওয়ায় দুলছে। সিরিন মনে মনে বলে, মাঝিরা পাল তুলেছে, নৌকো যেন উজান বাইতে পারে! আবার বলে, দরিয়ায় ঢেউ উঠেছে, ও ঢেউ যেন তীরে এসে লাগে। সিরিনের ভাবালু মন, শিল্পী মন এই দারুণ শুষ্কতায় ভরা বাস্তবকে সরস এবং সহনীয় করবার জন্য কল্পনার উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে তাকে আবেগোচ্ছল করে তোলে। পর-মুহূর্ত্তেই রুক্ষ নির্ম্মম বাস্তব মূর্ত্তির কশাঘাত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—মানুষের পূর্ণতা খুঁজে পেতে এবং সৌন্দর্য্য বিকশিত করতে এখনও বহু বহু যুগ বাকি আছে!

শিবিরের সৈন্যদের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখতে পায়। ভোরের বিউগলের সঙ্গে ওরা উঠলো, মুখ ধুয়ে, বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে মাঠে চললো ব্যায়াম করতে, তার পর আবার বিউগ্‌ল্‌ বাজলো, নিজের নিজের তাঁবুতে ঢুকে খাবার বাসন হাতে সব বেরিয়ে এলো, একসঙ্গে পা ফেলে খাবার তাঁবুতে (লঙ্গর-খানায়) হাজির হলো—চা আর ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বাসনগুলো জড়ো করে নিয়ে ধুতে এলো, ধোয়া শেষ হলে আবার একসঙ্গে পা ফেলে তাঁবুতে ফিরে গেল! পোষাকগুলো ঠিক করে পরে নিয়ে একসঙ্গে পা ফেলে চললো ডিউটিতে। ঘড়ির কাঁটার মতো চলেছে। অফিসাররা ঘড়িতে

দম দিয়ে চলেছে। কথা বলার দায বড নেই, হাত নেড়ে আঙুল ঘুরিয়ে, যতদূর-সম্ভব রক্ত-মাংসের মানুষগুলোকে যন্ত্রের পর্য্যায়ে ঠেলে দেওয়ার ভাব! অফিসারদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে শত শত লোক ছুটলো প্রাণ দিতে, প্রশ্ন বা বক্তব্যের বালাই নেই। যা হবার তা কাগজে-কলমে হয়েই আছে। কথার কি প্রয়োজন? এরা যন্ত্র-মানব. এদেরই দানবী উদ্দেশ্যে ও চালনায় যন্ত্র দানব হয়েছে, না হলে যন্ত্রের সৃষ্টি মানবের সুসভ্য সমাজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, উৎপাদন, এ-সবের প্রযোজনীয়তায়, বিজ্ঞানের গরিমাময় অবদানে,—কিন্তু কোথায সে প্রকৃতিজয়ী জ্ঞানী, হৃদয়বান, সুসভ্য মানুষ?

সৈন্য-শিবিরের দুটো ভাগ ভারী চমৎকার। একদিকে অফিসারদের তাঁবু, অপরদিকে সৈনিকদের (Privale) তাঁবু। মাঝখানে একটা মাঠের ব্যবধান। অফিসারদের তাঁবুগুলো যেমন বড় বড়, তেমনি সজ্জিত। তাদের একটা করে বসবার তাঁবু, তাতে সোফা, কৌচ, টেব্‌ল্, ভালো আলো, পিযানো, রেডিও, গ্রামোফোন্ ইত্যাদি; অন্যটায় ডাইনিং টেব্‌ল্, চেয়ার, ভালো ভালো ডিনার-সেট, ফ্রিজিডেযার ইত্যাদি; শোবার তাঁবুতে খাট, গদি, শুভ্র কোমল বিছানা, টিপয, চেযার। এই সজ্জিত তাঁবুতে সজ্জিত অফিসাররা এসে ভাল ভাল বাথ-টবে স্নান করে, বারে বারে পোষাক বদলি করে, ড্রয়িংরুমে বসে রেডিও শোনে, পিযানো বাজায, গ্রামোফোন বাজায, তারপর মদ খেয়ে হৈ-হৈ করে' নাচে। লেডি-ফ্রেণ্ডরাও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয। অফিসার-মেশের নিমন্ত্রণে তারা আসে মহার্ঘ্য খাবার. তারা খায়। পরিচ্ছন্নতার জন্য বেযারার অভাব নেই। কলিংবেল টেপবা মাত্র হাজির হচ্ছে। অপর দিকে সাধারণ সৈন্যদের মেশ, এবং তাদের আসবাব আর খাওযা-পরার ব্যবস্থা।

যারা সাধারণ সেনা, তাদের তাঁবুগুলো ছোট ছোট,—সেই ছোট

তাঁবুর এক-একটায় চারজন করে’ থাকে। এক-একখানা করে দড়ির খাট বা ক্যাম্প-খাট, কম্বল, আর বিছানার চাদর, একটী করে বালিস, গায়ে দেবার জন্য একই ছাঁচের সার্ট, ট্রাউজার, হাফ-প্যাণ্ট এবং টুপি এনামেলের একটি করে’ থালা, একটি মগ আর চামচ-কাঁটা। খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পাওয়া যায় না; তবে সিরিনের কাছে খবর আসে—ঐ সব আর্মি্‌তে যারা কাজ করে সমর-শ্রমিক (Army Labour)—তারা সাজা পেয়ে জেলে আসে, তাদের কাছে ওদের অবস্থা এবং ব্যবস্থার সব কথা শোনে। আবার কত-কত মেয়ে ধরে জেলে পাঠায়—তারা ‘অফিসার আর সৈন্যদের সঙ্গে বে-আইনী মেলা-মেশা করেছিল, এই অভিযোগ। আইনী মেলা-মেশার কোনো রীতিই যুদ্ধের সময় নেই,—তবু মাঝে মাঝে ওদের ধরে’ এনে আইনের সাফাই গাইতে হয়। বাধ্য-করানো অন্যায়ের জন্য এই সব অপরাধীদের সাজার ব্যবস্থা আছে। তারা জেলে এলে সে কথাও সিরিন নানা প্রশ্নে তাদের কাছ থেকে শোনে।

সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনতন্ত্র-বাদীদের বিচারের প্রহসন এবং শ্রেণী-পার্থক্য—কোথাও কোনো ক্ষেত্রে বাদ পড়ে না। ঐ যে শ্মশান-ঘাট স্বরূপ পল্টনের শিবির—সবাই যেখানে এসেছে শুধু মরতে, সেখানেও এই দারুণ শ্রেণী-পার্থক্য খুব বেশী, সাধারণ জীবন-যাপন-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য, বা মান-মর্য্যাদার প্রভেদ নয়, খাওয়া পরা শোয়া বসা এমন কি চিকিৎসালয়েও (Military hospital) সাধারণ সৈন্যে এবং অফিসারে ভয়ানক পার্থক্য।

অফিসারদের মেশটা সিরিনের সেল থেকে বেশ কাছে—তাই সেখানে যা হয়, তার অনেক-কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সাধারণ সেনাদের মেশের সব-কিছু দেখা যায় না। অফিসারদের সারাদিনের কাজ আর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এবং তাদের মিলিটারী জীবনের নীতির সঙ্গে

কোথায় কতটুকু যোগ, কোথায় বা সামঞ্জস্য-হীনতা, তাও বেশ খানিকটা বোঝা যায়।

কোন কোন দিন অফিসাররা সাত-আটজন মিলে একসঙ্গে এসে বসবার তাঁবুতে জড়ো হয়, নিজেদের মধ্যে তর্ক-আলোচনা করে' টেবিল চাপড়ায়, খবরের কাগজ এনে একজন আর-একজনকে কোন লেখা দেখিয়ে কিছু যেন প্রমাণ করতে চায়। কখনও বড় একখানা ম্যাপ নিয়ে কজনে তর্ক করে,—কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই মদ খেয়ে প্রথমটা খুব হৈ-চৈ, তারপর ঝিমিয়ে পড়া। খাবার সময় হলে উঠে যাওয়া। বেশীর ভাগ দিনই ওরা ডিউটি থেকে ফেরে খুব অবসন্ন ম্লান-মুখে—কোন কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে এতটুকু উৎসাহ ফোটে না। অবসাদে ক্লান্তিতে ভরে থাক্‌লেও লৌহ-নিয়মানুবর্ত্তিতায় (Iron discipline) এদের চলন, বলন, ধরণ, পরিচ্ছদ সব-কিছুর মধ্যে দৃঢ়তা ও সতেজ ভাব ফোটাবার চেষ্টা প্রচুর, কিন্তু অন্তরে জীবন্ত অভিব্যক্তির অভাব প্রতিমুহূর্ত্তে ধরা পড়ে।

মদ খেয়ে যখন হৈ-হৈ করে নাচে, তখন মনে হয় নিজেদের ভোলাচ্ছে, নিজেদের নিরুৎসাহতা ভঙ্গ কর্‌তে যখন উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে, সে হাসি যেন মরিয়ার হাসি! সিরিনের বুকে এসে সে-হাসি বাজে! সে ভাবে, ঐ উল্লাসের কৃত্রিমতায় নিজেদের ওরা ভোলাতে চাইছে! কেন এমন করে ছলনা কচ্ছে নিজেদের?

প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর মধ্যে এদের জীবন-চিত্র সিরিনের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওরা যেদিন বেশীক্ষণ ছুটিতে থাকে (off duty), সেদিন কাছাকাছি বাড়ীর ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে কত খেলা করে, গ্রামোফোন বাজিয়ে তাদের সঙ্গে নাচে, বল নিয়ে ছুটোছুটি, তাদের সঙ্গে দৌড়তে গিয়ে পিছিয়ে পড়া, আর শিশুরা বিজয় গোবকে

উল্লসিত হয়ে হাততালি দেয়,—বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওরা তখন বুকে তুলে নিয়ে আদর করে। বিজয়ের উল্লাস শিশুদের প্রাণ মাতায়! যোদ্ধার বেশে শিশুদের বুকে তুলে নিয়ে যখন চুমো খায়, সিরিন ভাবে, এরা কি পারবে নরহত্যা করতে? এই উছলিত প্রাণের আবেগ যে শুধু মানুষকে বুকে টেনে নেবারই অভিব্যক্তি—মানুষের বুকে গুলি মারা, বেয়নেট চালানো, যাদের ওই মন, তাদের দ্বারা তা কি সম্ভব? আতিশয্য চাপতে না পেরে সিরিন বলে ওঠে, ওগো নিষ্ঠুর-বজ্রাঘাতে সুন্দরকে-ভেঙ্গে-চলার দল, তোমরা যে ধ্বংশ-পথে যাত্রা সুরু করেছ, সে-পথে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া, মিথ্যা জীবন-দীপ নির্ব্বাণ করাই তোমাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে! তোমাদের মধ্যে নবীনের এত আদর, শিশুর প্রাণের পরশে মেতে ওঠার এত পুলক কোথায় চাপা পড়ে থাকে গো? ঐ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তর-বৃত্তিকে বাইরের কৃত্রিম লৌহ-বর্ম্মে কেন ঢেকে রেখেছো যোদ্ধা? জীবনের সংগ্রাম কুৎসিতের সঙ্গে, অমঙ্গলের সঙ্গে! মনুষ্য-সমাজের অকল্যাণকে পরাভূত করবার জন্য যোদ্ধার অস্ত্র-ধারণের প্রয়োজন! না, না, তোমরা ফিরে দাঁড়াও ন্যায়ের পথে, সুন্দরের বিকাশে যুগের অগ্রদূত তোমরা, নবীন তোমরা, জীবন্ত সাহসী মানুষ-মন দিয়ে একবার চিন্তা করো, ধ্বংশ জীবনের নিয়ম নয়, সৃষ্টি এবং জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধিই হলো মানবী সংস্কার! কে শোনে কে বোঝে তার আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরা অন্তরের বাণী? দূরত্বের এত বড় ব্যবধান, পথের বৈপরীত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ওখানে পৌছুবেনা তোমার মর্ম্মগাথা।

ঐ অফিসার-ক্যাম্পের-একদিনকার এক ঘটনা সিরিনের জীবনে কত বড় ইতিহাস রচনা কর্‌লো……

বড়-অফিসারদের ক্যাম্পে মাঝে মাঝে নানা কাজ নিয়ে সাধারণ সেনারা আসে এবং অফিসাররা না থাকলে বাইরে দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা

করে। সেদিন বিকালে একজন সৈনিক একতাড়া কাগজ নিয়ে অফিসারের খোঁজে এসেছে। অফিসাররা সে সময় ডিউটি থেকে ফেরে নি,—সৈনিক অত্যন্ত অবসন্ন দেহে বিষণ্ণ মুখে বাইরে অপেক্ষা কচ্ছে,—মাঝে মাঝে পথের পানে চাইছে। সিরিন এ সময় দাঁড়িয়েছিল তার জানলায়—হঠাৎ সৈনিকের নজর পড়লো সিরিনের দিকে। তার চাহনিতে এমন করুণ ব্যথা মাখানো যে সিরিনের বুকে তার ছোঁয়া এসে লাগলো। কি হয়েছে ঐ সৈনিকের? কেন ও এমন মলিন মুখ? মেয়েদের দেখলে সাধারণতঃ ওরা সহজ ভাবের আভাস দেয় না, কিন্তু এর কি হয়েছে? অফিসাররা কি কোন অপরাধে সাজা দিয়েছে? তাতেই বা কি? সে তো ওদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা! তবে কি ওর বাড়ী থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে প্রিয়জনের খবর? তাদের জন্য ওর প্রাণে ব্যথা বেজেছে? যদি প্রিয়জন থাকে, আজ তো সে ওর কাছে স্বপ্নের মত! ওর নিজের কোন অমঙ্গল ঘটেনি তো? ওদের আবার অমঙ্গল? প্রতি মুহূর্ত্ত যারা জীবনকে মৃত্যুর সামনে ধরে চলেছে তাদের আবার মঙ্গল-অমঙ্গল!

সিরিনের মনে অসংখ্য প্রশ্ন উচ্ছল হয়ে উঠছে! মন চীৎকার করে বল্‌তে চায়, তোমার কি হয়েছে সৈনিক? সৈনিক-কথাটা মন থেকে ছিটকে ভাষায় উৎসারিত হলো…সিরিনের অজ্ঞাতে। লোহার গরাদের উপর লোহার সরু তার দিয়ে মোড়া সেলের জানলা—সেই জানলার ওদিকে দাঁড়িয়ে সৈনিক সিরিনের বিহ্বল-করা রূপ দেখছিল অনিমেষ নেত্রে। দেখতে দেখতে সে ভুলে গেল তার কঠিন নিয়মের কথা! সিরিনের স্বরে চমকে সে যা দেখলো, তাতে বিভ্রান্ত হলো। ঠিক এই সময় তার অফিসার এসে পাশে দাঁড়িয়েছে—সে বুঝতে পারে নি। অফিসারের ডাকে ভয়ে সে বিচলিত হলো। সৈনিকের কাছে প্রশ্নের উত্তর বুঝি পাবে

এমনি অদ্ভুত কল্পনা কচ্ছিল সিরিন! যদি সৈনিকের দুঃখের কিছু প্রতিকার সে করতে পারে, এমন তার মনের ব্যাকুলতা!

অফিসার সিরিনের জানলার দিকে তাকালো। সৈনিক তাতে ভয় পেলে, ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে চাইলে। সিরিনের তখন বুঝতে বাকী রইলো না যে একজন কারা-বন্দিনীর দিকে সৈনিকের এভাবে চেয়ে থাকা অন্যায়,—তার জন্য অফিসার যদি শাস্তি দেয়? এ চিন্তা সিরিনকে চঞ্চল করলে। এ-জানালা থেকে সে অন্য একটি জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে-জানলা থেকে অফিসারদের তাঁবু আরো কাছে, আরো স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে গিয়ে সে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো, অফিসার কি বলে! মনে হলো সে চীৎকার করে বলে,—আমিই অপরাধী। সৈনিকের কোন দোষ নেই! সত্য, ওর কি দোষ? বন্দীশালার জানলা দিয়ে একজন বন্দী-মেয়েকে দেখে ওর মনে কৌতুহল জেগেছে, এইমাত্র। এ তো খুব স্বাভাবিক! কিন্তু ওদের যে অস্বাভাবিক নিয়মের কড়াকড়ি। অফিসার সিরিনের দিকে চেয়ে বোধ হয় তার মনের কথা বুঝলো. সৈনিকের হাত থেকে কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে তাকে দুটো-একটা কি বল্লে, তারপর বেশ প্রসন্ন মুখেই বিদায় দিলে। সৈনিকও সহজ ভাবে চলে গেল।

সিরিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—তার রঙিন ওড়নাখানা উড়ে পড়েছিল জানলার জালে—তাও এতক্ষণ হাত নেড়ে সরাতে পারেনি। নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সৈনিকের কি হবে! তাকে চলে যেতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সিরিন জানলা থেকে নেমে এলো।

কারাগারের দোতলায় ছোট ছোট অনেকগুলো সৈল—সব গুলোই খালি পড়ে আছে। একটি সেলে সিরিন একা থাকে, আর কোন রাজ-বন্দিনী নেই। ওকে সম্পূর্ণ একা থাকবার আদেশ দেওয়া

হয়েছে। তার কারণ ওর অপরাধ ভীষণ। কারাগারে ওর উপর খুব কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সাধারণ কয়েদী-মেয়ে যারা, তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা বা কথা কওয়া বারণ। ঐ সব সাধারণ কয়েদী-মেয়েরা কাজ করে দেবার জন্য সিরিনের কাছে যখন আসে, সে সময় প্রহরী আসে সঙ্গে, পাছে সিরিন ওদের মনে তার বিষ-মন্ত্র প্রচার করে, কিংবা ওদের অভাব-অভিযোগ নির্য্যাতনের মর্ম্ম বুঝিযে গোলমালের সৃষ্টি করে। একা রাখা এবং কড়া পাহারার কারণ, সিরিনকে কারাগারের প্রাচীর এবং লৌহদ্বার ও তালা-চাবির বন্ধনে আটকে রেখেও তার বাইরের কাজ আটকে দিতে পারবে—এমন ভরসা কর্ত্তৃপক্ষের নেই।

সিরিন সাম্যবাদী-সঙ্ঘের নেত্রী এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়িকা। এই সংগঠনের প্রসার এবং বিপ্লব-প্রস্তুতির অপরাধে তার কঠোর কারাদণ্ড হয়েছে। কিন্তু হায, এত রকমের সতর্ক কড়া পাহারায় কি সিরিনের বিপ্লবী ক্রিয়া বন্ধ করতে পেরেছে? যে প্রাণ মুক্ত, যে প্রাণ ব্যাপৃত জীবন্ত, তার গতি রোধ করবার মত কোন বন্ধন কোনো কালে আবিষ্কার হবার নয়। সাধারণ অপরাধ চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, অসৎ কর্ম্মে নারীদের প্রবৃত্ত করানো, জালিযাতী—এমনি যত রকম সামাজিক অপরাধের সৃষ্টি সমাজ-ব্যবস্থাপকরা করেছেন, সে সব অপরাধে সাজা পেযে যারা এখানে এসেছে, তাদেব সঙ্গে সিরিনের কথা বলা নিষেধ। তবু এরা প্রত্যেকেই গোপনে আসে সিরিনের কাছে। এরা কঠোর শাস্তিও পেয়েছে, এর জন্য—জেল-কর্ত্তৃপক্ষ নির্ম্মমভাবে এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। এদের উপর হৃদয-হীনতার চরম ব্যবস্থা কারাগারে আরও আছে। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের বিকৃত ব্যবস্থা জেলের মধ্যে অত্যন্ত উৎকট ভাবে প্রত্যক্ষ হয। মনুষ্য-সমাজের এই জঘন্য দিকটাকে দেখবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সমাজ আর রাষ্ট্রের দুর্নীতির নগ্ন রূপ এই

সব কয়েদীদের অপরাধে ফুটে ওঠে। সিরিনের কাছে গোপনে যখন তারা আসে, সে খুব দরদ-ভরে তাদের জীবনের কথা, তাদের অপরাধের বিস্তারিত কাহিনী শুন্‌তে চায়। সিরিনের দরদে ভরা অন্তর, মধুর ব্যবহার কয়েদীদের মুগ্ধ করে। অকপটে এরা সব কথা বলে অতি সহজে এবং সরল ভাবে। সিরিন অপরাধের মর্ম্ম বুঝিয়ে দেয়। কত জন আছে স্বামীকে খুন করে এসেছে, সন্তানকে হত্যা করেছে, কত-কত আত্মীয়দের বিষ খাইয়েছে, চুরি করেছে, বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জ্জনে সুবিধা না কর্‌তে পেরে টাকার জন্য মানুষ খুন করেছে, এ-সব ধরণের অপরাধীদের কাহিনী সিরিন লিখে রাখে, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোঝায় কতভাবে। তারা তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত বা অপরাধ যে করেছে, তাও সম্যক উপলব্ধি করতে পারতো না। সিরিনের কথায় তারা বোঝে, আক্ষেপও করে। রবিবারে ছুটি থাকে, প্রহরীরা সিরিনের কাছে লুকিয়ে ওদের আসতে দেয়। সেদিন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা থাকে না। এই নিষ্ঠুর যন্ত্রে তৈরী হৃদয়হীন প্রহরীগুলো পর্য্যন্ত সিরিনের গুণে মুগ্ধ এবং তার অনুগত। তাই তারা অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে ভালো কথা শুনতে এবং বুদ্ধি নিতে এদের ছেড়ে দেয় সিরিনেব কাছে।

আজ যখন অধীর দরদে সিরিন ঐ সৈনিকের জন্য ছুটে যাচ্ছিল শেষের জানলার কাছে, সে সময় একজন কয়েদী দেখেছিল তার ব্যস্ততা। সিরিনকে কিছু পরে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে—কি হয়েছিল দিদি আজ তোমার? কেন অমন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি কচ্ছিলে?

সিরিন বল্লে,—জগত-জোড়া দুঃখ-হাহাকারে মানুষের বুক ভরা—এমন একজন মানুষের দুঃখের বোঝা বুঝি বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম রে।

কয়েদী এ কথার অর্থ বুঝলো না, তবে দিদির দরদের ভাবটুকু

বুঝলো,—কারণ তাদের ওপর কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচার যখন প্রবল হয়, শাস্তি-ভোগের মধ্যে শাস্তির বোঝা যখন আরও, বাড়ে সিরিন তখন কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে, আইনের নজীর দেখিয়ে তাদের শাস্তি লাঘব করে,—বলে, যতটুকু শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তার উপরও যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়ে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থ পূর্ত্তি করছে। এসব বিষয়ে সিরিনের আইনের নজীর দেওয়া যুক্তিতে তাদের শাস্তি কমে, দাবীও পূরণ হয়।

রাজনৈতিক অপরাধের গুরুত্বে সিরিনের উপর কঠোরতার ব্যবস্থা বেশী, কিন্তু সিরিন শিক্ষিতা, জ্ঞানী এবং বিখ্যাত অভিজাত বংশের মেয়ে, —তার ব্যক্তিত্বের খ্যাতি এবং গাম্ভীর্য্যে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাকে যথেষ্ট সম্মান করে। আইনের যুক্তি তার অকাট্য, তাই জেলের তথা-কথিত আইনের উপ-আইন সৃষ্টি করে বেআইনী ভাবে যে সব অত্যাচার আর জুলুম চালানো হয়, সিরিন তাদেরই কোড্‌ বার করে তা খণ্ডন করে—তাতে এদের অত্যাচারও কিছু কমে।

আজ সৈনিকের ঐ ছোট ঘটনাটি সিরিনের মনকে বেশ নাড়া দিলে। সন্ধ্যাবেলা সেলের তালা-বন্ধ করে প্রহরী চলে গেলে চেয়ারখানাকে জানলার ধারে নিয়ে সিরিন ভাবতে বসলো। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ দানবী যুদ্ধের ধ্বংশ-লীলা চলেছে, আর এই সব সুন্দর জীবনগুলো হচ্ছে তাতে বলি। সৈন্যরা অকারণে ধ্বংশ হয়ে যাবার জন্যই জন্মেছিল? শুধু ধ্বংশ হতে এবং ধ্বংশ করতেই ওদের সৃষ্টি? না, তা হতে পারেনা! মানুষ বহুযুগ ধরে অশেষ মূল্য দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে তুলেছে! কত উচ্চে আজ মানুষের স্থান! সে মানুষ বর্ব্বর পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে যাবে? কত দিন মানুষ এ-সব সহ্য করবে? কতদিন সুসভ্য মানুষ মানবিকতার বিপরীত গতিতে মনুষ্য-সমাজকে চলতে দেবে? এর চির-অবসান অচিরে করতে হবে, নাহলে জ্ঞান এবং শিক্ষা মিথ্যা।

দিন কেটে যায়, চিন্তার শেষ হয় না। রাত বয়ে যায় বাকী—সে রাতে আরও রাশীকৃত চিন্তার বোঝা মাথার উপরে ভারী হয়ে ওঠে। ঘুমের কণাও সেখানে স্থান পায় না। কত রাত এমনি ভাবে কেটে যায়। আজও তাই হলো।

পরের দিন দুপুরে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে সিরিন চেয়েছিল সেই অফিস তাঁবুটার দিকে। মনে পড়ছিল কালকের ঘটনা। হাতে ছিল একখানা বই। পাতা আর ওল্টানো হচ্ছে না। কি মনে করে একবার জানলায় উঠে দাঁড়াতেই চোখ পড়লো সামনের তাঁবুর উপর। তাঁবুর দরজার দুদিকে সুন্দর দুটো কালচে লাল রংএর সিলভেটের পর্দা—রেশমের দড়ি দিয়ে বাঁধা—তার মাঝখানে ইউনিফর্ম-আঁটা সেই অফিসার—সিরিনের জানলার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরিন চমকে উঠলো, এ সত্য ? না, ছবি ? মানুষ এত সুন্দর ! এ যেন সেই গ্রীক ভাস্করের খোদিত মর্ম্মর মূর্ত্তি ! তবে কি সিরিনের বন্দী-জীবনের ভাব-প্রবণতার স্বপ্ন এ ? না, তার অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যপ্রিয় মনের কল্পনার ছবি ? তাও নয় ! কবির আঁকা পদ্মপলাশ-লোচনকে ম্লান করে ঐ অপরূপ চোখ দুটি থেকে যে জ্যোতি ঠিকরে আস্‌ছে, তাতে কতখানি জীবন্ত প্রাণ !

এমনি ভাবে তার চিন্তার স্রোত বয়ে চললো। সৈন্যাধ্যক্ষ কি ভেবে তাঁবু থেকে বাইরে এসে আবও ভালো করে সিরিনকে দেখতে লাগলো ! তার গতির ভঙ্গী কি চিত্তাকর্ষক ! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুকান্তি, প্রতি মাংশ-পেশীতে স্বাস্থ্যের সুগঠিত ছন্দ লীলায়িত। মুখের গড়ন নিখুঁত ! শিল্পীর হাত কোথাও একটু কাঁপেনি। ভ্রূদুটি আঁকবার সময় শিল্পী এত সতর্ক ছিল যে কপাল আর চোখ দুটির সৌন্দর্য্যকে শুধু চিহ্নিত করতে কতটুকু সরু আর কতটুকু মোটা টান হলে ভ্রূ-যুগে মাধুরী ফোটে, শিল্পীর

সেদিকে ছিল একাগ্র লক্ষ্য। কপাল থেকে কানের পাশ পর্য্যন্ত ঘন ঢেউ-খেলানো চুলগুলি কতটুকু উঠলে-নামলে আর্য্য ললাটের পরিচয় দিবে সৌন্দর্য্য-পিপাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ঠিক তেমনি ভাবেই চুলগুলি ওঠা-নামা করছে।

বহু সাধনায় কোন্ শিল্পী এই অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে? সিরিন দেখচে আর দেখচে, এ দেখার শেষ নেই। এ সৌন্দর্য্য-সাধনার সমাপ্তি হবে না। আঁখি অতৃপ্ত হয়ে দেখতে লাগলো।

কতক্ষণ কেটে গেল, সিরিন বুঝতে পারেনি। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁবুর সামনে একটু পায়চারি কচ্ছে, সিরিন যেন বলতে চাইলে, কেন বীর, সৌন্দর্য্যকে এত বেশী বাড়াবার জন্য আবার প্রসাধন-কৌশল কেন? কোন প্রয়োজন ছিল না। দীপ্ত বর্ণের যে বঙ্কিম আভা তোমার গাল দুটীতে ফুটে রয়েছে, তার উপর ক্ষৌর-নিপুণতায় সবুজ রেখা টেনে সবৃন্ত গোলাপকে লজ্জা দেবার কি প্রয়োজন ছিল? রেশম-গোছা ঢেউখেলানো চুলগুলিকে সযত্ন বিন্যাসে মাথার উপর দিকে তুলে দিয়ে বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন সুশ্রী কপাল-খানির গড়নের কৃতিত্ব দেখাতে কে বলেছিল?

সিরিনের ছবি আঁকা শেষ হবে না। দেখার শেষ নেই, ছবি আঁকা শেষ হবে কেমন করে? স্বপ্ন-ভাঙ্গার মত সে একটু এগিয়ে গেল জানলার আরও কাছে,—অফিসার ডিউটিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, একবার তাঁবুর ভিতরে গেল, টুপিটা হাতে নিয়ে আবার তখনি বেরিয়ে এলো। এসে হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালো—তারপর সিরিনের পানে চাইলে। সিরিন ভাবতে লাগলো, ঘুম তো ভাঙ্গলো, এবার স্বপ্নের ঘোর নিয়ে থাকি।

ধীরে ধীরে মানস-সুন্দর কঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বান চলে গেল। সিরিন কি করবে? মানস-পটে ছবি আঁকবে? কিন্তু তার জন্য আর একটু

কিছুর দরকার। সে হলো জীবনের তুলি। নয়তো সিরিন যে 'শুধুই ছবি' আঁকতে পারে না। বাস্তব তার কাছে জীবন্ত গতিশীল, জীবন-তুলি তার চাই।

দিন এই ভাবেই দৃষ্টি-বিনিময়ে কাটলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা জানলার কাছে চেয়ার নিয়ে বসেছে। এই ছোট্ট জানলাটি দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সিরিন সংযোগ রেখেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে তার বাইরের ঐটুকু আলো দেখতে দেখতে, কখনও বা পাহাড়ের গায়ের সবুজ কেয়ারী-করা গাছগুলোর শোভা দেখে মোহিত হয়, কখনও মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের খেলার রূপান্তরিত দৃশ্যে একঘেয়ে দিনগুলোয় সে নূতনত্ব খুঁজে পায়। কোনও সময় বা গভীর চিন্তায় উদাস হয়ে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আজ তেমনি এক গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিল তাঁবুর দিকে, হঠাৎ চমক-ভাঙ্গানো দৃষ্টি-বিনিময়ে সে চিন্তা খণ্ডিত হলো। অনিন্দ্য সুন্দর সৌন্দর্য্য বিকশিত করে তার মানস-প্রতিমা মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। সিরিন তাড়াতাড়ি জানলায় উঠে দাঁড়ালো, এতখানি দূরত্বকে যতটা নিকট করা যায়, এই ভাব। সময় চলে যাচ্ছে, দেখবার তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে। যুগ যুগ ধরি চেয়ে থাকলেও যে তিরীপত নাহি হোয়। প্রকৃতিও এ সুখে অন্তরায়—সন্ধ্যাদেবীর অকরুণ ম্লান ছায়া তার দর্শনাকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হতে দিলে না।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁবুর মধ্যে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে সেইখানে কৌচটার উপর বসলো, সিরিন যাতে দেখতে পায়। সিরিনের সেলটিতে মিটমিটে কেরোসিনের আলো জ্বালা হলো। তাতে কিন্তু অফিসারের দেখবার সুবিধা হচ্ছিল না, তাই বারে-বারে উঠে তাঁবুর সামনে এসে সে দাঁড়াচ্ছিল। বুঝতে পেরে সিরিন সিগারেট ধরালে এবং মাঝে-মাঝে সেটা নিভিয়ে আবার নূতন করে দেশলাই জ্বালিয়ে মুখের ওপর আলো ফেলছিল।

অফিসারও প্রত্যেক বার লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেটে লাগিয়ে সিরিনকে জানিয়ে দিচ্ছিল—দেখতে পাচ্ছি।

প্রকৃতিকে ফাঁকি দেবার জন্য কৃত্রিম বাঁধনের সৃষ্টি আর সেই কৃত্রিম বাঁধনকে ফাঁকি দেবার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ নব-নব কৌশলের সৃষ্টি করে। কারাগারে সেটা খুব বেশী সক্রিয় হয়।

রাত্রি আটটা বেজেছে। অফিসারের ডিনারের সময় হলো। আরও চার-জন অফিসার এলো অফিসার-মেশের তাঁবুতে। হাতের ঘড়ির পানে চেয়ে আর একবার সিরিনকে দেখে অফিসার তার সঙ্গীদের সঙ্গে ভিতরের তাঁবুতে চলে গেল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় সেলের কপাটে তালা বন্ধ হয়েছে। খাবার এনে ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। সিরিনের এ সব খেয়াল ছিল না। অফিসার চলে যাবার পর অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়ে সে ভাবছিল, আমার এ কি হলো! রূপের মোহ কেন আমায় এমন চঞ্চল করলে! এর কি হওয়া উচিত?

মন তখনি বলে উঠ্‌লো, কেন নয়? সিরিনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য-রুচির মন তাকে রূপের পিপাসা দিয়েছে, সে-পিপাসা কেন অনুচিত হবে?

বিশ্বের এই যে অবর্ণনীয় অপরূপ সৌন্দর্য্য, তা'র মাঝে মানুষ হলো প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই মানুষই আদি কাল থেকে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে' প্রকৃতিকে জয় করে সভ্যতা, জ্ঞান, শিক্ষা, সাহস, সুরুচি অর্জ্জন করেছে। প্রকৃতির বুক থেকে সৌন্দর্য্য চয়ন করে' কবি আর শিল্পীর গরিমায় মানুষ ভূষিত হয়েছে। মানুষের এই অমর প্রতিভা শিল্পীর তুলির রেখায়, কবির কাব্যে, ভাস্করের কারুকলায় প্রতিভাত হচ্ছে। মানুষের এমন দুর্ল্ভ সাধনার সম্পদ যে সৌন্দর্য্য, তাকে বাস্তবে

এমনভাবে প্রত্যক্ষ করে যদি মুগ্ধ না হয়, তবে সিরিনের সৌন্দর্য্য-সাধনা মিথ্যা! কিন্তু শুধু এই বাহ্যিক ভুবনমোহন রূপই কি সিরিনের জীবন্ত মনে এতখানি দোলা দিয়েছে ? তা হোলে তো ছবি দেখেও মন এমনি হ'তো! বুকসেল্ফে-ভরা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার বইগুলোও মুগ্ধ করতো! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু বিখ্যাত নগর সে ভ্রমণ করেছে, শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্করের নিখুঁত পাষাণ-মূর্ত্তি দেখেছে, কিন্তু এমন জীবন্ত আকর্ষণ তো সে সবের মধ্যে ছিল না।

মানস-সুন্দরের প্রাণের ছোঁয়াই বা সে কোথায় পেলে? ছোঁয়া না পেলেও যে পরিচয় পেয়েছে—ঐ যে সেদিন সেই সৈনিকটিকে সাজা দিতে পারতো, সামরিক অফিসার সে—সৈনিকের অপরাধ অবহেলা করতে পারে না। সামরিক নিয়ম মানব-সংস্কারকে রুদ্ধ করে' রুক্ষ, প্রাণহীন যান্ত্রিক বিধি সৃষ্টি করেছে, অফিসার সেই যন্ত্রের একটি অংশ। কিন্তু ও তো জীবনের রীতিকে ভোলেনি! জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তি বাঁধা নিয়মের যে কৃত্রিম গণ্ডীকে অস্বীকার করে' গতিশীলতার পরিচয় দেয়, সেই স্বাভাবিক অবস্থা তো সেই সৈনিকের ব্যাপারে অস্বীকার করলে না। সিরিনের রূপচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে সৈনিক তখন ভুলে গিয়েছিল সামরিক কড়া নিয়মের কথা এবং নিয়ম-ভঙ্গের অপরাধে শাস্তির গুরুত্বের কথা! তার সেই মনোভাবকে সহজ মানুষের বিচারেই তো নিতে পেরেছিল এবং সিরিনের দিকে চেয়ে বুঝতে পেরেছিল তার দরদ—তাই সিরিনকে দেখিয়ে মিষ্টি করে হেসে সৈনিককে বিদায় দিয়েছিল।

সিরিন আবার পাতা উল্টে খুঁজে চলেছে প্রিয়দর্শনের প্রাণের পরিচয়। ঐ যে সেদিন পাহাড়ী শিশুটি দৌড়ুতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল, তার কপাল কেটে যখন রক্ত পড়ছিল, প্রিয়দর্শন ছুটে গিয়ে সে শিশুকে কোলে নিয়ে তার ক্ষতস্থানে ওষুধ আর মুখে খাবার দিয়ে তার কান্না

ভুলিয়েছিল, তারপর ভৃত্যকে ডেকে তার কোলে শিশুকে দিয়ে কি বললে! বোধ হয় বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কত দরদ ওর প্রাণে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি যে সব বাড়ী, সে সব বাড়ীর শিশুদের ডেকে আনে লজেঞ্জেশ দেয়, চকলেট দেয়, তাদের সঙ্গে খেলা করে, গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড দিযে ওদের হাত ধরে নাচে, আদর করে বুকে নেয়, চুমো খায়। শিশুদের কেমন মুগ্ধ করেছে—আরও তো কত অফিসার আছে, তারা এমন করে না। শিশুরা যখন ওর সঙ্গে খেলা করে, তারা অন্যদিকে থাকে। শিশুদের সঙ্গে ও যখন প্রাণখোলা হাসি হাসে, তখন ওর জীবন্ত প্রাণের বিদ্যুৎ চমকায় ওর বাইরের রূপের ওপর! এত সৌন্দর্য্য শুধু বাইরের রূপে হতে পারে না, ওর অন্তরও ঐশ্বর্য্যে ভরা।

আপন-মনের মাধুরী মিশিযে সিরিন ভাবছে···নিঃসঙ্গ, নিভৃতে!

এ সব হোলো প্রাণের ভাব আর আবেগের কথা! এই অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, আদর্শের বৈপরীত্য, বিধি-নিষেধের অসম্ভব কড়াকড়ি—তারপর যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য ঐ অফিসার অস্ত্র ধরেছে, সিরিনের সংগ্রাম সেই সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা এবং গতির মাঝে।এই অদমনীয় আকর্ষণ শুধু ব্যর্থতার দহন-জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই দেবে না। এ দহন সহ্য করতে সিরিনকে যে কি মূল্য দিতে হবে···

না, আর নয়! মনকে সিরিন ফেরাবে। যা পাবার নয়—প্রকৃতি হলো মিলনের দূত—, সৃষ্টির নিয়ন্তা,—এই প্রকৃতিকে কজন মাত্র ব্যক্তি নীচ স্বার্থে এবং কুনিয়ন্ত্রণে রুদ্ধ করেছে সুবিধাবাদীর দল। জীবনের স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক গতিও রুদ্ধ। তাই দুনিয়া-জোড়া এই বিচ্ছেদ-যাতনা এই হাহাকার! আর কোটী-কোটী মানুষের বুকে এই বেদনার স্তূপ।

জ্ঞানের উদয় থেকে সিরিন যুদ্ধ করে আসছে অবিচার, অন্যায়, নিরত্তষ্ঠা আর দুর্য্যোগের বিরুদ্ধে—জীবন তার বিচিত্রতায় ভরা, প্রতি

বাধা অতিক্রম করে' কখনও বা বহুমূল্যে বাধা ভেঙ্গে সে চল্‌তে পেরেছে। আজ আবার নূতন দুর্যোগের সূচনা করলে কেন? না, না, আর ঐ অফিসারের তাঁবুর দিকে সে তাকাবে না। সৌন্দর্য্য-সুধা আর পান কর্‌বে না! কিছুতেই না। তৃষ্ণায় বুক যদি ফেটে যায়, তবু না! —যে ঘটনার যবনিকা কালো রং দিয়ে অন্ধকার-আবরণ টানবেই, তাকে এইখানেই থামিয়ে দেবে। কাল সকালেই জানলায় নীল পর্দ্দা টাঙ্গাবে। দূর থেকে দৃষ্টি-বিনিময়ে মনকে এতখানি টেনে নিয়ে গেছে এর গতি বেড়েই চলবে—একে রোধ কর্‌তে হবে। বন্দী-জীবনের এ বিলাস সুখের বিলাস হবে না! আগুন নিয়ে খেলা কর্‌তে গেলে দগ্ধ হতে হবে। এ খেলা নয়, ক্ষণিকের দর্শন-ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতায় এর সমাপ্তি হবে না। সিরিনের অভিজ্ঞ মন, যুক্তি-বাদী মন সব-কিছুই তাকে বুঝিয়ে দিলে।

রাত্রি একটা বেজে গেছে, প্রহরী খবরদারী করতে এসে বল্লে,—দিদি, তুমি খাওনি ঘুমোও নি,---কি হয়েছে তোমার? সিরিনের চমক ভাঙ্গলো। সে বল্লে—শরীরটা ভালো নেই। খাবার তুমি নিয়ে যাও। মাথা ধরেছে, তাই খেলাম না।

ভোর বেলা তালা খোলা হলেই সিরিন প্রত্যহ বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আসে, আজ আর ভোর বেলা তার ঘুম ভাঙ্গেনি, সারা রাত্রি কেটে গেছে চিন্তার ঘোরে। ভোরের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহে স্পর্শ বুলোতেই সিরিন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেলা নটা বেজে গিয়েছে। প্রহরী এসে ব্যস্ত হয়ে ঘরময় ঘোরাফেরা করছে, ডাকতে সাহস হচ্ছে না, অথচ জাগানো তার ডিউটি! অসুখ করেছে কিনা, তাও জানাতে হবে। ভাবছে, ডাকবে কেমন করে? এমন সময় তার কর্ত্রী এলো, জেনানা-ফাটকের মেট্রন। তার জুতোর খট্‌খট্‌

শব্দে সিরিনের ঘুম ভাঙ্গলো। চেয়ে দেখে, ঘরে প্রহরী, মেট্রন এবং যারা তার কাজ করে সেই সাধারণ কয়েদী দুজন।

সিরিন ঠিক বুঝতে পারলে না, ব্যাপার কি! মেট্রন তাকে প্রাতঃ সম্বোধন করে বল্লে,—তোমার অসুখ করেছে? এত বেলা পর্য্যন্ত তো ঘুমোও না। শুনলাম, রাত্রে খাবার খাওনি!

সিরিন বল্লে,—না, অসুখ কিছু করেনি, তবে কাল বিকেলে মাথা একটু ধরেছিল, তাই রাত্রে ঘুম হয়নি। ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মেট্রন বল্লে, আমি এখনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি তোমার অসুখের জন্য। বলে তখনি চলে গেল ডাক্তারকে খবর দিতে।

এই ব্যাধির ডিপো-জেলখানাতেও সিরিনের স্বাস্থ্যে কোন দিন একটু আঁচ লাগেনি। স্বাস্থ্য-চর্চ্চা, ব্যায়াম, এবং মনের সতেজ সক্রিয় গতি তাকে বেশ স্বাস্থ্যবতী রেখেছে। জেল-কর্ত্তৃপক্ষের দেখানো-যত্ন নেওয়ায় ত্রুটি নেই, তাই সামান্য মাথা-ধরা শুনেই মেট্রন ছুট্‌লো ডাক্তার ডাকতে। শত শত কয়েদীর দারুণ পীড়াতেও দৃষ্টি থাকে না—অভিজাতদের সর্ব্বত্রই এই সুযোগ এবং সুবিধা অগাধ। জেলেও সে রীতির ব্যতিক্রম নেই।

স্নান সেরে খাওয়া শেষ করতে দশটা বেজে গেল। তারপর ডাক্তার এলো মাথা ধরার চিকিৎসা করতে। সিরিন বল্লে,—এত যত্ন নেবার জন্য ধন্যবাদ! আমার কিন্তু চিকিৎসা বা ওষুধের দরকার নেই। ভোরে ঘুমোবার পর মাথা ধরা একেবারেই সেরে গেছে।

ডাক্তার তবু এ্যাসপিরিন, বরফ ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলেন।

জেল-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সিরিনের ব্যবহার সর্ব্বদাই নৈর্ব্যক্তিক্। তার নিজের প্রয়োজন বলতে কিছুই নেই, এমন ভাবে হিসেব করে সে চলে, যাতে জেল-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন আলোচনা বা প্রয়োজনের প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠে না। তার সঙ্গে জেল-কর্ম্মচারীদের যা সম্পর্ক, তা

শুধু সাধারণ কয়েদীদের প্রতি ব্যবহায নিয়ে, ওদের দাবী নিয়ে। এবং ঐ সব ব্যাপারে যখনই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার কথা বলবার দরকার হয়, তখন প্রতি বিষয়ে এবং ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের গলদ কোথায় বা কেন, সে তা বোঝাতে ছাড়ে না। আর আদর্শ-প্রচার—জেলের প্রধান কর্ম্মচারী থেকে সর্ব্বনিম্ন প্রহরীদের মধ্যে পর্য্যন্ত দিনের পর দিন সে করে' চলেছে। বিশেষ কোন ঘটনা হলে কথাই নেই! নিদর্শন দিয়ে, কারণ বুঝিয়ে ত্রুটি আর গলদ বিশ্লেষণ করে। আদর্শ-প্রচার এবং সক্রিয়তা তার কখনো বন্ধ থাকে না।

আজ দুপুরের খাওয়া শেষ করলো সে ইচ্ছে করেই দেরীতে। সময়টাকে অন্য কাজে কাটিযে দেবে—মনে মনে স্থির কবেছে। যুক্তি দিয়ে মনকে বুঝিয়েছে অফিসারকে দেখতে সে আর জানলার ধারে যাবে না। দিনের তিনটে সময় তার জানা আছে; দুপুরে অফিসাররা খাবার জন্য তাঁবুতে আসে, এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার চলে যায়। বিকেলে আসে চা খেতে, চা খেয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে যায; আবার সন্ধ্যায় আসে। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পরে তারা বেরিয়ে যায়। ঐ তিনটি সময় সিরিন অন্য কিছু নিয়ে কাটিয়ে দেবে!

দুপুর বেলা পর্য্যন্ত মনের জোর তার অটুট রইলো। খাবার পর একটু এদিক-ওদিক করে তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। দুপুরে কোনোদিন ঘুমোয় না, লেখা নিযে বসে। আজ বোধ হয় মন জয় করার গর্ব্বে লেখায় মন বসাতে পারলে না। কতবার মনে হলো জানলার ধারে যাইনি,—মন ঠিক হয়ে গেছে, আর চিন্তা নেই!

বিকেলে ব্যায়াম সেরে স্নান এবং প্রসাধন করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলে। এ সময় বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটু দেখা করার প্রযোজন—নিদারুণ গণ্ডির বাইরে তাতে যেন সহজ নিশ্বাস ফেলতে

পারে একটু। মন প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। দুপুর-বেলা অফিসার এসে ফিরে গেছে। এখন যদি থাকে, তাহলে এখনি বাইরে যাবার সময় হবে,—চলে যাবে। নাও যদি যায়, আমি তাকে দেখে সরে আসবো। এ বিশ্বাস অবচেতন মনে কতখানি সক্রিয় ছিল, সিরিন আর সে খোঁজ রাখেনি।

শুধু বাইরের দৃশ্যটুকু দেখবে, যেমন এতদিন দেখতো—এতখানি মনের জোর নিয়ে জানলায় উঠে দাঁড়ালো। এক-মুহূর্ত্তে একান্ত সহজ টানে দৃষ্টি চলে গেল কোথায়? অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে অফিসার সিরিনের জানলার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিরিনকে দেখেই তার মুখে যেন দীপ্তি ফুটে উঠলো—চঞ্চল চরণে তাঁবুর বাহিরে আরও এগিয়ে এলো।

সিরিনের এ কি হলো? কোথায় গেল চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যুক্তি দিয়ে বোঝানো মন? কোথায় গেল তার সতর্কতা? সব ভুলে চেয়ে রইল কল্পনাকে-ছাড়িয়ে-যাওয়া বাস্তব সুন্দরের পানে, চোখের পলক পড়াও যেন সহ্য হচ্ছে না, পলক ফেলবার মুহূর্ত্তটুকুও দৃষ্টিকে সে বঞ্চিত করতে চায়না!

প্রকৃতি কি নিষ্ঠুর! এরকম মুহূর্ত্তগুলোর জন্য সময়ের গতি কেন রোধ করে না? কেন সে অবাধ গতিতে চলে যায়? সিরিন স্বেচ্ছায় দেরী করেছে, প্রিয়দর্শন কতক্ষণ ধরে অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে; তাকে কঠোর কর্ত্তব্যের তাড়নায় যেতে হবে এখনি। হাতের ঘড়িটা যান্ত্রিক নিয়মে তা স্মরণ করিয়ে দিলে,—প্রিয়দর্শন ঘড়ির দিকে চেয়ে সিরিনকে বোঝালে, এটা তো মনের গতি বুঝে চলে না। ধীরে ধীরে সে তাঁবুর কাছ থেকে পথে নেমে এলো, পিছু ফিরে ফিরে সিরিনের দিকে দেখতে দেখতে সামনের পথ ধরে চলে গেল ডিউটিতে।

সিরিনের বাইরের সঙ্গে পরিচয় শেষ হয়ে গেল। পাহাড়ের সৌন্দর্য্য,

পথের লোক-চলাচল দেখে সময় কাটাবার জন্য জেগে এসে পর্য্যন্ত এই সময়টুকুই-ঠিক করে রেখেছে। আজ গেল তা গোলমাল হয়ে! বসে পড়লো চেয়ারে। মন যেন কত সহজ! শুধু তো এক মুহূর্ত্ত দেখেছি, না দেখে তো এতক্ষণ কাটাতে পেরেছি! কিন্তু যাক্‌ ও কথা।...

প্রহরীকে ডেকে বল্লে,—আজ তোমাদের কি সব গোলমাল হয়েছে বলোতো? দুপুরের প্রহরী আমায় বলতে এসেছিল, কিন্তু সে সময় তোমাদের কর্ত্রী ছিল ব'লে বেশীক্ষণ আমার কাছে বসতে পায়নি। সন্ধ্যার সময় সে বদলী হযে গেছে, তুমি এখন বলো।

প্রহরী বল্লে,—আপনার মনে আছে যুদ্ধের জন্য আমাদের মাগ্‌গী-ভাতা বাড়াবার কথা নিয়ে আমরা দাবী জানিযে ছিলাম? সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু আজও তোমরা তা পাওনি?

প্রহরী—না, বড়-সাহেব আমাদের কথা দিয়েছিল এক মাস পরে পাবো, কিন্তু আজ তিনমাস হযে গেল কিছুই হলো না। অথচ জিনিষ-পত্রের দাম এত বেড়েছে দিদি, এক টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় কিনতে হয়। আর খাবার জিনিষ পাওয়াই অসম্ভব। সিরিন বললে—কেন, তোমাদের জেল থেকে রেশন-কার্ড—খাবার আর কাপড়ের জন্য পাওনা?

প্রহরী বললে,—না, সে-কথা তো সবই সেই দরখাস্তের মধ্যে ছিল, কিন্তু তা পাচ্ছি কই? বড় বড় অফিসারদের জন্য ব্যবস্থা কায়েম আছে, আমাদের বেলাতেই শুধু নজর থাকে না!

সিরিন—তোমাদের বড় জমাদারের ডিউটি এদিকে আজ রাত্রে আছে না?

প্রহরী—হ্যাঁ। আর একটু পরে সে আসবে। সিরিন বললে—আচ্ছা যাও, আমি তাকেই সব বলবো।

একটু পরেই হেড্‌ প্রহরী এলো। সিরিন বল্লে,—কি খবর জমাদার সাহেব?

হেড প্রহরী—খবর তো খুব জোর দিদি, যত প্রহরী, প্রহরিণী, হেড প্রহরী, কেরাণী বাবু পর্য্যন্ত সবাই বলছে মাগগী-ভাতা না পেলে কাজ বন্ধ দিয়ে হরতাল করে বসবে। এ-কথা ওরা আমায় বলেছে, তুমি আর একখানি দরখাস্ত লিখে দাও দিদি!

সিরিন—তোমাদের সে দরখাস্তের জবাবও এতদিন আসেনি, আর তোমরা চুপ করে বসে আছ। আমি তোমাদের কত বার তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েছি, তাতেও তোমরা কিছু করলেনা!

প্রহরী বললে,—হ্যাঁ দিদি, ঐ তো আমাদের দোষ, আমরা যে এক-মত হতে পারি না। কজন হেড প্রহরী আছে, ওদের তো তত কষ্ট নেই, তাই ওরা সব সময় হরতাল করা থামিয়ে দিতে চায়। তারা না যোগ দিলে নীচের প্রহরীরা কিছু করতে সাহস পায় না। এবার ওরা ঠিক করেছে এই কজন হেড-প্রহরীর তোয়াক্কা রাখবে না, হরতাল করে দেবে।

সিরিন বললে—সে ঠিক হবে না! ঐ হেড প্রহরীরাও গুন্‌তিতে কম নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে না করলে হরতাল সফল হবে না। তোমরা চেষ্টা করো ওরাও যাতে যোগ দেয়।

হেড প্রহরী—হ্যাঁ, সে চেষ্টা করবো নিশ্চয়। কিন্তু ওরা যদি রাজী না হয় তা হোলেও হরতাল আরম্ভ হয়ে যাবে। গ্রামের যা অবস্থা, প্রত্যেক সিপাহীর বাড়ী থেকে চিঠি আসছে, বাড়ীর লোকজন না খেয়ে মরতে বসেছে, খাবার জিনিষের অসম্ভব রকম দাম, দারুণ দুর্ভিক্ষ। এই সব শুনে সিপাহীরা আর স্থির থাকতে পাচ্ছে না। তুমি দিদি এবারে ভাল

করে দরখাস্ত লিখে দাও। রাত্রে তোমার জানলার কাছে ওরা অনেকে আস্‌বে তোমার লেখা দরখাস্ত নিতে, আমায বলে দিযেছে।

সিরিন বললে—হ্যাঁ, তুপুরে একবাব এসে আমাকে বলে গেছে, তাই থেকে জানতে পারলাম ওরা এবার খুব অশান্ত হয়েছে। কি লিখতে হবে তাও বলে দিয়েছি,—ওবা যাতে ভাল কবে পরামর্শ কব্‌তে পারে।

বাধা দিযে হেড প্রহরী বললে পবামর্শ কর্‌বার আর প্রযোজন নেই। ওরা ঠিক আছে, চরম-পত্র দেবার জন্য প্রস্তত। পনেরো দিন পরে ওরা হরতাল আরম্ভ কর্‌বেই।

সিরিন বললে—পনেরো দিনের সময় দিযে আমি দরখাস্ত লিখে দেব, এর মধ্যে ওরা যাতে সব জেলাব জেলগুলিতে খবর পাঠাতে পারে, ব্যবস্থা করতে বোলো। কি ভাবে ব্যবস্থা করবে। তাও আমি লিখে দেবো, পাঁচিলের এদিক থেকে সব কথা রাত্রে আমি বলে রাখবো, ভোর বেলা তুমি দরখাস্ত আর অন্যান্য ব্যবস্থা-লেখা কাগজ নিয়ে যেয়ো।

হেড প্রহরী খুশী হযে চলে গেল।

এদের এই ধরণের সমস্ত কাজ সিরিন সর্ব্বদা করে দেয। প্রহরী এত বিশ্বাসী যে সিরিন তাকে দিয়ে অনেক কিছু কাজ করিয়ে নেয। সিরিনের উপর তাদের শ্রদ্ধা আর মমতার সীমা নেই।

সেলের তালা বন্ধ হযে গেল। সিরিন বসলো প্রহরীদের ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব জানিয়ে দরখাস্ত লিখতে। এ প্রদেশে পঁচিশ হাজার জেল-প্রহরী আছে। এ জেল হলো প্রদেশের প্রধান জেল, অন্যান্য জেলগুলো এখানকাব সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। প্রত্যেক জেলেরই অবস্থা চরম,—এখন একেবারে অসহ্য হযে উঠেছে। যুদ্ধের শোষণ-ব্যবস্থা তাদের ওপর প্রকট ভাবে আরম্ভ হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধবে তা সহ্য করে আজ

এরা অসহনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, গভর্ণমেণ্টের ঔদাস্য এবং বাস্তব অবস্থা এদের আরও বিদ্বেষী করে তুলছে।

বিস্তারিত ব্যবস্থাসহ দরখাস্ত তৈরী করতে এবং বিভিন্ন জেলায় তার নকল পাঠিয়ে মিলিত ভাবে সমস্ত প্রদেশ জুড়ে জেল-প্রহরীদের ধর্ম্মঘট কি ভাবে আরম্ভ করা যায়, এ সব ব্যবস্থা-পত্র লিখে ঠিক করতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। তার পর পাঁচিলের ধারের প্রহরী বদল হল। এই সময় সিরিন প্রহরীদের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনে তার জানলায বসে। প্রহরীরা এ সময়টা নিশ্চিন্তে দু'ঘণ্টা কথা বলতে পারে, কারণ এ সময় হেড প্রহরী বা জেল-অফিসার কেউ আসে না ওদের ডিউটির খোঁজ করতে।

সিরিন ওদের বলে দিলে কি ভাবের দরখাস্ত লেখা হয়েছে এবং বাইরে কার কাছে গিযে তা নকল করে নিয়ে সঠিক জায়গায় পাঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভাষায় একখানা ছোট্ট ইস্তাহার লিখে দিলে। কি ভাবে ছাপা হবে এবং কোথায় কোথায় দিতে হবে সমস্ত বলে দিলে। ঐ ইস্তাহারে রইল প্রদেশের সমস্ত জেল-প্রহরী ও পুলিস-বাহিনীদের ধর্ম্মঘটে যোগদানের জন্য আবেদন এবং তাদের অবস্থা, দুর্ভিক্ষে তাদের দেশের আত্মীয়-স্বজনের অনাহারে মরার কথা লেখা রইল। প্রহরীরা একান্ত নির্ভয়ে মনোভাব জানালে,—সিরিনের এই ভাবের চেষ্টায় ও পরামর্শে তাদের কিছু একটা হতে পারে।

সিরিন বড় ক্লান্ত। মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এ সময়ের অসহনীয় ভাব এ কদিন একটু কম, কারণ ধর্ম্মঘটের ব্যাপার নিয়ে সক্রিয়তা তাকে স্বস্তি দিয়েছে এবং সেই স্বস্তিটুকুই তার ক্লান্তিকে ঘুমের দোরে পৌঁছে দিলে, নয়তো বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করেই রাত শেষ হয়ে যায়।

পরদিন সকালে আরও অনেক খোঁজ নেবার ছিল, প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল ক' মিনিট। দুপুর যত কাছে আসছে, সিরিনের মন তত চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। একবার ভাবছে, না, আর না, এর পরিণতি দুঃসহ যাতনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রিয়দর্শন কাল অমন করে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, তাকে এতখানি ব্যথা কেন দেবে? কেমন করে সিরিন এমন নিষ্ঠুর হবে? দিনের ঐটুকুই যে সর্ব্বক্ষণের পুলক—কেন স্বেচ্ছায় প্রিয়দর্শনকে বঞ্চিত করবে, নিজে বঞ্চিত হবে, তা থেকে? এটুকু সুখ, এটুকু পুলকের মধ্যে তো কোথাও অন্যায় নেই! তার এই পাওয়াটুকুর জন্য কারও তো কণামাত্র ক্ষতি সে করছে না! অন্যায়ের কথা উঠতেই পারে না।

খাওয়ার পর সিরিন বসেছে। একটার পর একটা সিগারেট শেষ কচ্ছে আর মনের সঙ্গে বোঝাপড়া চলেছে। এমন সময় অফিসার-মেশ থেকে যুদ্ধযাত্রার গানের একখানা রেকর্ড বেজে উঠলো। সিরিনের সব গেল এলোমেলো হয়ে,—যুক্তির বালির বাঁধ গেল ভেঙ্গে। জানলায় উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, প্রিয়দর্শন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়। দু'জনেই পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দু'জনের পানে, গ্রামোফোন কখন থেমে গেছে খেয়াল নেই, কোন ভাষার বিনিময় নেই! শুধু মৌন দৃষ্টি-বিনিময়ে এমন মোহ এতখানি আকর্ষণ—একমাত্র ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝবে না।

প্রিয়দর্শন আজ অন্য দিনের মতো ধীর প্রফুল্ল নয়, তার মুখ মলিন। উৎকণ্ঠায় সে যেন চঞ্চল।

সিরিনের বুকে তা বাজলো। সে ভাবলে, আমার এই মন জয়, এই সরে থাকা বুঝি প্রিয়দর্শন অবহেলা মনে করেছে! সিরিন নিজেকে

অপরাধী মনে করলে। চঞ্চলতা দিয়ে সে ভাব প্রকাশ হতে লাগলো। বারে বারে সিগারেট জ্বালাচ্ছে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছচে। প্রিয়দর্শন এতে একটু খুশী হলো। সেও দুষ্টুমি করে ঠিক সিরিনের মতো ভঙ্গীতে রুমালটা কপালে লাগাচ্ছে। যতবার সিরিন সিগারেটের ছাই ঝাড়ছে সেও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাই কচ্ছে। এইটুকু দুষ্টুমির মধ্যে দু'জনেই বেশ সহজ হয়ে এলো। এই ছত্রিশ ঘণ্টার অদর্শন-ব্যথায় দু'জনের মনে যতখানি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার উপশমও বুঝি কিছুটা হল। এ সময়টি বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হল না, প্রিয়দর্শন ঘড়ির দিকে চেয়েই ব্যস্ত হয়ে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে তাঁবুর সামনে বেরিয়ে এসে সিরিনকে সম্মানিত অভিবাদন জানিয়ে ইঙ্গিতে বল্লে,—এবার তো যেতে দিতে হবে। সিরিনও অনুরূপ অভিবাদনে ইঙ্গিতে অনুমতি দিলে। এতদিনে ইঙ্গিতের মৌনতা ভাঙ্গলো।

সিরিনের মনে নূতন পুলক। আজকের ঐ ইঙ্গিতটুকুর জন্য? না, এই ক'ঘণ্টার অদর্শনের পর বলে'...এমন হচ্ছে? সময়টাকে তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দেবার জন্য সিরিন কতকগুলো কাজ নিয়ে বসলো। তারপর ব্যায়াম, স্নান, চা খাওয়া শেষ করতে বিকাল হলো। আজ প্রিয়দর্শন কিছু আগেই ডিউটি থেকে ফিরেছে, অনেকগুলো সঙ্গীও এসেছে। রেডিওটা জোর করে চালিয়ে তাঁবুর দরজার সামনে কৌচ নিয়ে বসেছে। রেডিওর সাড়া পেয়ে সিরিন এসে জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসলো। প্রিয়দর্শন সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছে, হাসি-গল্প কচ্ছে, কিন্তু তার ফাঁকে-ফাঁকে সিরিনের দিকে চাইবার সুযোগও বেশ করে নিচ্ছে! মাঝে মাঝে সিগারেট জ্বালবার অছিলায় হাত নাড়ছে, লাইটারটা একবার নিভোচ্ছে আবার জ্বালাচ্ছে, আবার সিরিন যেমনি দেশলাই জ্বালায়, প্রিয়দর্শন নিভিয়ে ফেলে।

একটু পরেই সঙ্গীরা বাইরে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলো। প্রিয়দর্শন একটু সামনের দিকে এসে ইঙ্গিতে বল্লে, আবার এখনি যেতে হবে, সন্ধ্যাটা মিথ্যা হলো।

সবাই একে একে তাঁবু থেকে পথে এসে নামলো। প্রিয়দর্শন টুপি নেবার অছিলায় ভিতরের দিকে গিয়ে টুপিটা নামিয়ে বিদায় নিয়ে গেল সিরিনের কাছে।

সিরিন ভাবে, আবেগের কি সুসংযত প্রকাশ, উচ্চশিক্ষায় কত মার্জ্জিত আচরণ। গাম্ভীর্য্য ও সুরুচির পরিচয় এই সামান্য অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে!

তালা বন্ধ কর্‌বার সময় হয়েছে, তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। লেখাপড়ার কাজ কত জমে আছে আজ কদিন ধরে, তা শেষ কর্‌তে পাচ্ছে না। ঘুম আসে না, শুয়েও স্বস্তি নেই, কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে পড়ে। টেবিলের ধারে চেয়ার নিয়ে লেখা সুরু কর্‌লে। বিষয়টা এমন ছিল যে সময় কেটে গেল সহজ হয়ে।

রাত তখন একটা। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা আলো এসে সিরিনের জানলায় পড়লো। প্রথমটা সিরিন ভাবলে এ আমার আশা-মরীচিকা, কিন্তু আলোটা একবার সরে গিয়ে আবার পড়লো। সিরিন লাফ দিয়ে জানলায় উঠে দাঁড়ালো, দেখলে, প্রিয়দর্শন একটা জোর-আলোর টর্চ্চ নিয়ে ওর জানলায় ফেলেছে। সিরিন তখন দেশলাই জেলে সিগারেট ধরালে। প্রিয়দর্শনও জ্বালালো। প্রিয়দর্শনের তাঁবুর মধ্যেকার বিদ্যুৎ-আলো সিরিনের দেখার সুযোগ ঘটিয়ে দিলে, কিন্তু সিরিনের ঘরের মিটমিটে কেরোসিন-আলোতে প্রিয়দর্শনের আঁখির পরিতৃপ্তি হচ্ছিল না। হাতটাকে একটু মাথার কাছে নিয়ে হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে জানালে, ঘুমোতে যাই। সিরিন লাইটার জেলে নিজের মুখের সামনে ধরে

মাথা নুইয়ে বলে দিলে, ঘুমোও গিয়ে। প্রিয়দর্শন তাঁবুর বাতি নিভিয়ে দিলে। সিরিন নেমে এলো জানলা থেকে।

পরের দিন ভোরবেলা কারা প্রাঙ্গণ থেকে অনেকগুলো সুন্দর ফুল তুলে এনে জানলার ধারে এসে সেগুলোকে ফুলদানীতে খুব ভাল করে সে সাজাচ্ছে। এ সময়ে কোন দিন তাঁবুর সামনে কাউকে দেখেনি। প্রতিদিন ভোরবেলা প্রাঙ্গণে পায়চারী করে ফুল তুলে নিয়ে আসে, টেবিলে রাখে নিজের নয়নের তৃপ্তির জন্য। ফুলের রূপ দেখে আনন্দ পাবার সময় মনে পড়ে গেল আরও অপরূপ সুন্দরের কথা। মন বললে, সে তো ফুলের মাঝে খুঁজে পাবে না! জীবন্তের সন্ধানে তাকাও! কিন্তু এখন অসময়, এখন তো তাকে দেখা যাবে না,—তবু চাইলো ঐ তাঁবুর পানে। এ কি অসময়ে এমনভাবে অপ্রত্যাশিত প্রতীক্ষায় প্রিয়-দর্শন! স্বপ্ন নয় তো? পাহাড়ী দেশের মনোহর রঙ্গীন ঊষাকে ম্লান-করে-দেওয়া রূপ নিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছ! প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় এই অন্ধপুরীর মাঝ থেকে সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের চিত্তমুগ্ধকর শোভা দেখে তৃপ্ত হতাম, আমার মনের-কবিতার-তূলির রং সংগ্রহ করতাম, তুমি তাও কেড়ে নিলে? এই যে নানা রংএর ফুল তুলে আনলাম নিখুঁত করে রং মিলিয়ে সাজাবো বলে, তাও এলোমেলো করে দিলে? এই নাও এলোমেলো-করা ফুল, কত ভাবে বাড়াবে তোমার শ্রীকে! দুহাতে অঁাজলা ভরে ফুলগুলো নিয়ে প্রিয়দর্শনকে দেখালে। প্রিয়দর্শন ডান হাত তুলে ডান দিকের কপালে ছুঁইয়ে সম্মান জানালে, তারপর আবার সামরিক ভাবে অভিবাদন জানালে।

সিরিন এক হাতে ফুলগুলো জড়িয়ে বুকের কাছে রেখে ডান হাতে সামরিক অভিবাদনে প্রতি-উত্তর জানালো।

প্রিয়দর্শনের ভৃত্য ট্রেতে করে চা নিয়ে এলো। প্রিয়দর্শন একেবারে

তাঁবুর সামনে এসে চা ঢালতে বসলো। সিরিনকে ইশারা করে জিজ্ঞেস কল্লে,—তুমি চা খাবেনা? সিরিন হাত পেতে বল্লে,—দাও। প্রিয়দর্শনের মুখ গম্ভীর হলো। পেয়ালাতে চা সে ঢেলেই রাখলে, মুখে আর তুললো না। সিরিন ইশারা করে বল্লে—খাও। প্রিয়দর্শন বল্লে,—না। সিরিন বুঝলো, দুষ্টামি করে এমন ইশারা না করলেই ভালো ছিল! প্রিয়দর্শনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এ চাওয়া লেগেছে। তখন সিরিন নিজের পেয়ালা দেখিয়ে বল্লে,—আমিও খাবো। তুমি খাও। প্রিয়দর্শন বল্লে,—আগে তুমি খাও, দেখি!

সিরিন পড়লো মুস্কিলে। এত তাড়াতাড়ি সে চা পাবে কোথা? তবুও চেষ্টা করতে গেল জানলা থেকে নেমে। একটু পরে ফিরে এসে দেখো প্রিয়দর্শন ঠিক সেই অবস্থায় বসে আছে। সিরিন ভাবলে, কি ঝক্‌মারী করলাম এমন দুষ্টুমী করে! বুঝিবা ডিউটির সময় হয়ে যাবে, চা না খেয়েই চলে যাবে। সিরিন মিনতি করে বল্লে,—চা খাও। আমি পরে যাবো। প্রিয়দর্শন বল্লে,—আগে নিয়ে এসো তোমার চা। সিরিন ব্যস্ত হয়ে আবার গেল চায়ের চেষ্টায়।

ইতিমধ্যে তার চা এলো। সিরিন ছুটে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে। তা দেখে প্রিয়দর্শন চা খাওয়া আরম্ভ কল্লে।

আজ বোধ হয় কিছুক্ষণ দেরীতে তার ডিউটি। তাই চা শেষ করেও বসে রঙ্গীন ড্রেসিং-গাউনটি গায়ে দিয়ে। বাইরের পোষাক নেই দেখে সিরিন ভাবলে, ছুটির দিন বুঝি।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, সিরিনকে এবার যেতে হবে তার দৈনিক হাজিরার জন্য। হাত-ঘড়িটা প্রিয়দর্শনকে দেখিয়ে সে বল্লে,—আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি, একটু অপেক্ষা করো। প্রিয়দর্শন হাত নেড়ে বল্লে,—আচ্ছা, আমি বসে থাক্‌বো।

সিরিন তাড়াতাড়ি ঘুরে এলো নীচে থেকে। এসে দেখলে, প্রিয়দর্শন তাঁবুর সামনে পায়চারী কচ্ছে। সকাল বেলার হাল্কা রোদের সোনালি রং উজ্জ্বল গৌর বর্ণে পড়ে যে জৌলুস ফুটিয়েছে, তার উপর গাঢ় নীল রং-এর সাটীনের ড্রেসিং-গাউন হয়েছে ব্যাক-গ্রাউণ্ড। সামরিক পরিচ্ছদ ছাড়া সিরিন এই প্রথম দেখলে অন্য পরিচ্ছদে। ভাবলে, যে পরিচ্ছদই অঙ্গে উঠুক, তাতেই সৌন্দর্য্য বাড়বে। ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত দুটো দিয়ে প্রিয়দর্শন অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি কর্চ্ছিল। একবার হাত বার করে ঘড়িটা তুলে দেখলে। সিরিন বুঝলে, এবার যাবার সময় হয়েছে। সিরিনের দিকে চেয়ে বল্লে,—একটু অপেক্ষা করো, আসছি। বলে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল এবং পনের মিনিটের মধ্যে পোষাক বদলে যোদ্ধাবেশে ডিউটিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলো, এসে আবার একটু বসলো কৌচটায়।

সিরিন তখন ফুলগুলো তুলে দেখালে একবার। প্রিয়দর্শন চেয়ে রইল তার পানে। বুঝি, বলতে চায় ফুলের সৌন্দর্য্য দেখবার অবকাশ এখন নেই। একটু পরে দু'জন সঙ্গী এলো একত্রে বাইরে যাবে বলে। প্রিয়দর্শন উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে বিদায় চাওয়ার ইঙ্গিতের সুযোগ আর হলো না। নীরবে চেয়ে চলে যেতে হলো, কারণ সঙ্গী দু'টো সিরিনের দিকে বারে-বারে চাইছিল।

দুপুরের আসাও এমনি ভাবে ব্যর্থ হলো—সঙ্গীগুলো সবাই এসেছে। নূতন দু'জন অফিসারকেও দেখলে। প্রিয়দর্শন খুব সতর্ক হয়ে দু একবার মাত্র সিরিনের দিকে তাকাবার সুযোগ পেলে। কোন রকম ইঙ্গিত বা দুষ্টুমীর সুযোগ হল না। সন্ধ্যাবেলাও আজ ওদের ক্যাম্পে অফিসারের ভীড়, কাগজ-পত্র-ম্যাপ নিয়ে সব কত কি বলাবলি, হাত

নাড়া ইত্যাদিতে রাত্রের খাবার সময় পর্য্যন্ত কেটে গেল। একটি বার মাত্র প্রিয়দর্শন তাঁবুর দরজার কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছিল।

দু'দিন এই ভাবে কাজের ভিড়ে প্রিয়দর্শন ব্যস্ত, দু-চার মিনিটের বেশী দৃষ্টি-বিনিময় হয় না, দুজনেই বড় ম্লান হয়ে রয়েছে। এ স্তব্ধতায় ওদের বেদনা হয়েছে তীব্র।

সেদিন ছুটির দিন, প্রিয়দর্শন একটু আগে এসেছে ক্যাম্পে। ক্যাম্পে ভিড় ছিল না। একজন অফিসার বসে একখানা বই পড়ছিল, প্রিয়দর্শন এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে বইখানার দিকে ঝুঁকে কি বল্লে, অফিসারটি খুশী-মনে হেসে উঠ্‌লো। প্রিয়দর্শন তার পিঠ চাপড়ে বইখানা মন দিয়ে পড়বার উপদেশ দিলে বোধ হয়, এবং সেই ফাঁকে সিরিনকে চোখ ভরে একটু দেখবে বলে' বেরিয়ে এলো সামনের দিকে।

সিরিনের স্তব্ধ গম্ভীর মুখ দেখে জিজ্ঞেস কল্লে,—কি হয়েছে? সিরিন হাত নেড়ে বল্লে, কিছু না। প্রিয়দর্শন তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দূরবীনটা নিয়ে এলো, সিরিনের ইসারা ভাল করে বুঝতে পারবে বলেই হোক বা খুব কাছে দেখবে বলেই হোক। বারে-বারে দূরবীন চোখে দেখছে আবার পিছন-পানে চাইছে, অফিসারটি পড়ছে কিনা দেখতে। ক'মিনিট এই ভাবে কাটলে একদল অফিসার এসে হাজির। প্রিয়দর্শন তাড়াতাড়ি দূরবীনটা লুকিয়ে ফেললে। তারা এসেই সিরিনের জানলার দিকে তাকালো। সিরিন স্থির ভাবে অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, প্রকৃতির শোভা দেখে যেন সে উদাস হয়েছে! অফিসার সিরিনের দিকে চেয়ে কত কি বলতে লাগলো, প্রিয়দর্শন তাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। একটু ভিতর দিকে চলে গিয়ে হাত দিয়ে জানালে, তুমি নেমে যাও।

এদিক-ওদিক একটু দেখে সিরিন নেমে পড়লো।

পরের দিন আবার তেমনি অফিসারের ভীড়। সিরিন যেন হতাশ হয়ে পড়লো; ওদের কাজের ভীড় দিনের পর দিন কি বেড়েই চলবে? কিন্তু এর চেয়ে বেশী কি বা আশা করতে পারে? এ যে ক্ষণেকের পাওয়া! ওদের কোন জায়গায় বেশীদিন একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়,—যদি অন্য কোথাও চলে যায়? এই তো কিছুদিন আগে যে সব অফিসার এসেছিল তারা তো অল্প দিনেই বদলী হয়ে গেল, তারপর প্রিয়দর্শন এসেছে। তবে কেন এমন করে মনকে ছুটিয়ে চলেছে? দারুণ প্রতিরোধ গতিতে প্রচণ্ড আঘাত পেতে হবে। আর পারে না ভাবতে সিরিন।

দিন কেটে চলেছে,—অতৃপ্তির ভাবে। ওদের কাজের তাগিদ বেড়ে গোলমাল করে দিলে সব। একটা ছুটির দিন। তাঁবু অফিসারে ভর্ত্তি— বিশ্রাম-ক্যাম্পটার মধ্যে টেবিলে নানা রকমের খাবার সাজানো, একটা টেবিল মদের বোতলে ভর্ত্তি। বিকেল থেকেই তাদের পান-ভোজন চলতে লাগলো, এক-একজন দুটো করে বোতল শেষ কচ্ছে, দেখলে। কত হৈ-হৈ করতে লাগলো। গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড দিয়ে নাচ সুরু করলে। প্রিয়দর্শন ওদের সঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, কিন্তু সবার থেকে সে আলাদা। যখন সবাই ওরা মদ ঢেলে খাচ্ছিল, সিরিন একেবারে সেলের শেষ-দিককার জানলায় গিয়ে দেখে এলো, প্রিয়দর্শন গ্লাস হাতে তুললে না, খাবার খেলে। সিরিন খুব ভাল করে লক্ষ্য করছিল, প্রিয়দর্শন মদ খায় কিনা। সঙ্গীগুলো খানিক পরে বেশ ঝিমিয়ে পড়লো। কি রকম হল্লা এতক্ষণ কল্লে নিজেদের ভোলাবার জন্য, এখন সব স্থির। আনন্দের বাহ্যিক ক্রিয়া এমনি করে শেষ হয়। ওদের জীবনে এ কি অস্বাভাবিক অবস্থা!

কিন্তু প্রিয়দর্শন? সে তো তেমনি ধীর গম্ভীর ভাবে বসে আছে অথচ হাসি আনন্দে পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। কোন বিষয়েই ওকে অসংযত

দেখে না—যা নাকি এই সৈনিকদের জীবনে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। ও সেই সব কৃত্রিম আনন্দের উপকরণগুলো থেকে কেমন করে নিজেকে আলাদা করে রেখেছে? চরিত্রের এই সব বৈশিষ্ট্য সিরিনকে আরও আকৃষ্ট কল্লে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঝিমন্ত অফিসারগুলো কোন রকমে উঠে ভিতরের দিকের তাঁবুতে গেল। প্রিয়দর্শন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তাঁবুর সামনে সে এগিয়ে এলো। সিরিনের মুখ অন্যদিনের মতো প্রফুল্ল ছিল না, দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখলে, তারপর মদের বোতলগুলো দেখিয়ে ইশারায় কি যেন বল্লে। সিরিন বুঝলে না। তখন দূরবীনটি একটা কৌচের উপর ছুড়ে ফেলে নিজে অন্য একখানা কৌচে বসে পড়লো। বড় অবসন্ন, কিন্তু তার মাঝেও দারুণ অস্থিরতা। সিরিন বুঝতে পারছে না, বারে-বারে জিজ্ঞেস কচ্ছে,—কি হয়েছে?

প্রিয়দর্শন উঠে বাইরে এসে সিরিনকে বল্লে—আরও কাছের জানলায় এসো। সিরিন গেল সেই জানলায়। প্রিয়দর্শন আবার দূরবীন তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। যখন দিনের আলো একেবারে ফুরিয়ে এলো, সন্ধ্যার ওড়নায় সিরিনের জ্যোতির্ম্ময়ী মুখ ঢেকে গেল, প্রিয়দর্শন বিরক্ত হয়ে দূরবীন ফেলে অন্য কৌচে বসলো। তাঁবুর জোর-করা আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে কৌচে দেহ এলিয়ে হাত দুটো একবার কৌচের হাতলে রাখে, আবার মাথার উপর তুলে দুটো হাত জুড়ে রাখে। বারে-বারে সিরিনের পানে চায়! এমন অধীরতা অন্য দিন দেখেনি সিরিন! কি হলো ওর আজ? এমন করুণ চোখে চাইছে কেন? ও চাহনিতে কি আছে—সিরিনের বুকে তীরের মত বাজলো।

সিরিনের বন্ধ হবার ঘণ্টা বাজলো, চলে এলো সে নিজের সেলে। এসে জানলায় উঠে দেখে, প্রিয়দর্শন তাঁবু থেকে বেরিয়ে

এসে জানলার পানে সাগ্রহে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি তার আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে সিরিন জানলার কাছে রাখলো যাতে ও তাকে দেখতে পায়। প্রিয়দর্শন হাত নেড়ে বল্লে,—তুমি যেয়োনা। আমি আর পাচ্ছি না! চলে এসো তুমি। এ ব্যবধান অসহ্য!

কোটের বোতামগুলো খুলে ডান হাতটা বুকে রেখে কি বল্লে—সিরিন বুঝলে না। প্রিয়দর্শন আবার ডাকলো তারপর সিরিনের দিকে চেয়ে সেই মদের বোতলগুলোকে দেখিয়ে দিলে। ইঙ্গিত করে বল্লে, আমি ঘুমোতে পারি না, কাজে মন দিতে পারি না, এসো তুমি। সিরিন নিজের হাত দুটো একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেখালে, দারুণ বন্ধন! কেমন করে যাবো? তারপর প্রিয়দর্শনকে দেখিয়ে বল্লে,—তোমার আর আমার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

প্রিয়দর্শন বল্লে, সবই সম্ভব, তুমি এসো। আমি সব সম্ভব করে নেবো। সিরিন ভাবলে, কেমন করে ও জানবে আমার আদর্শ, আমার পথের কথা, কেন বা আমি এখানে আছি—এ সব জানবে কেমন করে? শুধু জানে, আমি রাজ-বন্দিনী।

প্রিয়দর্শন নিজের হাত দুটিতে রুমাল বেঁধে এবং ক্রশবেল্ট দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, আমার বন্ধনও এতটুকু কম নয়। সিরিন বল্লে, তা আমি জানি। প্রিয়দর্শন তখন ক্রশবেল্ট খুলে ছুড়ে ফেলে দিলে, কোটটাকে ফেললে। সমস্ত বন্ধন তার অসহ্য সেই কথাই সিরিনকে স্পষ্ট বোঝাতে চাইছে। সিরিন বল্লে, বুক ভরে বুঝেছি,—বুক পেতে সইছি, কি করবো বলো? প্রিয়দর্শন বল্লে,—এসো চলে। সিরিনের ইঙ্গিত নীরব, ভাবলো, আজ তাকে নিরাশার কথা বলবে না! প্রিয়দর্শন বল্লে, তুমি দাঁড়াও—যেয়োনা। আমি পাচ্ছি না নিজেকে শান্ত করতে। বলে হাত দু'টো কপালের ওপর উল্টো করে রেখে নীরবে বসে রইল।

রাত হয়ে গেছে, ডিনারের জন্য প্রস্তুত হতে বলতে এলো একজন অফিসার। সিরিন তখন আলোটা দিলে কমিয়ে। ওদের কি কথা হলো। তারপর সে চলে গেল। প্রিয়দর্শনের কাছে এলো চায়ের পেয়ালা। ওতে বুঝি কফি ছিল, সেটা পড়ে রইল টেবিলে। সে নীরবে বসে আছে। সিরিন কি বলবে, কি করবে, ভেবে পাচ্ছেনা, কেন এমন অধীর হলো প্রিয়দর্শন? হবে না কেন? সে যে জীবন্ত, জীবনের নিয়মকে অস্বীকার করতে পাচ্ছে না। রাত্রিবেলা এতক্ষণ এ তাঁবুটায় এর আগে কোনদিন থাকে নি, আর আজ এখান থেকে যেতে পাচ্ছে না।

সিরিন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বসছে,-বুকে যে অশান্ত ঝড় বইছে, তাকে চাপা দিতেই হবে, নয় প্রিয়দর্শনকে আরও অশান্ত করে দেবে যে।

শিবিরে ঘুমোতে-যাবার ঘণ্টা বাজলো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঘণ্টার পর এ তাঁবুতে আর থাকতে পারে না। তখন আরও সামনের দিকে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে চোখ-দুটো বন্ধ করে বল্লে, যাই?

সিরিন হাত দু'টো জুড়ে তার ওপর মাথাটি নুইয়ে বল্লে, ঘুমোও গিয়ে। প্রিয়দর্শন বল্লে,—ঘুমোনো অসম্ভব। তবে যেতেই হবে ঘুমোতে,—বলে বাতি নিভিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সিরিন এসে শুয়ে পড়লো বিছানায় শয্যা-কণ্টকের উপর।

পরের দিন খুব ভোরে উঠেই তাঁবুর দিকে চেয়ে দেখলে, তখনও অন্ধকার রয়েছে, কেউ কোথাও নেই। প্রাত্যহিক নিয়মে দেহ চর্চা শেষ ক'রে ফুলের গোছা হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়দর্শনের প্রতীক্ষায়, প্রিয়দর্শন স্লিপিং সুটের উপর ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে ঘুম চোখে এসে দাঁড়ালো। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপাল ঢেকে

দিয়েছে, এক হাতে চুল ঠিক করতে করতে অন্য হাতে ড্রেসিং-গাউনটা পরতে পরতে এগিয়ে এলো একেবারে তাঁবুর বাইরে। সিরিন ফুলের গোছাটা উঁচু করে ধরলে, হাতটা কপাল পর্য্যন্ত তুলে অভিবাদন জানালো। বল্লে, ছুড়ে দেবো? প্রিয়দর্শন বল্লে,—না, ঠিক জায়গাতেই জমা থাক।

সিরিন দেখ্‌লে চায়ের ট্রে এসে হাজির। তখন মনে পড়লো সেদিনের কথা। তাড়াতাড়ি গিয়ে বলে এলো তার চা আনতে, নয় আবার প্রিয়দর্শনের চা হবে ঠাণ্ডা।

ঠিক তাই হলো। প্রিয়দর্শন চা ঢেলে ইশারায় বল্লে,—তোমার চা কই? একসঙ্গে না হোলে খাবো না। সিরিন তখন ছোট কিল দেখালো, প্রিয়দর্শন ড্রেসিং গাউন সরিয়ে বুক দেখিয়ে দিলে—পেতে আছি। সিরিন রাগ দেখিয়ে সরে এলো।

চায়ের পেয়ালা এসে গেছে, সিরিন বল্লে—খাও এখন।

এ দুষ্টুমিটুকুতে প্রিয়দর্শন বেশ প্রফুল্ল হলো। সিরিন ভাবলে, যেটুকু সময় ওকে দেখতে পাবে, দুষ্টুমী করে ওকে খুশী করবে। এ কদিন সঙ্গীদের ভিড়ে ক্ষণেক দেখার অভাবে সে এতখানি চঞ্চল হয়েছে। একটু পরেই চা খাওয়া শেষ করে সে চলে গেল। আজ সিরিন একখানা কাগজে বড় বড় করে লিখে রাখলে, জানো আমি সাম্যবাদী! তোমার আর আমার পথে কত তফাৎ।

দুপুরে প্রিয়দর্শন এসেছে সঙ্গীদের সঙ্গে। এসেই সিরিনকে বল্লে, একটু পরে এরা চলে যাবে। সিরিন সরে এলো জানলার পাশ থেকে। অন্য অফিসাররা কেউ কোনদিন এতটুকু অসভ্যতা করেনি,—কিন্তু যদি ওদের সন্দেহ হয় প্রিয়দর্শনের উপর?

একটু পরেই রেডিও চালিয়ে সঙ্কেত জানালো—সিরিন এলো জানলার ধারে। ইশারা করে বল্লে,—দূরবীন আনো। প্রিয়দর্শন নিয়ে এলো। সিরিন তখন লেখা কাগজখানা তুলে ধরলে। পড়ে প্রিয়দর্শন বল্লে, বুঝেছি, কিন্তু তাতে কিছু হবে না।

সিরিন ঠিক বুঝলে না, তবে এখন আর প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। নিকটে এলো একজন সৈনিক—খামে বন্ধ একটি চিঠি এনে প্রিয়দর্শনের হাতে দিলে। খাম খুলে পড়ে প্রিয়দর্শনের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। সিরিন বুঝতে পাল্লে না, কি হলো! প্রিয়দর্শন সিরিনকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরের দিকে চলে গেল, ফিরে এসে সৈনিককে একখানা কাগজ দিয়ে বিদায় দিলে; তারপর একটা কাগজে বড় বড় করে কি লিখলে। লিখে সেটার ওপর মোটা একখানা কাঁচ ধরে সিরিনের সামনে রাখতে লাগলো। অক্ষরগুলো বেশ বড দেখালো। সিরিন পড়তে পারলে—ক দিনের জন্য অন্যত্র যাচ্ছি। আবার ফিরবো। কতদিন পরে জানিনা, তবে দেরী হবে না।

সিরিনের মুখ মুহূর্ত্তে মলিন হলো। মনের ভাব চাপতে চাইলে প্রিয়দর্শনের সামনে, কিন্তু সফল হলো না। প্রিয়দর্শনও অত্যন্ত গম্ভীর, বয়কে ডেকে কি বল্লে। বয় একটু পরেই স্যুটকেশ, হোল্ডঅল, কিট্‌ব্যাগ এনে হাজির কল্লে। প্রিয়দর্শন ঐখানে সব গোছাতে লাগলো। চোখের দৃষ্টি কিন্তু সিরিনের উপর থেকে সরতে চায় না! জামা, কাপড়, বিছানা, কাগজপত্র সবই গোছানো হলো। ভৃত্যকে বললে, দুপুরের খাবারও ঐ ঘরে আনতে। ঐখানে বসেই সামান্য কিছু খেয়ে নিলে, জিনিষপত্র গাড়ীতে বোঝাই হলো। একটিবার মাত্র ভিতরের তাঁবুতে গিয়ে পোষাক বদলে এলো, তারপর সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ালো এসে তাঁবুর সামনে। শত চেষ্টাতেও বিষন্ন ভাব চেপে রাখতে পাচ্ছে না। কেমন করে

সিরিনকে সান্ত্বনা দেবে ? অনিশ্চিত সময়, নিজেও জানেনা, কবে ফিরবে। এই তো সৈনিকের জীবন—তাদের কি এতখানি বন্ধনে আটক পড়া সাজে ? কিন্তু কে রোধ করবে এই আকর্ষণ ?

সিরিনের কাছে সবই যেন শূন্য হয়ে এলো। ঐ তাঁবু দেখতে হবে রোজ শূন্য ?—না, এখন নয়, হাসিমুখে প্রিয়দর্শনকে বিদায় দেবে।

প্রিয়দর্শন টুপিটি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো, আবার ঘড়ি দেখ্‌লে, তারপর আস্তে আস্তে টুপিটা তুলে বল্লে,—আবার দেখা হবে। সামরিক অভিবাদন জানিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো—যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, মোটরের মধ্য থেকে মাথা বার করে দেখতে লাগলো। সিরিন নীরবে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে রুমাল নাড়তে লাগলো।

গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেলে শূন্য তাঁবুর পানে একবার চাইলো। মনে হলো, সব শূন্য! কেমন করে দিন কাটবে? কোন শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় কালকের ভোরের সূর্য্য আলো দেবে ?

বিকেল বেলাটা অসহ্য—তাই চলে গেল নীচের তলায় তার ইয়ার্ডের কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে। সরকারী কর্ম্মচারী, তাতে কি! এই মহিলার সঙ্গে সে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় করেছে, যার ফলে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা যথেষ্ট করতে পারে। মহিলাটিও ভালো বংশের মেয়ে এবং শিক্ষিতা। সিরিন এই মহিলার সঙ্গে ইণ্টেলেকচুয়াল আলোচনা করে। বেশ আনন্দ পায়। তার আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা করবার মতো হৃদয়বৃত্তি এবং বুদ্ধিমত্তা আছে মহিলার! সিরিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে। সাম্যবাদীনীতি, সমাজনীতি, বিশ্বের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাল ভাল বই আনিয়ে একসঙ্গে দুজনে বসে পড়ে। বাইরের দিক দিয়ে এই মহিলা সিরিনের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখার ভাণ করেন। সিরিনও আইন মেনে

চলায় ত্রুটি রাখে না ; এবং সে যে খুব ভয় করে ঐ মহিলাকে, বাহিরে এমনি ভাবই দেখায়।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়ে এলো বিশেষ আলোচনায়। এবার তাকে সেলে তালাবন্ধ হতে হবে,—প্রতিদিনের এই ক্ষণটি যে কি তীব্র অনুভূতি জাগায়, তা বলে প্রকাশ করা যায় না! জীবন্ত মানুষের বন্ধনের জ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠে প্রতিদিনই সমানভাবে।

বন্ধ হবার পর বাতিটা দিলে কমিয়ে। একবার জানলায় উঠে দাঁড়ালো। তাঁবুতে তখনো আলো জ্বলছে, কিন্তু সে আলো সিরিনের মনে হলো, অন্ধকার! তখনি নেমে পড়লো। লেখা-পড়া বা কোন কাজ আর হলো না। শুয়ে পড়লো বিছানায়। সত্যই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে প্রিয়দর্শন? ফিরবে তো? এই ক্ষণেকের পরিচয়ে এমন প্রাণ-মাতানো আকর্ষণ, সব বুঝেও কেন সিরিন এমন আগুন নিয়ে খেলা করতে গেল? এ-আগুনের দহন-জ্বালাই শুধু তাকে তিলে-তিলে দগ্ধ করবে!

এতখানি অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে এমন করে কেন জড়ালো নিজেকে? এই ক্ষণেকের আতিথ্য তার জীবনে শান্তির হবে না, কেন সে এমন করলে? আর পারে না সে মনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে! ···বেদনার বোঝা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন তাকে চাপতে যাওয়া বা ভোলাতে যাওয়ায় সাজা বড় কঠোর হয়,—তাকে বুক ভরে সইতে পারা যেন পরম উপভোগ!

সাত দিন কেটে গেল,—সিরিনের মনের অশান্ত ভাব একটুও কমলো না। কতবার জানলায় উঠে দাঁড়ায়, সন্ধান করে, প্রিয়দর্শন ফিরেছে কিনা। কিন্তু সব শূন্য! এই নির্ম্মম কারার নির্জ্জন কক্ষে কতকাল কাটালো সিরিন,—দুনিয়ার সঙ্গে ব্যবধান টানবার মতো

যত নিষ্ঠুরতা হতে পারে, তার চরম ব্যবস্থাও জেলখানায় করা আছে। দিনের পর দিন সয়ে আসছে সিরিন, কিন্তু আজ এ কি হলো,—এমন শূন্যতার তীব্র অনুভূতি তাকে অধীর করলে কেন? কেন?

এবার মনকে ফেরাবে সে। এইখানেই থামবে। আর নয়। এতটা পর্য্যন্ত সহনীয় হয়েছে, প্রিয়দর্শন ফিরে আসবে ভাবতে পাচ্ছে,—কিন্তু কোনদিন যদি জানতে পারে ফ্রন্টে যাবার অর্ডার এলো প্রিয়দর্শনের,—সেদিন? যে-কোন মুহূর্ত্তেই তো তার এমন দিন আসতে পারে,—ওরা তো মরণ-পথেরই যাত্রী!

এদিকে প্রহরীদের সেই মাগ্‌গী ভাতার দরখাস্তের জবাব আসার দিন চলে গিয়েছে। শেষ চরম-পত্র দিয়ে তারা ধর্ম্মঘট সুরু করবে বলেছিল। এই প্রদেশের অন্যান্য জেলার জেলে সর্ব্বত্র যে চিঠি পাঠিয়েছিল তারা, তাই মেনে সঙ্ঘবদ্ধ-প্রহরী ধর্ম্মঘট সারা প্রদেশে একদিনেই সিদ্ধ হলো—ওদের সঙ্গে বহু পুলিস-প্রহরীও যোগ দিলে। এত বড় ধর্ম্মঘট আর কখনো হয়নি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস এবং উপর-ওয়ালা কর্ম্মচারী দিয়ে সারা প্রদেশের জেল-পাহারা সম্ভব হলো—কিন্তু জেলের সব কাজ বন্ধ। মিলিটারী ফৌজ এনে তাদের পাহারায় কয়েদীদের স্নান-আহারের জন্য বাইরে এনে বাকী সময় তালা-বন্ধ করে রাখায় সিরিন কয়েদীদের জানালে, তোমরা গোলমাল সুরু করো, বিনা-কারণে তোমাদের দিনের বেলা বন্ধ রাখা বেআইনী—জেল-কানুনে এ বিধি নেই। তারাও সুরু করলে গোলমাল—প্রদেশ-ব্যাপী এই বিশৃঙ্খলায় গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দাবী পূর্ণ করলে। ধর্ম্মঘট সফল হল।

এর পর প্রত্যেকটি প্রহরী সিরিনকে দিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি। কৃতজ্ঞতা-

ভরে জানালে, তোমার জন্য যা করবার, আমাদের সকল শক্তি দিয়ে সর্ব্বদা ত করবো। সিরিন বল্লে,—আমার জন্য কিছু করতে হবে না। আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই! আমি যা-কিছু করি, তা তোমাদের জন্য—তোমরা সেটুকু বুঝলেই আমার সব-কিছু কাজ তোমাদের দিয়েই হবে।

তারা সব কথা যে পরিষ্কার করে বুঝলো, তা নয়। তবে এটুকু বুঝলো, সিরিন তাদের দুঃখ-পীড়ন-ভরা বুকের জ্বালার কথাই বলে —এবং যা কিছু করে, তা সেই পীড়ন-অত্যাচার রহিত করার জন্য।

এ সমস্তই গোপনে হচ্ছে—কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই জানতে পারে না। সিরিনের বাইরের কাজও এই ভাবে হয়ে চলেছে। এতখানি কড়া পাহারা ও নিষেধের মধ্যেও তা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। অত্যন্ত হুঁশিয়ার! এবং ঐ সব প্রহরী এবং পাঁচ-দশজন মাঝখানকার জেল-অফিসারদের সাহায্যে এবং সহানুভূতিতেই এতখানি গোপনতা বজায় রেখে সিরিন সব করে চলেছে।

পনেরো দিন কেটে গেছে—সিরিন আর জানলায় দাঁড়ায় না। মাঝে মাঝে শুধু দেখে, তাঁবুটা আলো হয়েছে কিনা! শূন্যতার আঁধার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এই জানলাটা দিয়ে কত মধুর স্বপন-রচনা, ঐ ফাঁকটুকুর মাঝ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আঁকা আর কত কবিতাই না সৃষ্টি করতো—আজ তার সব গিয়েছে হারিয়ে। দুপুর বিকাল সব সময় জেল-কর্ত্রী বান্ধবীর সঙ্গে সে গল্প-আলোচনা করে কাটায়। বাইরের কোন খবর তার জানতে বাকী থাকে না, যেখানে মাত্র আত্মীয়-স্বজনের দৈহিক কুশল ছাড়া আর কিছুই

জানবার উপায় নেই—কঠিন বিধি-নিষিধের মধ্যেও প্রাত্যহিক রেডিও বার্ত্তায় সারা জগতের সংবাদ তার কাছে যথা-নিয়মে পৌছায়। যুদ্ধের সংবাদ এবং বিশ্বের সংবাদ আজ ওত-প্রোতভাবে জড়িত।

সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি কাটে তার লেখাপড়ার কাজে,—কিন্তু এত কাজে নিজেকে নিয়োজিত এবং ব্যস্ত রেখেও মন মাঝে মাঝে কোথায় দৌড় দেয়—সব যায় কেমন হয়ে!

আজ দুপুরে ছুটির দিন ছিল,—সারা আকাশ মেঘে ভরা, মাঝে মাঝে এক-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে, আবার আকাশ স্বচ্ছ হয়ে ধারা-স্নাত পর্ব্বতের সবুজ রংকে জীবন্ত করে তুলছে। বান্ধবী আসেনি ছুটি বলে'। সিরিন আজ অনেক দিনের পর জানলার ধারে চেয়ার নিয়ে বসেছে,—আগের মতো শুধু বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করছে—যে-দিনগুলো এমনি করেই কাটিয়েছে, তেমনি দিনে আবার ফিরে যেতে চায়! কিন্তু তা কি আর হয়?

হঠাৎ শুনলো মোটরের হর্ণ···বারে-বারে বাজছে। একটু চমক লাগলো। মিলিটারী-ট্রাকের শব্দ সব সময়েই শোনে,—হর্ণও সব সময়ে বাজে কিন্তু এতক্ষণ ধরে কেন বাজছে ইলেকট্রিক হর্ণটা? উঠে দাঁড়ালো জানলায়।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের আলোকছটায় পাহাড়ের গায়ের সবুজ গাছগুলো ঝক্‌-ঝক্‌ কচ্ছে—তাঁবুর সামনেকার ঝাউ-গাছগুলো চামর দুলিয়ে পথকে স্নিগ্ধ রমণীয় করেছে। তারই মাঝখানে সাদা ধপ্‌ধপে তাঁবুগুলো। এমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে প্রিয়দর্শন বিহ্বল-করা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মোটরের ফুটবোর্ডের উপর এক পা আর-এক-পা

পথে। ওভারকোটটা হাতের উপর ফেলা। সন্ধানী দৃষ্টিতে চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে!

সিরিনকে দেখেই টুপি নামালো মাথা থেকে, পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো মুখ। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সিরিন হাত নেড়ে অভ্যর্থনা কল্লে! তখন মোটরের জিনিষপত্রগুলো নামাতে বলে প্রিয়দর্শন তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো। ওভারকোট এবং টুপিটা রেখে আবার বেরিয়ে এলো সামনে—ইশারা করে বল্লে,—এসেছি তো? সিরিন কি-জবাব দেবে, বুঝতে পাচ্ছে না। কিছু না ভেবেই খুশী-ভরা হাসি মুখে মাথা নাড়লে। প্রিয়দর্শন একটু দাঁড়াতে বলে তাঁবুর মধ্যে গেল। এ সময় কজন অফিসারও ছিল তাঁবুতে, তাই বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে ইশারা করতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার দৃষ্টি একবারও সিরিনের জানলা থেকে সরে না! কখনও বা অবিন্যস্ত চুলগুলোকে হাত দিয়ে এলোমেলো করবার ছলে সিরিনের দিকে হাত বাড়ায়, কখনও সিগারেট ধরায়! সজীব চঞ্চলতা তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। সিরিন মুগ্ধ অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেতে করে বয় খাবার আব চা নিযে এলো। টিপয়টা একেবারে তাঁবুর সামনে এনে সিরিনের দিকে চেযে চা ঢালতে বসলো। চা পেয়ালায় না ঢেলে ফেললো ট্রেতে,—বয় তাড়াতাড়ি এসে আবার ট্রেখানা পরিষ্কার করলে। প্লেটে খাবার পডে রইল,—সে চা খেতে আরম্ভ কল্লে। সিরিন বল্লে—খাবার খাও। তখন তুলে নিলে খাবার। চা খাওযা আর শেষ হয় না, সময়কে এমনি করে যেন আটকে রাখবে!

সিরিন আবার ভাবতে লাগ্‌লো, কেন আবার এমন করি? ও যে ক্ষণেকের অতিথি! জীবনের এমন মুহূর্ত্তে আমার প্রাণে তুফান তুলেছে, হাল ধরা যে বড় দুঃসাধ্য! সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলে গেল।

প্রিয়দর্শন বুঝি বুঝতে পারলে,—নিঃসংশয় হবে বলে কাঁধে-ঝোলানো বায়নাকুলারটা খুলে চোখে লাগালো। সিরিনকে বিষণ্ণ ম্লান দেখে কি হলো? কেন আজ এমন কচ্ছো? আমি আজ বড় বেশী অশান্ত, প্রশ্ন করলো,—বুঝতে পাচ্ছনা? ইশারা করলো দু'হাত নেড়ে, বল্লে—না, না, অমন করোনা, একটু প্রফুল্ল হও।

সিরিন চেষ্টা করে একটু প্রফুল্ল ভাব আনলো, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ও তো আবার চলে যাবে দূরে—সে যাওয়া বন্ধ করবার ক্ষমতা ওর নেই! সে-দূরত্ব ভাবতেও শিউরি উঠছে! আর যেদিন বুক ভরে সইতে হবে—সে-দিন? না, না, আর পারে না ভাবতে!

তার এই চিন্তার মধ্যে প্রিয়দর্শনের সঙ্গীরা বাইরে যাবার পরিচ্ছদে হাজির হল,—এবার ওকেও যেতে হবে, তাই একবার মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সিরিনের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে জানালো, এখনই ফিরে আসবো,—একবার যেতেই হবে। সিরিন প্রফুল্ল ভাব দেখিয়ে বল্লে,—হ্যাঁ, যাও। আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো। প্রিয়দর্শন সেই পরিচ্ছদেই আবার বেরিয়ে গেল। পথে যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, ফিরে ফিরে চাইতে চাইতে!

সিরিন বুঝলো, আজ ওর মন কতখানি চঞ্চল। ভেবেছিল, কিছুক্ষণ বোধ হয় আজ থাকতে পারবে! তা হলো না। কেন ও বুঝছে না? সব জেনে এমন করে' আগুনে হাত দিচ্ছে কেন? আর আমি? আমি যে শুধু রূপের পূজা করতে গিয়েছিলাম,—আমার ছবি আঁকা শেষ হলে সেই তুলি নিয়ে অন্য পটে আমার সৌন্দর্য্য-সাধন পূর্ণতা পেতো, কিন্তু তুমি আমার এ কি করলে? কেন প্রাণের ছোঁয়া দিলে, বীর? তোমার চলন্ত জীবনের গতি আমার প্রাণে তড়িৎ বহিয়ে দেয়! এ প্রাণের তন্ত্রীতে যে-সুর মেশালে, তার ঝঙ্কারে মিলন

বীণা যে বাজবে না—এত-বড় কঠিন অন্তরায়—অসহনীয় বিচ্ছেদ-ব্যথাই এর পরিণতি! তবে? কেন তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন চিন্তাই করি?

আজও করছিল—ইতিমধ্যে প্রিয়দর্শন কখন ফিরে এসে চঞ্চল প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে দেখে সিরিন উঠে জানলায় দাঁড়ালো। মুখ তার অত্যন্ত ম্লান, চোখে-মুখে নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রিয়দর্শন আর স্থির থাকতে না পেরে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে একটা কাগজে কি লিখে নিয়ে এলো। অক্ষরগুলো বেশ বড়ই ছিল, তার উপর একটা গোল ফ্রেমে আঁটা কাঁচ ধরলে। তাতে লেখা ছিল,—পড়তে পাচ্ছ? সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ। তখন প্রিয়দর্শন আর একটা কাগজে লিখলে,—তুমি কি বুঝতে পারো না, তোমার দর্শন-আকাঙ্খায় আমার প্রাণে কতখানি ব্যাকুলতা! এই দীর্ঘ দিনের অদর্শন আমায় কত অধীর করেছে তুমি তা কল্পনা করতে পারবে না। কেন তুমি এমন বিষণ্ন ম্লান? আমি ফিরে এসে তোমার এ পরিবর্ত্তন দেখে একটুও স্থির থাকতে পাচ্ছিনা। জানি, দারুণ বিপদের মধ্যে আমাদের এই মুহূর্ত্তটুকু পেতে হয়—নূতন কোনো বিপদ হয়েছে কি—তাই তুমি বেশী সতর্ক?

সিরিনের প্রাণের প্রতিটি তন্ত্রে অক্ষরগুলো তুফান তুললো। কি বলবে? কোন উত্তর নেই! হাতদুটো একখানা রুমালে বেঁধে দেখালো,—আমার কোন উপায় নেই! কি করে' তোমার কথার উত্তর দেবো?

প্রিয়দর্শন আবার লিখলো,—সব বন্ধন ভেঙ্গে চলে এসো! আমি আর পাচ্ছিনা এত-বড় ব্যবধান সহ্য করতে।

সিরিন বল্লে,—তুমি তো পারো আমায় সাহায্য করতে,—তুমি মুক্ত।

প্রিয়দর্শন বল্লে,—কি সাহায্য, বলো···প্রাণ দিতে হলেও আমি তা করবো।

সিরিন ইশারা করে বল্লে,—লিখে আমি তোমায় সব জানাব।

প্রিয়দর্শন বল্লে,—জানোতো আমার কি কড়া বিধি-নিষেধ!

সিরিন উত্তর দিলে,—খুব ভালো করেই জানি,—তেমনি হুঁশিয়ার হয়েই দেবো চিঠি।

প্রিয়দর্শন একটু খুশী হলো, বল্লে,—আর বিষণ্ণ মলিন মুখে থেকোনা—তাড়াতাড়ি জানলা থেকে চলে যেতেও চেয়োনা,—আমার সর্ব্বক্ষণের একমাত্র আনন্দ এই মুহূর্ত্তটুকু! সিরিন ভাবলো, তাই তবে হোক—ভালো করেই আমার সর্ব্বনাশ! অসহ্য দহন-জ্বালাই এর পরিণতি জানি, তবু ওকে কণা মাত্র ব্যথা দেবোনা।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, প্রিয়দর্শন একা রয়েছে, সঙ্গীরা কেউ আসেনি। সিরিনের উত্তরের পর সে খুব খুশী-মনে দুষ্টুমী আরম্ভ করেছে,—তার স্প্যানিশ কুকুরটাকে নিয়ে কত খেলা কচ্ছে। সিরিনকে জিজ্ঞেস্ কল্লে,—তুমি কুকুর ভালবাসো? সিরিন বল্লে,—খুব। প্রিয়দর্শনের মনে জাগলো ফন্দী, তাঁবুর মধ্যে গিয়ে একটা গ্লাসে লাল মতো কি একটা ঢেলে এনে সিরিনের দিকে তুলে ধরলে,—তারপর একটু একটু করে পান আরম্ভ কল্লে। সঙ্গে সঙ্গে সিরিনের মুখ হলো গম্ভীর।

অন্ধকারে যদিও গম্ভীর মুখ ঠিক দেখতে পাচ্ছিলনা, তবু তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সব রকম দুষ্টুমীতেই নিরুত্তর দেখে প্রিয়দর্শন পড়ে গেল মুস্কিলে। তাড়াতাড়ি লিমন-স্কোয়াশের বোতলটা এনে সিরিনকে দেখালে। হাত নেড়ে কত কি বোঝালে, শেষ-পর্য্যন্ত আবার একটা কাগজে লিখে সেই মোটা কাঁচের ফ্রেম ধরলে; এবং টর্চ্চের আলোটা ফেলে সিরিনকে দেখালে,—একটু ভয় দেখিয়েছি মাত্র,—আমি মদ

কোনদিন খাইনা, এবং খাবোও না। তোমার গম্ভীর হবার কারণ নেই,—একটু দুষ্টুমী করছিলাম, তাও তোমার সহ্য হলো না?

সিরিন খুব খুশী হয়ে রুমাল নেড়ে জানালে,—বুঝেছি তোমার দুষ্টুমী। তারপর একটি কিল্‌ দেখালো। প্রিয়দর্শন তাড়াতাড়ি কোটের বোতামটা খুলে দিলে, বল্লে,—বুক পেতে দিলাম। সিরিন বল্লে,—বুক পেতে শুধু এইটুকুই নেবে? প্রিয়দর্শন বল্লে,—পরীক্ষা করো, কি নিতে পারি। সিরিন বল্লে,—পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আমি মনের লেখা পড়তে পারি!

একদণ্ড রাত হয়ে গেছে,—সঙ্গীরা খাবার জন্য একে একে এসে উপস্থিত হলো। প্রিয়দর্শন বল্লে,—মন রইলো তোমার কাছে,—দেহটাকে টেনে নিয়ে যাই, অপ্রিয় অভিনয়ে।

রাত্রে সারা কারাগার যখন নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে যেতো—সিরিন প্রহরীদের সঙ্গে তার কথা আলাপ ও বাইরের যোগসূত্রের ব্যবস্থা ঠিক করতো। কজন প্রহরী তার অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝেও তারা সিরিনের কাজগুলি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে করে যেত। আজ রাত তিনটের সময় যে প্রহরী বদলী হবে, তার সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল, সে এসে সঙ্কেত জানালেই সিরিনের লেখার বাণ্ডিল যাবে যথাস্থানে।

সিরিন বসলো লিখতে,—কি বলে আরম্ভ করবে—কি কথা জানাবে, অসংখ্য কথা, অদমনীয় ভাবোচ্ছ্বাস মনে জমলো। কেমন করে তাকে সুসংযত করে সাজাবে—এ এক নূতন অনুভূতি,—অকল্পনীয়-ভাবে-পাওয়া স্বর্গীয় সম্পদ! কখানা কাগজ নষ্ট হলো, লেখা আর শেষ হয়না!—ছোট্ট দু'কথা লিখবে? কিন্তু তা কি হয়?…শেষ পর্য্যন্ত যুক্তির কাছে হার মেনে লেখা সুরু কল্লে—

ওগো কল্পনীয় সুন্দর সুচরিত সাহসী প্রাণ! কেমন করে তুমি

আমার মানস-নিখুঁত অঙ্কন--অভিনব সুন্দরকে পরাভূত করে' বাস্তবে আমায় প্রত্যক্ষ করালে? তুমি কি জানো প্রিয়দর্শন, তোমার দর্শন-আকাঙ্খা আমায় অধীর করেছে, উদ্‌ভ্রান্ত করেছে! আমি তোমার ভুবন-মোহন রূপের ছবি আঁকতে গিয়েছিলাম আমার সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ নিয়ে। আঁখি ভরে আমি তোমার চিত্তহারী রূপ দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তোমার জীবন্ত প্রাণের পরশমণির ছোঁয়ায় আমায় অধীর কল্লে কেন? তোমার সান্নিধ্য আজ আমার প্রতি পলের কামনা। কত বড় অলঙ্ঘ্য বাধা তোমার-আমার নৈকট্যের মাঝখানে—সে-কথা দু'জনেরই চিন্তা করবার অবসর রইল না। এর শেষ কোথায় ভাবলে সব অন্ধকার হয়ে যায়। তোমার পথ তোমার গতির সঙ্গে আমার জীবনের গতির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা যদিও প্রথম নীরবতা-ভঙ্গের দিনেই তুমি জানিয়েছিলে যে "আমার খবর তুমি জানো আমি সাম্যবাদী এবং সেই অপরাধে আমার স্থান এখানে"—কিন্তু সেটুকু জানাই সব নয়, আমাদের আদর্শে শ্রদ্ধা আছে অনেকের, কিন্তু প্রত্যক্ষে সে শ্রদ্ধাটুকু দেখাতে অনেকে ভয় পায়,—বিশেষ করে তোমাদের জীবনে অত্যন্ত ভীতি উৎপাদন করবে। তোমার ঐ যে কৃত্রিম আইনের লৌহ-বর্ম্ম, সে বর্ম্ম কি...

না, ও কথা আজ থাক, তুমি যখন আমাকে সাম্যবাদী জেনেও এতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছ, তখন তোমাকে আমার আদর্শের কথা জানাতেই হবে, এবং তার পর তুমি জানিয়ো কতটা সাহায্য আমায় করতে পারবে। তোমার সাহায্য পেলে আমি তোমার আহ্বানে এগিয়ে যাবো। উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় রইলাম বন্ধু। তুমি একটুও চিন্তিত হয়ো না, আমি নিরাপদে আদান প্রদান করতে পারবো,—আমরা বিপ্লবী, আমাদের পথ সর্ব্বদা বিপদসঙ্কুল, সে জন্য আমাদের

সতর্কতাও সুদৃঢ়। আমার লোক নিয়মিত সময়ে গিয়ে চিঠির উত্তর আনবে।—

সব ব্যবস্থা জানিয়ে চিঠি চলে গেছে প্রিয়দর্শনের কাছে। পরের দিন দুপুরে সিরিন অত্যন্ত চিন্তিত মনে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে, প্রিয়দর্শন প্রশ্ন কল্লে,—কি হয়েছে? সিরিন বল্লে,—কিছু না।

আজ তেমন সহজ ভাবে ইঙ্গিত করতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে একটি পাহাড়ী মেয়ে আয়ার বেশে এক-টুক্‌রো কাগজ এনে প্রিয়দর্শনের হাতে দিলে। প্রিয়দর্শন কাগজ পড়ে তাকে পথ বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত হলো,—মেয়েটি সেই অবসরে সিরিনের জানলার দিকে একবার তাকালো। সিরিন ওড়না নেড়ে জানালো,—ওঁকে দাও। বালিকা তখন বুকের মধ্য থেকে একখানা খাম বার করে প্রিয়দর্শনের হাতে দিয়ে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। প্রিয়দর্শন বুঝলো বালিকার ঠিকানা পড়াতে আসার মানে কি!

খাম হাতে প্রিয়দর্শন সিরিনকে অপেক্ষা করতে বলে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল, অল্প-ক্ষণ পরেই ফিরে এলো। সিরিন অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা কচ্ছিল, দেখলে, প্রিয়দর্শনের মুখ খুশীতে উজ্জল। সিরিন ইঙ্গিতে জানালে, ঠিক? প্রিয়দর্শন বল্লে,—হ্যাঁ। জবাব কাল পাবে।

বেশীক্ষণ আর দাঁড়ানো সম্ভব হলো না, ডিউটিতে যেতে হবে,—প্রিয়দর্শন বিদায় চাইলো।

সিরিন ভাবতে লাগলো, এই কটা ঘণ্টা কেমন করে কাটাবে সে! লেখাপড়া নিয়ে বসলো। অনেকগুলো প্রয়োজনীয় লেখা জমে ছিল—সেগুলো সহজেই শেষ করে ফেললে। কি যেন পাবার

আশায় অজানিত ভাবে প্রাণে পুলকের বাতাস আসছে,—আবার মাঝে মাঝে সন্দেহের দোলায় কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মনটা! সকালে দুপুরে —দুবারই প্রিয়দর্শনের দেখা পেলে, তার উৎফুল্ল উৎসাহিত ভাব সিরিনকে আশায় ভরপুর করে দিলে। প্রিয়দর্শন বল্লে,—উত্তর দিয়েছি। সিরিন নিশ্চিন্ত হলো। সন্ধ্যায় পাবে উত্তর।

সন্ধ্যার পর তালা-বন্ধ সেলে বসে প্রিয়দর্শনের চিঠির শীল খুললে। প্রিয়দর্শন লিখেছে—

ওগো আমার অচিন প্রিয়া, কোন্ অজানা দেশের অপরূপ সৌন্দর্য্য-ভরা পারিজাত তুমি…কেমন করে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে? আমার কাছে এ যে স্বপ্নের অগোচর ছিল, দূর থেকে শুধু এই দৃষ্টি-বিনিময়—তাও সহস্র বন্ধন ও নিষেধের মধ্যে—এ ভাবের পরিচয়ে যে এমন করে সব হারিয়ে যায়, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। জানো বন্ধু, জীবনে অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি—কিন্তু কোথাও মনের স্পর্শ পাই নি, দিইও নি এমনি করে—যা আজ কেবল মাত্র দৃষ্টির আকর্ষণে আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে! বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি খুব সচেতন, তাই অনেক সময় মনকে নিছক যুক্তি দিয়ে চালিত করি—ভাব-প্রবণতার স্থান আমার কাছে নেই। কিন্তু আজ এ কি হলো? তোমার রূপ তোমার চলন্ত জীবনের বিদ্যুৎ-রশ্মি আমায় আত্মহারা করেছে—অধীর করেছে। জানো কি বন্ধু, কত দাম দিয়ে দিনের ঐ তিনটি শুভক্ষণকে আমার পেতে হয়? তোমার চেয়ে আমার নিয়মের কঠোরতা একটুও কম নয়—তা তুমি জানো।

শুষ্ক কর্ত্তব্যের দহন-জ্বালায় মনের কাঠামোখানা এখন পুড়তে সুরু হয়েছে, আর যেন সইতে পারি না! তোমার সান্নিধ্য, তোমার স্পর্শ

মুহূর্ত্তের জন্য পেতে আমি আমার জীবন দিতে পারি। তুমি বুঝবে না বন্ধু, আমার এই অসহনীয় বিচ্ছেদ-ব্যথা! অন্যে হয়তো মনে করবে, এ আমার প্রাণের অত্যন্ত ভাবাবেগ! কিন্তু তুমি প্রাণময়ী, অন্তর দিয়ে তুমি অনুভব করবে, এ আমার প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন! এ আমার ক্ষণেকের আবেগ নয়, আমার কঠোরতম জীবনের ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ বা বিলাস নয়, বন্ধু। দিনের পর দিন আমি মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছি, দূরে চলে গিয়ে তোমার দর্শন-সুখে বঞ্চিত হয়ে চেষ্টা করেছি আমার দুরন্ত কামনাকে সংযত করতে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে, জানো? উত্তর কি পেয়েছি, জানো? অসম্ভব! তুমি ভিন্ন আমার জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না,—তোমার সঙ্গে আমার জীবন মেশানোই আমার আজ একমাত্র কামনা! আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি, জানাও। তোমাকে মুক্ত করবার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত! এ হলো সৈনিকের প্রতিজ্ঞা। আমি তোমায় ভালবাসি, সে ভালবাসার সীমা নেই, পরিমাপ নেই। তোমার আদর্শ বা কর্ম্ম-জীবনের কথা যদি আমায় বিশ্বাস করে জানাও—তাতে তোমার ক্ষতি হবে না। তোমার আদর্শ-বাদে আমার শ্রদ্ধা আছে। জীবনের গতি ভিন্ন-পথে চালিত হলেও তুমি আমাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারো। আমি আমার দেশের জনগণের নির্য্যাতিত জীবনের কথা জানি, আমি তাদের ব্যথা বুঝি—তাদের উপর আমার দরদ অনেকখানি—এর বেশী তোমাকে লেখার প্রয়োজন নেই।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম। আমার জীবনের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রতীক্ষা এ, জেনো। তোমায় আমি যখন ইঙ্গিতে ডাকি, সে আমার প্রাণের একাগ্র আহ্বান, মানব-জীবনের চিরন্তন মিলনাকাঙ্খা, অদমনীয় আকুলতার ডাক,—এসো বন্ধু—আর দেরী নয়।

চিঠি পড়া শেষ করে সিরিন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। অন্তরে তার কি দোলা দিচ্ছে, নিজে সঠিক যেন অনুভব করতে পাচ্ছে না! কিছুক্ষণ পরে সে উঠলো চিঠির জবাব লিখতে—মন তার স্থির। প্রিয়দর্শনকে বিশ্বাস করে সব কথা সে জানাবে। কত জনই তো বাস্তব অবস্থার মধ্যে অনুভূতি পেয়ে তাদের জীবনের গতি বদলায়—বিশেষ করে জগতের পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের বিকট মূর্ত্তি ওদের কাছে আজ যখন অত্যন্ত স্পষ্ট! বহুক্ষণ মনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের পর শেষ-রাত্রে বসলো চিঠি লিখতে। ভোরের মধ্যে পাঠাতে হবে চিঠি।

চিঠি আরম্ভ করতে গিয়েই মনে হলো এতখানি ভিন্নমুখী পথ এবং আদর্শ-বাদে এত বড় ব্যবধান—হয়তো সব যাবে স্তব্ধ হয়ে! এই চিঠিই হয়তো শেষ চিঠি হবে! আমি তো জীবনে অনেক সয়েছি কত বিরাট বুক-ফাটা বিচ্ছেদ-ব্যথা! কিন্তু প্রিয়দর্শন? ও যে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়বে। কোন্ আদর্শে লক্ষ্য রেখে মনকে স্থির রাখবার মত শক্তি ও পাবে? ওদের লক্ষ্য—কথার স্তূপ। তবু আজ লেখা দরকার—সে তো ভালো করেই খবর নিয়েছে, আমি রাজ-বন্দিনী, এবং তারপর আমার আদর্শ-বাদ ও জেনেছে। তা সত্ত্বেও দমেনি। এখন যদি বিয়োগান্ত নাটকে এ পরিচয়ের সমাপ্তি হয়, বুক ভরে ওকে তা সহ্য করতে হবে।

ঘড়ির কাঁটা সিরিনকে স্মরণ করিয়ে দিলে, আর দেরী নয়! লিখতে বসলো সিরিন—

ওগো ভাঙ্গার পথের যাত্রী, বীর যোদ্ধা সৈন্যাধ্যক্ষ, তোমার যোগ্য কথাই তোমার লেখনী প্রকাশ করেছে। শৌর্য্য বীর্য্য এবং প্রাণের চঞ্চলতাই

তোমার আবরণ, তোমার সুবেশ। তোমার সুগঠিত বলিষ্ঠ কান্তিতে উপছিয়ে পড়ছে তোমার সজীবতা। তুমি প্রেমিক, তোমার প্রেম-জ্যোতির বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাইরের রূপে তোমায় মূর্ত্ত করেছে, তাই তোমার গাম্ভীর্য্য ; আর সে গম্ভীরতা তোমার সুশিক্ষিত ব্যবহারে প্রকাশ পায়। তোমার সুদৃঢ় নিয়মানুবর্ত্তিতা সেই প্রথম দিনেই কর্ত্তব্যের সাড়ায় প্রকাশ করেছিলে! সেই মুহূর্ত্তে অন্তরের আকর্ষণ তোমার সন্ধান-প্রয়াসী হয়েছিল। সেই সৈনিককে তুমি তোমার সামরিক কৃত্রিম নিয়মে দণ্ডিত করোনি, মানুষ-মনের বিচারে তাকে অব্যাহতি দিয়েছিলে। সেই ঘটনাই আজ আমাকে এতদূরে এনেছে বন্ধু। ওগো সমর-পিয়াসী, প্রাণের দুর্ব্বার গতিকে আজ তুমি যে ভাবে চালিত করেছ, তার আসল গতি বিপ্লবের। তোমাদের নীতি আর ধারা সে পথের বিপরীত দিকে চালিত করে তোমাদের, তাই তোমরা সৃষ্টির পরিবর্ত্তে ধ্বংশের কাজে জীবন চালিত করে' জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে চলেছ! মানবী সংস্কারকে দানবীতে পরিবর্ত্তিত করেছ। প্রকৃতির নিয়ম পুরাতনকে ভেঙ্গে নূতনের সৃষ্টি করা—মানুষ সেই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রকৃতির নিয়মকে সুসভ্য মানুষ সমাজের কল্যাণের পথে সুনিয়ন্ত্রিত করবার পন্থায় মেনে চলে' সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্থাপনা করবে। বিজ্ঞান তার মহৎ অবদানে মানুষকে উন্নত করবে। বিজ্ঞানের প্রতিভা আজ নব-নব রূপে প্রকাশিত হয়ে অসাধ্য-সাধনের উপায় উদ্ভাবন করছে। জলে, স্থলে, ব্যোমে আজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দুর্জ্জয় শক্তিকে মানব-সংস্কার-বিকৃতকারী সুবিধাবাদী নরভুক্‌রা সর্ব্বধ্বংশী কাজে ব্যবহার করছে। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের মানুষও আজ বস্তু-বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি-নিকটে সহজলভ্য। কিন্তু আমরা তার বিনিময়ে কি পাচ্ছি? অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, আর সীমাহীন দূরত্ব।

প্রকৃতির নিয়মে মানুষের মধ্যে যে সংগ্রাম-কারিণী শক্তি দুর্ব্বার ক্ষমতা নিয়ে বিরাজ কচ্ছে, সে শক্তিকে মানুষ শুধু প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে' প্রকৃতিকে জয় করে বিরাট মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ক'রে সভ্যতার বিকাশ করতে পারে। তার পরিবর্ত্তে আজ সেই সংগ্রাম-কারিণী শক্তির বিপরীত ব্যবহারে আত্মহত্যা, আপন মানব-গোষ্ঠীর ধ্বংশে মানুষ নিজেকে হিংস্র পশুর চেয়েও হীনতম প্রতিপন্ন কচ্ছে।

একবার ভেবে দেখ বন্ধু, তোমার মতো সুন্দর শিক্ষিত প্রাণবন্ত মানুষ আজ কোন্ কাজে নিজেকে ধ্বংশের পথ সমর্পণ করেছে। যে সব গুণে এবং শিক্ষায় তুমি ভূষিত—নিঃসন্দেহে সে সবই বিপ্লবীর সূচী-পত্রে পাওয়া। কি ভাবে তোমরা তার অপব্যবহার কচ্ছো, তা তোমরা ভাবতে সময় পাও না? যে নীতি অনুসরণ করে তোমরা যুদ্ধ কচ্ছো, সে নীতিতে কোনো দিন শান্তি আসতে পারে না। শোষণ-নীতির উপর ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মূল নীতি আর অর্থনৈতিক-কাঠামোর প্রতিষ্ঠা। অগণিত জনগণকে নির্ম্মম ভাবে শোষণ করে কয়েকজন দুঃশাসন বসে ভোগ-বিলাসের মত্ততায় যথেচ্ছাচার করে চলবে এবং বিভিন্ন দেশের সমশ্রেণীর দস্যুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং উপনিবেশ ও বাজার নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারর জন্য প্রতি বিশ বছর অন্তর এই বিকট বীভৎস বিশ্ব-সমরানলের সৃষ্টি করবে, আর তোমরা তাতে যাবে অকারণে জীবন আহুতি দিতে! তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না? এই যে মাত্র বাইশ বছর আগে এমনি দানবী হত্যালীলা হয়ে গেল, সে ইতিহাস এখনও মনে জ্বলজ্বল করছে—চোখের সামনে জেগে আছে,—তোমরা তা দেখতে পাওনা বন্ধু?

তোমরা কি আজও বুঝতে পাচ্ছো না, এ যুদ্ধের পরিণামে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারীর কি দারুণ অবস্থা হয়েছে এবং হবে? যুগ-যুগ ধরে ঐ যে নরভুক্ দস্যুর দল এই ভাবে পীড়ন আর নির্য্যাতন চালিয়ে চলেছে, তার কণামাত্র পরিবর্ত্তন আর কোনো নীতিতে বা শাসনে সম্ভব নয়। বুকের রক্ত দিয়ে বিশ্বের যে শ্রেণীর কোটি কোটি নর-নারী ধনসম্পদ গড়ে তোলে, যাদের শ্রমে উৎপন্ন গ্রাস মানুষকে জীবনী শক্তি দেয়, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, ধরণীকে যারা ঐশ্বর্য্যময় করতে জীবনের বিনিময়ে সম্পদ আহরণ করে, তারাই জীবন-ধারণের মতো দু'বেলা দু'গ্রাস আহারও পূর্ণ ভাবে পায় না! শূয়োরের-কুঁড়ের চেয়েও নিকৃষ্ট স্থানে তারা বাস করে, অর্দ্ধনগ্ন দেহে আবরণ পেতে তাদরে মুখের গ্রাস সঙ্কুচিত করতে হয়, অথচ তারাই সৃষ্টি করেছে সব, উৎপন্ন করেছে সব। কিন্তু তারা নিঃস্ব, তারা সর্ব্বহারা। এর কারণ-সন্ধানের ক্ষমতা তাদের নেই। ঐ সব দস্যুর দল ভগবানকে খাড়া করে ধর্ম্মের আফিং খাইয়ে সকলকে অন্ধ করে রেখেছে, মূক করেছে, বধির করেছে। অস্ত্রের বল, বারুদের হুমকীর উপরেও আছে পরজন্ম এবং নরকের হুমকি—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ আর জাতির বিভিন্ন "বাদ" (ism) "নীতি" এবং রাষ্ট্রের নাম-করণ, বহু বহু ভাঁওতা এবং ধাপ্পার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বহুর শ্রম-মূল্যে অল্পের বিনা-শ্রমে মাৎসর্য্য-লিপ্সা এবং ভোগ-বিলাসের মূল নীতির পার্থক্য কোথাও নেই।

যুদ্ধরত সৈনিক যোদ্ধা তোমরা হয়েছ ঐ সব দুর্নীতি, বর্ব্বরতা এবং ব্যভিচারের ব্যবস্থা কায়েম করবার উপকরণ! নানা দেশের শোষক আর শাসকদের স্বার্থের সংঘাতের ফলে যখন এক দেশ বা এক জাতি অন্যের রাজ্য বা বাজার দখলের জন্য আক্রমণ করতে যায়, তখন তোমাদের ছেড়ে দেয় হিংস্র পশুর মতো রক্তপান করতে। তোমরাও

মন্ত্রমুগ্ধের মতো যাও তোমাদেরই সম-অবস্থার ভাইদের বুকে গুলি চালাতে—তাদের রক্ত পান করতে।

আচ্ছা, বলো তো বন্ধু, তুমি যাকে আজ শত্রু বলে হত্যা করতে চলেছ বা তোমার অধীনস্থ সৈন্যমণ্ডলীকে 'শত্রু বধ করো' বলে আদেশ নির্দ্দেশ দিচ্ছ, তারা কি কোনদিন তোমার বা সৈন্যমণ্ডলীর কোন শত্রুতা বা কোন অনিষ্ট সাধন করেছে? তোমার শাসক তোমার মনিব আজ তোমায় যে অবস্থায় রেখেছে বা এনেছে, ঠিক তোমার সম-অবস্থার প্রতিপক্ষ সৈন্যরা ও মধ্য-অফিসাররা এই একই স্বার্থ সিদ্ধ কচ্ছে। দেশ বা জাতির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা-রূপ যে অদৃশ্য বস্তু, বাস্তবে তোমরা তা অনুভব করতে পারো না। অর্থ-নৈতিক আর সামাজিক ব্যবস্থায় তোমাদের সঙ্গে আর তোমাদের শাসকদের সঙ্গে পার্থক্য আতলান্ত-মহাসাগরের নিম্নতা এবং গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার উচ্চতার মতো। কেন তোমরা তা বুঝতে পারো না যোদ্ধা? গত মহাযুদ্ধে তোমাদের পিতৃপুরুষরা যা করে গেছেন, তা' আর এক বিশ্ব-মহাসমরের বীজ-বপন মাত্র এবং সেই বিষবৃক্ষের ফল তোমরা ভোগ করছো। আবার এই বিশ্ব-মহাসমরে তোমরা যা কচ্ছো, সে-ও তোমাদের বংশধরদের জন্য আর এক তৃতীয় বিশ্ব-মহাসমরের বীজ-বপন।

গত মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ধাপ্পাবাজরা উচ্চকণ্ঠে পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের অনেক বাণী আউড়ে "লীগ অফ নেশন" সৃষ্টি কল্লেন, কিন্তু ঐ সব জালিয়াতদের প্রতিষ্ঠিত "লীগ অফ নেশনের" পরিচয় আর পরিণতি বোঝা গেল—দ্বিতীয় মহা-সমরের বারুদখানা ভিন্ন সে আর কিছুই নয়!

এবার যখন সাম্রাজ্যলোভী রণ-দানব চার্চ্চিল, হিটলার, মুসোলিনী

তোজো এবং ভণ্ডামীর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা রুজভেল্ট দুনিয়াকে ছারখার করবার সকল রকম বিধি-ব্যবস্থা স্থির করে’ হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে আরম্ভ কল্লেন, তখন নিজের নিজের দেশ ও জাতির জনগণের কাণে বড় বড় কথার ঝড় তোলা আরম্ভ হলো—“আমার দেশ”, “আমার জাতি”, “দেশের গৌরব”, “স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে” ইত্যাদি। ভ্রান্ত মূর্খ জনগণ ভাবলো, সত্যই বুঝি’দেশরক্ষা, জাতির স্বাধীনতা-রক্ষা —এ সবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সত্যকার সম্বন্ধ আছে! তারা দলে দলে চার্চ্চিল, হিটলার, মুসোলিনী, তোজো, রুজভেল্ট কোম্পানির কসাই-খানায় ছাগের মতো বলি হতে এলো।

প্রাণের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তোমাদের মতো জীবন এই ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে! তোমার মতো সুশিক্ষিত, পূর্ণনিয়মানু-বর্ত্তিতায় চালিত সেনাদল যদি আজ একবার বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে’ সত্যের স্বরূপ কি, তা দেখবার জন্য একবার যদি চোখ তুলে চায়, তবে তারা নিঃসন্দেহে ফিরে দাঁড়াবে নরকের পথ থেকে। —বিশ্বকে ওলট-পালট করার শক্তি তারা রাখে। যুগে যুগে ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে—কত রাজ্য, কত রাজাকে ক্ষণকালের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত করে অপরকে তোমরা সিংহাসনে বসালে। পৃথিবীতে যত বার বিপ্লব হয়েছে, যোদ্ধা সৈন্যরা এসেছে তার পুরোভাগে এবং তারাই এনেছে সফলতা।

এই বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তিকে তোমরা কোন্ কাজে প্রয়োগ কচ্ছো—একবার ভেবে দেখেছো? তোমাদের প্রভু, তোমাদের শাসক সাম্রাজ্যবাদী আর ধনতন্ত্রবাদীরা তোমাদের দিয়ে কি করাচ্ছে, বুঝতে

পারো? এই বর্ব্বর নর-রাক্ষস সর্ব্বধ্বংশী যুদ্ধে তোমাদের নিয়োজিত করে' অকালে অর্দ্ধস্ফুটিত সুন্দর তরুণ জীবনগুলিকে নিজেদের স্বার্থে তারা বলি দিচ্ছে। বিশ্বের প্রত্যেকটী মানুষ আজ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে যুদ্ধের বীভৎস নিদারুণ পীড়নে জর্জ্জরিত, লক্ষ লক্ষ মা আজ সন্তানকে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে হাহাকার করছে! লক্ষ লক্ষ দয়িত আজ প্রিয়হারা—বিচ্ছেদ-যাতনায় জীবনকে শুষ্কতায় শূন্যতায় ভরে নিষ্ঠুর দহনে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে! যে-সব ধনী ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিল, তারাও আজ এই বীভৎসতার বাইরে থাকতে পারে নি,—তাদেরও স্বচ্ছন্দতায় বিশেষ বিঘ্ন ঘটেছে,—পরিশ্রম করে অলস জীবনের মদ-মত্ততায় নিরাপদে চলতে পাচ্ছে না। তারাও জড়িয়ে পড়েছে।

আর যারা চিরশোষিত, বঞ্চিত, সর্ব্বহারা, যারা জীবনে পুরুষানুক্রমে যন্ত্রণা এবং অত্যাচার ভোগ কচ্ছে, এবং সেইটেই তাদের একমাত্র পাওনা বলে জানে,—তারা? এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের দেহের এবং মনের রক্ত নিংড়ে নিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম যন্ত্র প্রস্তুত করাচ্ছে! উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সহস্র গুণে বেড়ে শ্রমের কঠোরতায় তারা অর্দ্ধমৃতপ্রায়। এর ওপর খাদ্য-সঙ্কোচ, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী যত কিছু উৎকট বীভৎসতা—সব আজ একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মানুষের বিশ্বজোড়া জীবন্ত চিতা, জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করেছে! আর ধাপ্পাবাজ রণ-দানবের দল মুখে বড় বড় কথা বলছে, "দেশ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য তোমাদের কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন, ম'লে স্বর্গে যাবে" ইত্যাদি। ধন-তন্ত্রীরা বিজ্ঞানের অনেকখানিই মানে এবং তারা স্বর্গ-নরক কোনটাই বিশ্বাস করে না, কিন্তু জালিয়াতীর জন্য ঐ সব কথা বলে মানুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে।

তোমায় বলি আমার মানস-প্রতিম, তুমি সুন্দর প্রাণময়, তোমার

কাজ সুন্দর মানব-সমাজ-সৃষ্টির জন্য, পালনের জন্য—শ্রেষ্ঠ সুন্দর অন্তর-বাহির তুমি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কাজে প্রকাশ করো। তুমি আর তোমার সেনাদের অজেয় শক্তির সমন্বয়ে উচ্ছেদ করো ঐ মুষ্টিমেয় ক'জন দানব অত্যাচারীদের! চূর্ণ করে দাও ওদের কৃত্রিম আড়ম্বরে পাওয়া শক্তিকে! ওদের যা কিছু শক্তি—তোমরা। তোমাদের ছাড়লে ওরা একটি আঙুল নাড়বার ক্ষমতা রাখে না। বন্ধু, মুছে ফেলো চিরতরে মানুষের কলঙ্ক-কালিমা, বিশ্ব থেকে চিরদিনের মতো বর্ব্বর যুদ্ধের অবসান করে দাও, ফেরাও তোমাদের গতি সুন্দরের পথে। তোমরাই তা পারবে। ভাঙ্গা-গড়ার চলার পথে অগ্রদূত তোমরা! ওগো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ওগো প্রেমিক, তোমাতে যে সৌন্দর্য্য রয়েছে, তোমার প্রেমের ঝরণা-ধারায় তাতে স্বর্গ তৈরী করবে। বলতো প্রিয়, বসন্তের রঙ্গিন প্রভাতে যখন প্রাণ-পুলকিত-করা নানা গন্ধে-বর্ণে ফুল ফুটে ওঠে, —পাখীরা যখন প্রাণ-মাতানো গান গায়, প্রকৃতির অপরূপ শোভায় প্রাণের স্পন্দনকে যখন চঞ্চল করে, তেমন ক্ষণটিতে যদি তোমার আমার প্রাণ-ছাপিয়ে-ওঠা প্রেমের মিলন-গীতি গাইতে পারতাম, তা হলে যে স্বর্গ রচনা হতো, কবির-কল্পিত স্বর্গকেও তা কোথায় তলিয়ে দিত! কিন্তু বন্ধু, তার পরিবর্ত্তে আজ আমরা কি পাচ্ছি? আর কোথায় রয়েছি? অসহনীয় বিচ্ছেদ-ব্যথার হাহাকারে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি দুজনে। শুষ্ক কঠিন অর্থহীন নিয়মের বন্ধনে তুমি শঙ্কিত, নিরুপায়; আর আমার সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাচীরের রুদ্ধতার মাঝে সীমাহীন নির্য্যাতনে বন্দী-জীবনের কঠোরতা-ভোগ। একবার ভেবে দেখো বন্ধু, কোন্ প্রয়োজনে এবং কি উদ্দেশ্যে এই পাশবিক অত্যাচার সইছি —অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাস্তব অর্থ তার—বিকৃত মনুষ্য-সমাজের বিকৃত পৈশাচিক ব্যবস্থার ফল।

জানো কি বন্ধু, বেশীদিন আগের কথা নয়, তোমার-আমার দেশের প্রতিবেশী সেই রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে পৃথিবীর বুকে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত মানব-সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লব-সংগ্রামের কর্ণধার মহামানব লেনিন আর ট্রট্স্কি যেদিন জয়ী হয়েছিলেন,—সেদিন প্রধানত কাদের শক্তি, কাদের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে' তাঁদের সে জয়-লাভ সম্ভব হয়েছিল? তোমাদেরই মতো মধ্য-অফিসার সৈনিক নাবিক এবং সর্ব্বহারা শ্রমিক কৃষকের উপর।

সে সব সৈনিক অফিসার ছিলেন জারের অধীনে। জারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জারকে তাঁরাই করেন উচ্ছেদ। তারপরেও কিন্তু জাতির প্রতিনিধি-রূপে যখন ধনতন্ত্রী কেরেনেস্কি এসে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে চাইলেন, তখন যোদ্ধারা বুঝতে পেরেছিলেন কেরেনেস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ার কোটী কোটী নির্য্যাতিত জন-সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকবার অধিকার পাবেনা, তাদের সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ এবং প্রাণের বিনিময়ে যে বিজয় লাভ হযেছে, সে বিজয-সম্পদ সুবিধাবাদীর মতো কেরেনেস্কি আত্মসাৎ করবেন,—আর ঐ সর্ব্বহারার দল তাদের সর্ব্বস্বের বিনিময়ে অর্দ্ধাশনে অনশনে কোন মতে পশুর মত বেঁচে থাকবে! সহজ বুদ্ধিতে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অঙ্ক কষে মিলিয়ে এই সব তারা সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিল,—এবং সাম্যবাদী নেতা লেনিন আর ট্রট্স্কির নেতৃত্বে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব-সংগ্রামে জয় লাভ করে' সাম্যবাদী সমাজের প্রথম সোপান শ্রম-সর্ব্বস্বদের রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। মানবের চিরশত্রু দুর্জ্জয় সাম্রাজ্যবাদী জার এবং ধনতন্ত্রবাদী কেরেনেস্কির উচ্ছেদ তারা করেছিল—পৃথিবীকে স্তম্ভিত-করা নৈতিক জ্ঞান এবং অজেয় সংগ্রাম-কারিণী শক্তি দিয়ে!

রাশিয়া আজ জগতের আদর্শ স্বরূপ হয়ে কাজ করতে পাল্লে না, তার

কারণ, লেনিন ট্রটস্কির নেতৃত্ব সেখানে বেশীদিন না থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল ষ্টালিন তাঁর এক-দেশীয় সমাজ তন্ত্রবাদ (one-country socialism) নীতি অবলম্বন করলেন। তার ফলে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সঙ্কুচিত করে' বিভিন্ন দেশের বিপ্লব সম্পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ করলেন —তবুও লেনিন ট্রট্স্কির বিশ্ব-বিপ্লবের কর্ম্ম-ধারা এবং নীতি রুদ্ধ হয়নি। আমরা সেই নীতি এবং কর্ম্মপন্থা নিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছি। আমাদের আদর্শ বিশ্ব-সাম্যবাদ। যতদিন আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছুতে না পারবো, ততদিন বিরামহীন ভাবে আমাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী আর ধনতন্ত্রবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবো। জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়ে অসীম অত্যাচার ভোগ করে আমাদের চলতে হয়। আমাদের পথ অত্যন্ত দুর্গম, বন্ধুর, সঙ্কটময়; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ধ্রুবতারার মত স্থির এবং উজ্জ্বল।

বন্ধু, আমার অপরাধের কথা তোমায় জানাই—কৈশোর উত্তীর্ণ হবার পরেই আমার জীবনকে আমি বিপ্লবের পথে চালিত করেছি। বহু ঘটনার বিবর্ত্তনে আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন চলন্ত ও জীবন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমার নিজের দেশে আমার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ এবং আমাদের সঙ্ঘের নেতৃস্থানে থাকাই শুধু আমার অপরাধ নয়—বিশেষ একটি সংগঠনের নেতৃত্ব আমার ছিল বলে আমার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর,—কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মিশ্রনে এক বিপ্লবী-বাহিনী-গঠন ও তার পরিচালনার অভিযোগ এবং সেই বাহিনী সুশিক্ষিত সামরিক কৌশলে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় গঠিত হয়ে সক্রিয় ভাবে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কচ্ছে বলে আমার দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক আমায় কারারুদ্ধ করে—এবং আমার কমরেডদেরও যথাযথ শাস্তি দেয়। পুলিশ যতদূর সাধ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে সেই

সংগঠনকে নির্ম্মূল করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি! কারা-ভোগের মধ্যে নানা ছলনা করে আমি বাইরে যাবার সুযোগ পাই, এবং সেই সুযোগে আমার কাজও চলে স্বচ্ছন্দে।

তার পর ফিরে এসে গোপনে আমার কাজ ক'রে যেতে হয়! দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের কৃপায় সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ অত্যন্ত শক্তিশালী,—তাই বেশী দিন আর ছদ্মবেশে থাকা সম্ভব হলো না, সীমান্ত থেকেই আমায় গ্রেপ্তার কল্লে। এবারে আমায় অত্যন্ত কড়া পাহারা এবং কঠিন বাধা-নিষেধের মধ্যে রেখেছে।

প্রিয় আমার, দরদী আমার, অকল্পনীয়-ভাবে-পাওয়া বন্ধু আমার, তোমায় আকুল ভাবে ডাকছি—এসো বীর, ভেঙ্গে ফেলো এই দুর্লঙ্ঘ্য কারা-প্রাচীর। তোমার শক্তিমান সুদৃঢ় হাতের চালনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-কৌশলে চূর্ণ হয়ে যাক এত দিনের এই দুর্নীতি আর কলঙ্কের স্তূপ কারাগার। যারা আজ বছরের পর বছর কৃত্রিম আইনের বন্ধনে যাতনায় অধীর হয়ে আছে, যাদের বাধ্য করেছে এই ঘৃণ্য সমাজ চোর হতে, ডাকাত হতে, খুনী ব্যভিচারী হতে—তারাও পাবে মুক্তি। আমরা তাদের সমাজের দুষ্কৃতি এবং বিধির কথা বোঝাবো, তাদের প্রেরণা দেবো, যাতে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। কেন তারা অপরাধ করেছে—সে কথা বুঝতে তাদের সময় লাগবে না। তাদের জীবন-ভোর কারা-যাতনা তাদের বোঝবার সহায়তা করবে।

আর পারিনা বন্ধু, বন্ধনের অসহ্য জ্বালা সইতে,—তোমার প্রাণের ছোঁয়া আমায় অধীর করেছে। আমার মতবাদ আমার কর্ম্মধারা সবই তোমায় জানালাম। আমার আদর্শবাদের কথা প্রথম সুযোগেই তোমায় জানিয়েছি, এবং তার পরেও তোমার কণামাত্র ভাবান্তর লক্ষ্য করিনি, এতে খুব আশ্চর্য্য হয়েছি। তোমার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী!

"বাদে" (ism) শ্রদ্ধা থাকাটা কিছু নয়, ওটা হলো বুর্জ্জোয়া-সমাজের কৃত্রিম উদারতা—ভড়ং! এবং সেইজন্যই ওরা বলে—"আমরা সব মতকেই শ্রদ্ধা করি" "সব বাণীকেই উচ্চ আসন দিই" ইত্যাদি। আসলে ওটা সম্পূর্ণ অর্থহীন,—নয় কি?

আমি অত্যন্ত আশঙ্কায় ও নৈরাশ্যে অধীর থাকি। বন্ধু, তোমার আমার বিভিন্ন পথের গতির মাঝে এই প্রেমের অদমনীয় দুর্ব্বার আকর্ষণের মধ্যরেখা, এর শেষ কোথায় বলো তুমি! আর আমি পারিনা। তোমার দীপ্তিভরা, ঐশ্বর্য্যভরা, জ্যোতির্ম্ময় রূপের আকর্ষণে আমি চঞ্চল হয়েছিলাম মাত্র, কিন্তু তোমার এই প্রাণ-মাতানো কুল-ছাপানো বাঁধ-ভাঙ্গা প্রেমের তরঙ্গ আমায় অশান্ত করেছে, দুরন্ত করেছে। বাস্তবে তুমি বহাও ঐ প্রেমের বন্যা অবাধ গতিতে। তুমি মুক্তির মানস প্রিয়, কৃত্রিমতা ও নিষ্ঠুরতাকে তোমায় ধ্বংশ করতে হবে,—সুন্দরকে নয়। আমি আর ভাবতে পারি না,—আর সহ্য করতে পারি না। তোমায় আমি পাবোই। আমি বাস্তব-বাদী, অদম্য আশা-বাদী। এ আমার কল্পনা নয়, তোমার-আমার মিলন স্থির নিশ্চিত। তোমার ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হবার নয়, ধ্বংশ হবার নয়; প্রকাশ এবং সৃষ্টির জন্য তোমার এ সৌন্দর্য্য-সম্পদ

চিঠি শেষ করতে ইচ্ছা হয় না,—কলম থামে না,—তোমার সান্নিধ্য অনুভব করি তোমার লেখা পড়ে আর তোমার চিঠির উত্তর—লিখে।—চিঠি বন্ধ করা বিচ্ছেদ-ব্যথার অনুভূতি দেয়। কি বলে লেখা শেষ করি? শেষ নেই, ভাবে নয়, ভাষায় নয়, দর্শনে নয়, স্পর্শে নয়! এ যে অশেষ, অসীম, তোমায় দেওয়া, তোমায় কাছে পাওয়া ইতি তোমার কে? তুমিই জানো।

চিঠি শেষ করে সিরিন একবার পড়ে দেখলে, পরক্ষণে ভাবলে, না,

যে ভাবের আবেগে লেখনী চালিত করেছি, তাকে আর যুক্তির সংযমে সম্বৃত করে মুক্ত-অন্তরে আবরণ টানবার প্রয়োজন নেই!

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রিয়দর্শনের অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রিয়দর্শনকে একটুও চিন্তিত বা অসহজ দেখলো না, কিম্বা কোন ভাবান্তরও লক্ষ্য হলো না। তখন মনে কল্লে, চিঠি বোধ হয় এখনও পৌছোয় নি! কিন্তু কেন? দুপুরে তো পৌছুবার কথা। সিরিন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস কল্লে,—পেয়েছ কি? প্রিয়দর্শন না বোঝার ভাণ কল্লে, করে' বল্লে,—কি হয়েছে তোমার? সিরিন বল্লে,—কিছু না। প্রিয়দর্শন বল্লে,—নিশ্চয় হয়েছে—বলো। সিরিন তখন বল্লে,—আমার লাইটারটা জ্বলছে না, সিগারেট ধরাতে পাচ্ছি না। প্রিয়দর্শন বল্লে,—খুব জ্বালাতে পারো,—বলে বুকে হাত দিয়ে দেখালে, বল্লে,—এখানে অহরহ জ্বালিযে রেখেছ যে। সিরিন মিষ্টি করে বল্লে,—না, না, ওখানটা অমৃত সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করতে চাই,—জ্বালাবো কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যর্থতা-ভরা মুখে ম্লান ছায়া পড়লো। প্রিয়দর্শন ব্যথিত হয়ে উঠলো, দুষ্টুমী করে ব্যথা দিয়ে এ তার কি হলো? তাড়াতাড়ি দুষ্টুমী বন্ধ করে বুক-খোলা হাসি হেসে বুক-পকেট থেকে সিরিনের চিঠি বার করে দেখালো,—আবার সেখানাকে বুকে চেপে ধরলে। উৎসারিত আনন্দে প্রিয়দর্শনকে সিরিন বল্লে,—তুমি ভারী দুষ্টু। দুর থেকে ঘুষির আঘাতটা প্রিয়দর্শণের ব্যাক-ব্রাস-করা ঢেউ-খেলানো চুলগুলোয় যেন লাগলো,—তাই বাঁ হাতে সে-গুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাস-সাধনে অপরাধের সাজা বহন করতে লাগলো।

এ দৃশ্য সিরিনকে মোহিত কল্লে—চঞ্চল কল্লে। তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেশ খুলে একটা সিগারেট ধরালে। প্রিয়দর্শন বল্লে,—আমায় দাও! সিরিন দুষ্টুমীর প্রতি-উত্তরে শূন্য কেশটা খুলে ধরলে—কে কার শূন্যতা পূর্ণ করবে? কে কার পিপাসা মেটাবে?

দুজনেরই আজ দুষ্টুমীর অভিপ্রায় ছিল,—তাই সময়টা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। প্রিয়দর্শন বল্লে,—রাত্রে লিখবো উত্তর,—এখন বিদায়!

মুদ্রাকরের অনবধানতায় এক জায়গায় পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দ্দেশে বিষম প্রমাদ ঘটিয়াছে। ৬৬ পৃষ্ঠার পর ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে দয়া করিয়া ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিবেন।

পরদিন দুপুরে সিরিন চিঠি পেলো—আমার জীবনের ধ্রুবতারা—

তোমার চিঠি আমায় কি করেছে, আমাকে কি দিয়েছে, তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। তোমার ভুবন-ভোলানো রূপ আমার সব-কিছু ভুলিয়েছিল! আমি বহু দেশ ঘুরেছি, বহুজাতির শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু সত্য বলছি প্রিয়, তোমার মতো সুন্দরী আমি কোথাও দেখিনি। তোমায় দেখতে-দেখতে আমি ভাবি, এ-কি কল্পনার ছবি, না, বাস্তব প্রতিমা! আজ তোমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমার জীবন্ত-মনের তোমার গুণী-মনের শিল্পী মনের এবং অপূর্ব জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতিভা-পরিচয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি, আশ্চর্য্য হযেছি—কোন সুকৃতির ফলে তোমার মতো সর্ব্বগুণময়ী রমণীর দর্শন আমার ঘটেছে এবং তোমার বন্ধুত্ব পাবার সৌভাগ্য হয়েছে, তা আমি জানি না।

সৌন্দর্য্যের তুমি স্বর্গীয় পারিজাত—তোমার কাছে আমার রূপ আর সৌন্দর্য্যের যে এতখানি মর্য্যাদা আদর, সে শুধু তোমারই সৌন্দর্য্য-ভরা প্রাণের ছটায়। আমার সুরূপের খ্যাতি যদিও বহু জায়গায় শুনেছি, কিন্তু রূপ-সাধনায় অরূপ শিল্পীর নিখুঁত তুলির টানে এমন করে অন্তর ও বাহিরের সৌন্দর্য্য ফোটাবার ঐশ্বর্য্য কোথাও দেখিনি। আমি বলবো, এ তোমার মানস-পটে-আঁকা শ্রেষ্ঠ-শিল্পী মনের প্রকাশ! বিশ্ব-সৃষ্টির—তুমি অভিনব মানসী, তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে আমার যে ছবি এঁকেছো, এ কি সত্যই আমি? তুমি সত্যই শ্রেষ্ঠ-শিল্পী। আমি ভাবছি, এ আমার স্বপ্ন নয় তো? কোনো দিন আমি কল্পনা করতে পারি নি, মানুষকে এমন সুন্দর করে কেউ ফোটাতে পারে!

কোথায় পাবো প্রিয়, তোমার মতো ঐশ্বর্য্যময়ী বিদ্যাদীপ্ত ভাষা? তুমি পরিপূর্ণ-প্রাণের বন্যা, তোমার মতো উন্মাদনা-জাগানো আবেগ

আমি কোথায় পাবো? আতলান্ত-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ তোলবার মতো তোমার প্রাণের ঝড়, আমি কি পারবো তাকে উপভোগ করতে? কোথায় পাব অমন সুগভীর প্রেম? কোথায় পাবো অত জ্ঞান-গরিমার জলধি? বল প্রিয়, আমাকে সে সৌভাগ্য কি তুমি দেবে? তুমি আজ আমার জাগ্রতের ধ্যান, নিশীথের স্বপ্ন, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি, আমার প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশে আছো। তোমার মুহূর্ত্তের সান্নিধ্য ও স্পর্শের জন্য আমার সব কিছু দিতে পারি। এ আমার লেখনীর ভাষা নয়, ক্ষণেকের উন্মাদনা নয়! তুমি আমায় পরীক্ষা করে দ্যাখো, আমার এই কঠোর নিয়মে বাঁধা জীবন দিয়ে সে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবো! তোমার আদেশের প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি। সৈনিকের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার কথা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

তোমার আদর্শবাদে আমার শ্রদ্ধা আছে বলেছিলাম—সে আমার সাহিত্যের ভাষার উদারতায় নয়—আমি তোমার "বাদ" খুব ভাল করেই পড়েছি। জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যয়ন হয়েছে, বহু-গ্রন্থ, উচ্চতর দর্শন এবং অর্থনৈতিক গ্রন্থাদিও বিশেষ ভাবে পড়েছি, তোমাদের আদর্শবাদের যুক্তি খণ্ডন করবার জন্যই অত্যন্ত মনোযোগে সাম্যবাদী গ্রন্থও পড়েছি, কিন্তু বাস্তবে ঐ "বাদ" আর নীতি আজও সম্ভবপর হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবার আশাও খুব কম, তবে বিশ্ব-মানবতা এবং বিশ্ব-শান্তির একমাত্র আদর্শ ও পন্থা যে সাম্যবাদ, সে বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চিত। কিন্তু জগতের গতি তার পরিপন্থী, সেই জন্য বহুদূরের কথা সাম্য-বাদ—এই আমার ধারণা।

দীর্ঘ দিন ধরে আমি মনের সঙ্গে সংগ্রাম কচ্ছি—আমার জীবন যে কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, তা তুমি জানো। এই নিয়মের

ব্যতিক্রমে জীবন বিপন্ন হবে! আমার এ দায়িত্ব এড়াবার উপায়ও নেই, শপথ করে নেওয়া, প্রতিজ্ঞা করে গ্রহণ করা। সব বুঝেও তোমার চিন্তা আমায় অধীর করেছে। আমি জীবনের বিনিময়ে তোমার মুক্তির সাহায্য করতে প্রস্তুত। তুমি আমায় জানাও,—আমি কি করতে পারি, আমি তা করবো। আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমি জীবন দেবো। তোমায় মুহূর্ত্তের জন্য পেলেও সে প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার অনুশোচনা বা দুঃখ থাকবে না। চিঠি শেষ করবার আগে তোমায় কি দেবো? আমার যা কিছু ছিল, তাতো তুমি নিঃস্ব করে নিয়েছ। তবু আবার সেই সবই তোমায় দিলাম।

তোমারই ......

চিঠি পড়া শেষ করে' সিরিন খুব অশান্বিত হলো। ওর কাছ থেকে যে এতখানি পেতে পারে তা ভাবেনি। মনে করেছিল প্রাণের প্রতি-পরতে, যদি ভালবাসার অদম্য উচ্ছ্বাস বইতে থাকে, তাকেও ওরা দমন করে নিজেকে তিলে-তিলে হত্যা করে, বিপথগামী হয়, তবু ওদের কৃত্রিম সমাজের নিযমের নৈতিকতা, ধর্ম্ম ও সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে না। ওরা নিজেকে বঞ্চিত করে, সমাজকে প্রতারিত করে—তবু সত্যের পথে চলতে পারে না সমাজ-শাসনের ভযে। প্রিয়দর্শন জন্মেছে ঐ তন্ত্রের বেড়াজালের মধ্যে,—ওর শিক্ষা-দীক্ষা আচরণ ওর কুসংস্কারকে স্থায়ী করবার সহাযতাই করেছে,—এ অবস্থাতেও এতদূর অগ্রসর—আপাততঃ যথেষ্ট। ওর সঙ্গে যদি আলাপ করতে পারি, তখন বুঝিয়ে দেবো যে তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপের ওজন বড়, না, নরহত্যার পাপ-বড়।

—সমাজ ধ্বংশ করার পাপের ওজন বড়! মনের উৎকণ্ঠা শান্ত হলে

আবার চিঠিখানা পড়লে—এতখানি উথলে-পড়া পূর্ণ প্রাণের প্রেমের অভিব্যক্তিকে কি করে' এমন নিষ্ঠুর আবরণে ঢেকে রাখতে পেরেছ তুমি বন্ধু? তোমরা নাকি শুধু ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রের মত, তোমাদের নাকি সমস্ত প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে শুকিয়ে ফেলতে হয়! না, না, আর ঐ অর্থহীন কুচক্রের নীতিতে তোমার থাকা হতে পারে না। জ্ঞানহীন, নির্বোধ মূঢ়েরা ঐ জঘন্য হীন স্বার্থকলুষ রাষ্ট্রচক্রে পিষে মরছে। তুমি শিক্ষিত প্রাণবন্ত, তোমার স্থান ওখানে নয়, তোমাকে আসতেই হবে আলোর পথে।

উত্তেজনায় সিরিন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কত-দিন কত-যুগ আর মানুষ এমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে—এমনি করে নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে নরভুকদের মুখের গ্রাস হয়ে থাকবে,—সহ্যের সীমা যে অনেকদিন অতিক্রম করে গেছে। সিরিনের সর্ব্বক্ষণের যা চিন্তা যে কাজ—প্রিয়দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ে এবং ভাব-বিনিময়ে বাস্তবের নব রূপে প্রদীপ্ত হলো···প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা আরও তীব্র হতে লাগলো।

চিঠিখানা আবার পড়লো—এবার ভাবের আতিশয্যে চিঠিখানাকে বুকে চেপে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। কত কি ভেবে চলেছে,—অন্তরের পুলক সর্বাঙ্গে ছাপিয়ে উঠেছে।

প্রিয়দর্শন কতক্ষণ প্রতীক্ষা করে' সিরিনকে না পেয়ে গ্রামোফোনের যন্ত্রটাকে জোরালো করে দিয়েছে,—সে শব্দে চমকে সিরিন উঠে এলো তেমনি এলোমেলো বেশে। এসে জানলায় উঠে দাঁড়ালো। আমেজের ঘোরে মন ছাপিয়ে দেহকেও বিহ্বল করেছে, দূর থেকে দেখেও প্রিয়দর্শনের তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। ভালো করে উপভোগ করবার জন্য দূরবীনটা নিয়ে এলো। সুখ-স্বপ্নঘোরের অবস্থা না কাটা পর্য্যন্ত

আতিশয্যের যে ভাব বিকশিত হয়, তার মাঝে থাকে গভীর মাদকতা, এ-ভাব যে লক্ষ্য করতে পারে, তারও নেশা লাগে।

দূরবীনটা কতক্ষণ চোখে লাগানো রয়েছে, সিরিন হাত নেড়ে বকে উঠ্‌লো,—নামাও ওটা। এখনি যদি কেউ এসে পড়ে? প্রিয়দর্শন দূরবীন না নামিয়ে প্রতি-উত্তরে সিরিনকে একটু বক্‌লে,—এর জন্য তুমিই দায়ী।

প্রিয়দর্শন আবার চেয়ে রইল পলকহীন দৃষ্টিতে, সিরিনও দাঁড়িয়ে আছে অনুরূপ ভাবে। কথার বিনিময় নেই,—ইঙ্গিতেই এতদূর থেকে এতখানি গভীরতার অভিব্যক্তি এত দিন ধরে তারা অন্তরের বিনিময়ে করে চলেছে। ভাষার বিনিময় তুচ্ছ—কে এর বার্ত্তাবাহী যার দৌত্যে প্রাণের আদান-প্রদান এমন নিকটতম হয়েছে? বিদ্যুতের গতির চেয়েও যার গতি দ্রুত, সেই এর দূত! অব্যক্ত ভাষায় যা প্রাণের প্রতিটি তন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার তোলে, সে-ই এর বার্ত্তাবাহী!

কতক্ষণ কেটে গেছে,—প্রিয়দর্শনের ভৃত্য চা এনে রেখে গেছে, তার খাবার খেয়াল হয়নি। সিরিন দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে। প্রিয়দর্শন বল্লে—সময় নষ্ট করতে চাই না। সিরিন বল্লে, —তবে আমি চলে যাবো। প্রিয়দর্শন তখন চা ঢালতে আরম্ভ কল্লে। সিরিন বল্লে,—আমায় ভাগ দাও। প্রিয়দর্শন বল্লে,—ভাগ দেবার কিছু নেই, সবই তো দিয়ে দিয়েছি। বলে সবখানি দেবার ভঙ্গিতে দূর থেকে ছুড়ে দিলে।

সিরিনের বিহ্বলতা আরও বেড়ে গেল,—আজ যেন আর কোন বাঁধই থাকছে না! দু'জনেই আজ অত্যন্ত চঞ্চল! সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রিয়দর্শন আজ একা থাকবার সুযোগ পেয়েছে। এবার পড়লো ঘড়ির দিকে নজর। ঘড়ি দেখিয়ে

বল্লে,—এটার প্রাণ নেই। সিরিন বল্লে,—সব যন্ত্র এবং যান্ত্রিক নিয়মই তো প্রাণহীন।

প্রিয়দর্শনের কজন সঙ্গী এসে পড়লো। প্রিয়দর্শন বল্লে,—তুমি চলে যেওনা,—ওরা আসুকগে। সিরিন তখন ক-মিনিটের ছুটি নিয়ে স্নান কর্‌তে গেল।

স্নান করে প্রসাধন সেরে জানলার ধারে এসে চা খাবার অজুহাতে বসলো। সঙ্গীরা মাঝে মাঝে সিরিনের দিকে চেয়ে কি যেন বলছিল। —এক-একবার প্রিয়দর্শন খুব গম্ভীর হয়ে উঠছে। আজ ওরা বাইরে গেল না। হাসি, গল্প, হৈ-হৈ, গান-বাজনায় অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটালে। রাত্রে খাবার ঘণ্টা পড়লে তখন সবাই উঠলো।

প্রায় মাঝ-রাত্রি। সিরিন বসেছিল চিঠি লিখতে, হঠাৎ টর্চ্চের আলো এসে তার জানলায় পড়লো। বুঝলে, প্রিয়-দর্শনের ডাক। উঠে দাঁড়ালো জানলায়। মিটমিটে আলোতে সিরিনের দেখার সুবিধে হচ্ছিল না বলে প্রিয়দর্শন সিগারেট-লাইটার জ্বালাতে বল্লে, এক ঘণ্টা কাটলো এমনি ইঙ্গিতের ভাব-বিনিময়ে। তারপর প্রিয়দর্শন চলে গেল ভিতরে। সিরিন ভাবতে বসলো,—কেমন করে দেব ওকে সান্ত্বনা! অসম্ভব,—যতদিন পর্য্যন্ত না ওর সঙ্গে মিলিত হতে পারি, এ অসহ্য বিচ্ছেদ-জ্বালার কিছুই হবে না। সেই পন্থা সেই উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। চিঠি লিখতে বসলো। আজ অনেক চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল,—সেগুলি শেষ করে প্রিয়দর্শনকে লিখলে—

ওগো মানস-প্রতিমকে-মূর্ত্তকরা জীবন্ত স্বরূপ, আমার কল্পনাকে বাস্তবে আভাষ দিয়ে যে লেখা তুমি পাঠিয়েছো, সে লেখার উত্তর দেবার ভাষা নেই, যে তোমার সঙ্গে অভিন্ন স্বরে তার বিনিময় হবে।

তুমি তোমার অন্তরকে যতটুকু প্রকাশ করেছ, তার উত্তর দেওয়া একমাত্র সম্ভব প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে, দেহের প্রতি অণু-পরমাণুর মিলনে, ব্যক্ত-করা আবেগের মাঝে দিয়ে। আমি আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনা প্রিয়তম, তুমি আমায় মুক্ত করো। সমস্ত বাইরের বন্ধন, বাইরের আবরণ ভেঙ্গে ফেলে আমার প্রাণের বন্যা তোমার বুকে বহাতে দাও,—তোমার লেখা আমায় সেই আহ্বানই জানিয়েছে প্রিয়। আমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবই ঠিক হয়ে গেছে, আমার লোকের দ্বারা তোমায় যে সামরিক পরিচ্ছদের কথা জানিয়েছি সেটি দিয়ো এবং কোন্ খানে তোমার শয়ন-ক্যাম্প আর তুমি একা থাকো কিনা জানিয়ো আগামী সপ্তাহে রাত্রে তোমার ডিউটি আছে কিনা সেইটুকু শুধু জানতে চাই। তুমি প্রস্তুত থেকো তোমার সবখানি পাওনার—কি পেতে? তোমার ডাক আমায় কি করেছে, জানো তুমি?

আমার লোক যেখানে যাবে, সেই জায়গা থেকেই তোমার চিঠির জবাবও পাবে। তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে না—শুধু সঙ্কেত লেখা থাকবে।

সিরিনের উপর অত্যন্ত কড়া পাহারা ও নিযম থাকা সত্ত্বেও সে তার বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার এবং কাজ করে চলেছে। অভাবনীয় ভাবে সে তার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে সর্ব্ব রকমের যোগাযোগ রাখে। এই লৌহপিঞ্জরের প্রধান দ্বারী সিরিনের অসামান্য প্রতিভা, আদর্শ প্রচার এবং প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ উদাহরণে সুযুক্তির বিশ্লেষণে সাম্যবাদী আদর্শে প্রণোদিত হয়েছেন এবং এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তিনিও সিরিনের সহকর্ম্মী।

ক'দিন ধরে সিরিন অসুস্থ বলে ঘোরাফেরা বা ভোরে ওঠা ইত্যাদি

বন্ধ করেছে। অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে,—বিশেষ কোন সঙ্কট ব্যাধি নয়, তাই ডাক্তারদের বা কর্ত্তৃপক্ষের চিকিৎসার ঘটার কোন 'ভাণ দেখাতে হয় না। সিরিন কোনদিনই জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে দেহ বা মনের কিছু মাত্র বৈগুণ্য বা অসুস্থতা জানায়নি, সেখানে তার গর্ব্ব সর্ব্বৈব ভাবে সুদৃঢ়,—এতটুকু পরাভবও বিপ্লবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। এ'কদিনের শরীর খারাপ সামান্যই—তবু দৈনিক কাজগুলো সময়-মত হয় না, একমাত্র ঐ জানলায় দাঁড়ানো ছাড়া।

আজ দুপুরে সকলে যখন বন্ধ হয়েছে, নিজের সেলের পর্দ্দাটা টেনে নিয়ে সিরিন সামরিক পোষাকে সজ্জিত হলো। প্রিয়দর্শন এলে তাকে দেখলো, প্রশ্ন কল্লে,—বাইরের পোষাকে তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে? প্রিয়দর্শন মন্ত্র-মুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে,—সিরিন বল্লে, - আর বেশীদিন কষ্ট করতে হবে না,—শিগগীর দিচ্ছি আতলান্ত মহাসাগরে, ঝাঁপ! যত বড় ঢেউ হোক, যত দুর্জ্জয় ঝড়ই আসুক, সাঁতার দিয়ে তীরে উঠবো এক-সঙ্গে। ইঙ্গিতের এত কথা প্রিয়দর্শন বুঝলো না,—যোদ্ধার পরিচ্ছদে সিরিনকে দেখে সে মোহিত হয়েছিল। ইঙ্গিতে বল্লে,—ঝাঁপিয়ে পড়ো—বুক পেতে আছি।

এ কদিনে সিরিনের সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে! বিকালে প্রিয়দর্শন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, দেখা হয়নি—সন্ধ্যায় দেখলো, ফিরেছে,—তবে অনেক সঙ্গী ছিল। রাত দশটায় সঙ্গীরা একে-একে বিদায় নিলে। অন্যদিনের মতো প্রিয়দর্শন ঘুমোবার পোষাকে সামনের তাঁবুতে এসে সিগারেট ধরিয়ে বিদায় নিয়ে গেল। গভীর রাত্রে রক্ষিণী এলো তার সেলের দ্বারে, সিরিন তাকে দুটো নূতন-তৈরী চাবি দিয়ে বল্লে,—আস্তে আস্তে খুলে দেখ। প্রহরিণী তালা খুলে সেলের মধ্যে এলো! সিরিন তাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক

কথা বোঝালো,—তারপর একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে বল্লে,—তোমার কোন ভয় নেই,—তোমার উপর চাপ পড়বে না, তার কারণ আমি অনেক দেরীতে এ কদিন উঠছি,—কাজেই তুমি বলতে পারবে, আমাকে তুমি তোমার ডিউটিতে দেখে গেছ—আর যদি কোন বিপদই ঘটে, আমার বলা জায়গায় যেয়ো, তারা তোমায় অনেক ভালো চাকরী দেবে।

প্রহরিণী একটু ভয় পেয়েছিল, সিরিনের কথায় ভয় কাটলো। সিরিন সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে জানলায় উঠে দেখে নিলে পথটা একবার দেখলো, পথে একটা নীল আলো জ্বলছে। সিরিন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল, ভিতর-দিকের ছোট প্রাচীরে দু'টো টেবিল লাগিয়ে উঠে ডাকলো প্রাচীরের প্রহরী দুজনকে। তারা বল্লে,—কোন ভয় নেই, এই ঠিক সময়, এখনি আসুন। সিরিন তার প্রহরিণীর কাছ থেকে তৈরী করা চাবিটা চেয়ে নিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলে।

ওপারের দিকে একটা পাথরের টুকরো ছুড়ে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে শুনলো দু'বার শিষ। সিরিন আর একটা পাথরের টুকরো ফেলে দিলে,—তখনই ওপার থেকে একটা দড়ির মই ছুড়ে দিলে তারা। এদিকে প্রহরী দু'জন খুব টান করে ধরলো,—বুঝলে, ওদিকেও জোর করে ধরা আছে,—সিরিন তখন প্রহরী দু'জনকে চারখানা একশো টাকার নোট দিয়ে দড়ি বেয়ে উঠলো,—বলে গেল, কোন বিপদ হলে সেই ঠিকানায় যেয়ো, সব মীমাংসা হবে।

ওপারে গিয়ে একটা পাথরের টুকরো ছুড়লো। তখন প্রহরীরা মইটা বাইরে ছুড়ে দিলে। সিরিন তার সহকর্ম্মীদের বল্লে—একটুও দেরী নয়, আমায় রিভলভার দুটো আর টর্চ্চটা দিয়ে তোমরা অন্য পথে চলে যাও।

একবার টর্চ্চ ফেলে দেখে নিলে প্রাচীরে দড়ির দাগ পড়েছে কিনা। না, সবই পরিষ্কার। মইটা খুব তাড়াতাড়ি খুলতে বলে গেল।

সহকর্ম্মীরা করমর্দ্দন করে মই নিয়ে চলে গেল। সিরিন উপরের পথ ধরে উঠে গেল প্রিয়দর্শনের শিবিরে।

নিশুতি রাত,—সকলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে, তাঁবুর সামনে ছিল এক জন রক্ষী, সেও ঘুমোচ্ছে। দূরে আর একটা প্রহরীকে দেখতে পেলে, সে অন্যদিকে ফিরে ছিল। সিরিন সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সামনের তাঁবুতে ঢুকলো—তারপর ভিতরের দিকে গিয়ে ডান-হাতি আর একটা তাঁবু দেখলে। দারুণ অন্ধকার। একবার টর্চ্চ জ্বাললে, বুঝলে, তাঁবুটা শয়নের নয়। তখন আর একটু এগিয়ে গেল,—সে তাঁবুর দ্বার খোলা ছিল। বুঝলে, এইটাই!

এ সব সন্ধান আর ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল,—কিন্তু দিনটি আজই স্থির হয়েছে। যে তিনজন প্রহরীর সাহায্যে সে আজ বাইরে বেরুতে পাল্লে, তাদের ডিউটি আজ তিন দিন বদল হয়েছে, কিন্তু সময়টা ঠিক করতে একটু দেরী হয়েছিল। প্রহরীদের সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা সিরিন এমন সতর্কে ঠিক করেছিল যে একটুও অসুবিধা বা বিলম্ব ঘটেনি। পনেরো মিনিটের মধ্যে সে সেল থেকে রাস্তায় নেমে সহকর্ম্মীদের বিদায় দিয়ে উপরের রাস্তা ধরতে পেরেছে।

প্রিয়দর্শনের তাঁবুতে ঢুকে টর্চ্চ জ্বালালো। বাঁ হাত দিয়ে তাঁবুর দরজার দড়ি খুলে বাইরের দিকটা বন্ধ করে দিলে। প্রিয়দর্শনের ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য কী অপরূপ! মুহূর্ত্তে সিরিন আত্মহারা হলো। ঐ সৌন্দর্য্যের অদম্য আকর্ষণে নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না,—বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চকিতে চেতনা হলো! ভাবলো, এখন বিহ্বল হওয়া নয়! টর্চ্চ নিভিয়ে প্রিয়তমের মুখে হাত চাপা দিলে,

আচম্‌কা ঘুম ভেঙ্গে যদি জোরে কথা বলে ওঠে! তারপর আবার টর্চ্চ জ্বালালে। প্রিয়দর্শনের ঘুম ভেঙ্গেছে—সিরিনকে বুক ভরে নিলে —এ সত্য, না, স্বপ্ন?

প্রিয়দর্শন বিহ্বল হয়ে গেছে,—এই স্পর্শ অনুভূতি তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সব-কিছু, কোথায় সে, কি অবস্থায়! এত বড় বিপদ সামনে—এ কথা মনের কোণেও আসেনি! দু হাতের বাঁধনে সিরিনকে আবদ্ধ করেছে।

সিরিন বল্লে,—প্রিয়তম, এখনও সময় হয়নি অনাবিল আনন্দে ডুবে যাবার,—খুব সাবধানে এসো আমার সঙ্গে,—সময় অল্প, যত তাডাতাড়ি এখান থেকে যেতে পারি।

প্রিয়দর্শন তখনই উঠে দাঁড়ালো, একবার বল্লে,—জানো প্রিয়তম, তারপর আমার কি ব্যবস্থা?

সিরিন বল্লে—সে ব্যবস্থা এই মুহূর্ত্তে করতে হবে। তারপর তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপ বা তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হবে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। এখন ভেবে বা গুছিয়ে কাজ করবার মতো মনের অবস্থা তোমার হ'তে পারে না বুঝে আমিই সব ঠিক করে এনেছি।

প্রিয়দর্শন ভাবছে, আমার প্রতি-মুহূর্ত্তের আকাঙ্খা ও সাধনা এমন করে সার্থক হতে পারে·—এ স্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু পরিণাম?

পরিণাম যাই হোক, জীবনের এক মুহূর্ত্তও যদি জীবন-সর্ব্বস্বের সঙ্গে মেশাতে পারি, তার বিনিময়ে আমি জীবন-পণ করেছি। কিন্তু সিরিন যে মুক্তি-পথের যাত্রী, আমাকে সাথী করে ওর সে-পথে বিঘ্ন ঘটে যদি?

সিরিন বল্লে,—না প্রিয়তম, দ্বিধা বা চিন্তা করবার মুহূর্ত্ত সময় নেই, প্রস্তুত হও,—একটুও দেরী নয়। প্রিয়দর্শন বল্লে,

—দ্বিধা করিনি বন্ধু, সৈনিকের প্রতিশ্রুতি কোন দিন টলে না—তোমায় আমি যে-কথা দিয়েছি—বহু চিন্তা করেই তার সিদ্ধান্ত করেছি। বলো, এখন কি করতে হবে। সিরিন পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে বল্লে—এইখানা কপি করো, খুব তাড়াতাড়ি। উচ্চতম কর্ম্মচারীকে (ব্রিগেডিয়ার) উদ্দেশ করে লেখা—

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের ব্যর্থতা আমার জীবনকে ধৈর্য্য-হারা করেছে,। আমার সামরিক জীবনের প্রতিজ্ঞা এবং আমার এই প্রেমের বিচ্ছেদ এর একমাত্র মীমাংসা আমার মৃত্যু,—কারণ আমার সামরিক জীবনে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়, এবং সামরিক জীবনের অবসান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে প্রতিজ্ঞা-লিপিতে আমি স্বাক্ষর করেছি, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে আমায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে, আমার বিবেক এ কথা বলে। জীবন্ত অবস্থায় আমার প্রিয়তমার বিচ্ছেদ, আমার মৃত্যু অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দায়ক, সেই মৃত্যুকেই আমি বেছে নিলাম। আমাদের শিবিরের পাশের ভ্যালির নীচে যে হ্রদ, সেই হ্রদে আমার এই অবিরাম অন্তর-জ্বালা চির-শীতল হবে। অন্য ভাবে আত্মহত্যা করলে আমার মৃতদেহ অপরের চোখে পড়বে—এবং সে দৃষ্টিও সৈনিকের জীবনে কলঙ্ক—তাই আমি সকল রকমে গোপনতা রেখে হ্রদের জলে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করলাম।

চিঠি শেষ করে স্বাক্ষর ও তারিখ এবং সময় রাত্রি দশটা লিখে খামে শীল দিয়ে চিঠি বন্ধ করলে,—তারপর ঘুমের পোষাক বদলে যোদ্ধার পোষাক পরে তৈরী হলো।

সিরিন বল্লে,—তোমার রিভলভারটা চিঠির ওপরে রাখো, টর্চ্চটা শুধু নাও,—নিয়ে খুব সাবধানে বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

প্রিয়দর্শন যন্ত্র-চালিতের মতো সব করে চলেছে। শিবিরের বাইরে এসে পিছনের পথ ধরে সিরিন এগিয়ে চললো।—প্রিয়দর্শন ভাবছে, সৈনিক-জীবনে কতই তো দুঃসাহসিক কাজ করেছি, কত দুর্গম পথ অতিক্রম করেছি,—কিন্তু এত বড় রোমাঞ্চকর অভাবনীয় ব্যাপারে এতখানি সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে নামা এই প্রথম! এর আগে যা করেছি, তা শুধু আদেশ পালন মাত্র। ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাল-মন্দ বিচারের প্রশ্ন কর্‌বার মত মনের স্বাধীনতাও আমাদের ছিল না। এত-বড় আত্মপ্রসাদ এত-খানি মুক্তির স্বাদ জীবনে আর পাইনি,—এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছে সিরিনের সঙ্গে। কোন কথা নয়। জুতোর শব্দ না শোনা যায়! মাঝে মাঝে টর্চ্চ ফেলে শুধু খানিকটা করে পথ দেখে নিচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি চলেছে দুজনে—যত শীঘ্র এই সামরিক সীমানা ছাড়াতে পারে! পারলে তবেই আশা, এই ভাব নিয়ে দ্রুত চলেছে। এ পাহাড়ের সব পথই খুব ভালো করে জানা, অন্ধকারেও আন্দাজ করে চলেছে—কোথায় মোড় ঘুরবে, কোথায় সোজা যাবে, ভুল হবার নয়।

ভ্যালি থেকে নীচের পথ আছে,—একেবারে নীচে না নেমে একটু বেঁকে গিয়ে যেখানে হ্রদের কিনারা, প্রায় তার পাশ ধরে চললো। সেখানটা ওদের বাসস্থান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। এ জায়গায় এসে দেখলে, দুজন লোক নীল-বাতি নিয়ে একবার জ্বালাচ্ছে, আবার নিভিয়ে দিচ্ছে। প্রিয়দর্শন সিরিনকে বল্লে,—ওদিকে যাবে?

সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ।

তাড়াতাড়ি তাদের কাছে এগিয়ে গেল এবং প্রিয়দর্শনকে বল্লে,—এইটে মুখে পরো।

দুটি চোখ বাদ দিয়ে মুখ ঢাকা হয়ে গেল। পথ-প্রদর্শকদের পিছনে

৬

পিছনে চলতে লাগলো। প্রায় এক মাইল গিয়ে এক বস্তি। গাইড দুজন বল্লে,—এখানে দাঁড়াও।

ওরা দাঁড়ালো। পথ-প্রদর্শকরা এগিয়ে গেল। সিরিন বল্লে,—ভয় কচ্ছে? প্রিয়দর্শন বল্লে,—ভয় কথাটা আমার অভিধানে নেই, বন্ধু। সিরিন বল্লে,—তা জানি, কিন্তু এ মুহূর্ত্তে এই জবাবটি শুনতে ভালো লাগবে বলে প্রশ্ন করলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খুব ভালো দু'টো পাহাড়ী ঘোড়া এবং একটা বড় প্যাকেট নিয়ে ওরা ফিরে এলো। সিরিন তখনি প্যাকেটটা ঘোড়ার পিঠে তুলে একটা ঘোড়ায় প্রিয়দর্শনকে উঠতে বল্লে এবং পথ-প্রদর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে নিজে বসলো আর একটা ঘোড়ায়। প্রিয়দর্শনের ঘোড়া পিছনে রইলো। খানিকটা পথ আস্তে গিয়ে তারপর টর্চ্চ ফেলে দেখলে, বস্তি ছাড়িয়েছে, তখন টর্চ্চটা বাড়িয়ে দিয়ে বেশ জোরে ছুটিয়ে দিলে ঘোড়া।

এ জায়গায় পথ খুব বেশী উঁচু-নীচু ছিল না, প্রায় সমতল ভূমির মতই এবং দীর্ঘ পাহাড়ী জঙ্গলে ভরা। সৈন্যদের ভীড় এখানে কম। যখন-তখন বোমা-বর্ষণে দরিদ্র গ্রামবাসী ত্রস্ত, ভীত,—সৈনিক বা যোদ্ধার বেশ দেখলে তারা আতঙ্কিত হয়, হুকুম শোনে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অন্ধকার তখনও কাটেনি,—এমন সময় এক বস্তি দেখতে পেয়ে সেইদিকে ঘোড়া ছুটোলো। পাহাড়ী ঘোড়া সহজে ক্লান্ত হয় না। সিরিন মাঝে মাঝে টর্চ্চ ফেলে পিছন দিকে চাইছে—প্রিয়দর্শনকে সতেজ প্রফুল্ল দেখে তার উৎসাহিত মনে আরও সে প্রেরণা পাচ্ছে।

বস্তির শেষ দিকের ঝুঁড়েখানার কাছে গিয়ে গৃহ-স্বামীকে ডাকবার

জন্য তাদের ঘরে টর্চ্চ ফেললে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো,—গৃহস্বামীর ঘুম ভাঙলো।

সিরিন ঘোড়া থেকে নামলো, প্রিয়দর্শনও নামলো। সিরিন বল্লে,—পরিচ্ছদের আবরণে না হয় তোমাদের জাতের ভড়ং দেখাতে পেরেছি, কিন্তু গলার আওয়াজে তো আর ভড়ং চলবে না! এবার তোমার পালা—বাড়ীওয়ালার কাছে তুমি চাও আশ্রয়।

প্রিয়দর্শন বল্লে—যা কিছু স্বাভাবিক, তাতে ছদ্মবেশ বেশী চালাতে গেলে মুস্কিল আছে বটে!

গৃহস্বামী বেরিয়ে এলো। প্রিয়দর্শন বল্লে,—এদিকে বোমা পড়ে গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে। আমরা এসেছি এখানে বোমা বর্ষণের খোঁজ-খবর নিতে। খবর নিয়ে আজ দুপুরে চলে যাবো,—কারণ এখানেও আজ বোমা পড়তে পারে। তা কিছুক্ষণের জন্য এখানে জায়গা পাবো?

বাড়ীওয়ালা সাগ্রহে বল্লে,—নিশ্চয়।

এই অবসরে সিরিন এবং প্রিয়দর্শন পোষাক পরিবর্ত্তন করে নিলে। গরীবের কুঁড়ে—একটা মিটমিটে আলো জ্বালবারো সামর্থ্য নেই। অন্ধকারেই বাড়ীওয়ালা দুজনের জন্য একটু স্থান করে দিলে। একখানা কুঁড়েয় কতকগুলো ভেড়া আর একটা গরু ছিল, তাদের বাইরে এনে কুঁড়েটা একটু পরিষ্কার করে দিলে। সিরিনদের ঘোড়া দুটো কুঁড়ের পাশে গাছে বেঁধে দিয়ে বল্লে,—তোমরা আরাম করো,—ঘোড়া আমি দেখবো।

বাড়ীওয়ালাকে প্রিয়দর্শন একখানা দশ-টাকার নোট দিলে। সিরিন ঘোড়ার পিঠ থেকে সেই প্যাকেটটা নামিয়ে ভেড়ার কুঁড়েয় ঢুকলো,

তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলে একটা পাতলা কম্বল বার করে মাটিতে পাতলো। বাড়ীওয়ালা খানিকটা জল এনে দিলে, দুজনে তাতে মুখ হাত ধুয়ে নিলে। পরিচ্ছদগুলো লুকিয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পাহাড়ীর বেশ পরে নিলে দুজনে। প্রিয়দর্শন বল্লে,—তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ? সিরিন বল্লে,— কোন লক্ষণ দেখচো না কি? প্রিয়দর্শন বল্লে,— হওয়া স্বাভাবিক।

সিরিন—কিন্তু অবস্থা আর ব্যাপার বড় অস্বাভাবিক কি না! বেশ, ক্লান্তি দূর করতে—

কথা শেষ হলো না, প্রিয়দর্শন সিরিনকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

সিরিন বললে,—ভোর হয়ে এলো, একটু বিশ্রাম করে নিই এসো। কাল যখন একসঙ্গে দুটো খবরই প্রকাশ পাবে, তখন অনেকেরই আর বুঝতে বাকি থাকবে না! কিন্তু তোমার খবরটা একেবারে চাপা দেবার চেষ্টা করবে সামরিক গোপনতার জন্য,—তবু বোধ হয়, হ্রদটা একবার তোলপাড় করবে।

প্রিয়দর্শন বললে,—ভয় নেই। আমার চিঠিখানা কালকের মধ্যে খোলা হবে না,—শীল-করা খাম ব্রিগেডিয়ারের নামে, তার হাতে পৌছুতে সময় লাগবে,—তার পর আমার সন্ধান,—যার মানে, দশ-পনেরো দিন বাদে।

সিরিন বললে—তখনও কিন্তু ঐ প্রকাণ্ড হ্রদটাকে একবার তোল-পাড় করবে, তবে দৃষ্টান্তটা সুবিধের নয় বলে হয়তো একেবারে চেপে যাবে ব্যাপারটা। আমার উপর ওদের ভয়ানক কড়া পাহারা ছিল, কারণ প্রথম-বার জেল থেকে বেরিয়েই বিনা-পাশপোর্টে পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়ি, তাই এবারে ওরা সব-চাইতে কঠিন পাহাড়ী জেলে অত্যন্ত সতর্কভাবে আমায় একা রাখবার ব্যবস্থা করেছিল; এবং যতদূর

পারা যায় আমার উপর কড়াকড়ি করতো। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আজ অবশ্য সর্ব্বত্রই এয়ার-রেডে ছারখার, জেলের লোকও সর্ব্বদা আতঙ্কে অস্থির, সাইরেন বাজলে কোন-রকমে আইন রক্ষা করে কে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়! গত তিন দিন এই ভাবে বোমা-বর্ষণে এত শৈথিল্য এসে গেছে যে রাত্রের প্রহরী বদল যা হয়, সে শুধু নামে। আমার পাঁচিল টপকাবার প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে ঐ খানেই খুব কাছে বোমা পড়েছে, সে খবর ওদের কাছে পেলাম। কাল সন্ধ্যায় যে সাইরেন বাজলো সেটা আমার পালানোতে খুব সাহায্য করেছে। থাক্, আজ আর ও-কথা ভাববার প্রয়োজন নেই! কালকের দিনের ব্যবস্থা সফল হলে আমরা এ সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারবো। এখন আর কথা নয়—শুয়ে পড়ো,—বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন।

কম্বলটা সেই ভেড়ার কুঁড়েয় ঘাস-খড়ের উপর বিছিয়ে আর পোষাক গুলোকে বালিশ করে দু'জনেই শুয়ে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলো।

ঘুম ভেঙ্গে সিরিন দেখে, বারোটা বেজে গেছে। আর তো সময় নেই! দুটোর মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে একটু স্নান আর আহার দরকার। প্রিয়দর্শনকে তখন জাগালো না। কুঁড়ের বাইরে কেউ কোথাও নেই, সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। একটু দূরে পনেরো-ষোল বছরের একটি মেয়ে দুটি শিশু আর ভেড়াগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত। সিরিন তার কাছে এগিয়ে গেল, তাকে বল্লে —তুমি কি এই বাড়ীতে থাকো? সে বল্লে—হ্যাঁ। সিরিনকে দেখে সে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল,—নূতন রকমের লোক—পরণে

যদিও অত্যন্ত সাধারণ পরিধেয়, কিন্তু সে আবরণে ও-রূপের আভিজাত্য ঢাকা পড়ে নি।

মেয়েটিকে সিরিন বল্লে,—আমাদের একটু জল দিতে পারো? আমরা স্নান করবো। তোমায় আমি দুটো টাকা দিচ্ছি।

মেয়েটি সিরিনকে সঙ্গে করে আঙ্গিনার এক কোণে নিয়ে গেল। একটা টিনে জল গরম হচ্ছিল—কোলের শিশুকে নামিয়ে সে আর একটা টিন নিয়ে জল আনতে গেল।

সিরিন এসে প্রিয়দর্শনকে জাগালো, বল্লে,—এমন শয্যা-বাসেও এত গাঢ় ঘুম! প্রিয়দর্শন সিরিনের দিকে চেয়ে একটু হাসলো শুধু।

সিরিন বললে,—এখন কেউ কোথাও নেই। তুমি বাইরে আসতে পারো। বাইরের সাজপোষাকে তোমায় ঢাকা যায়নি,—সহজেই নজরে পড়বে,—তবে আজকের সাজ একেবারে আলাদা রকম করতে হবে।

জলের ব্যবস্থা করে দুজনে স্নান ও প্রসাধন সেরে নিলে খুব সংক্ষেপে,—সামান্য কিছু জিনিষ প্যাকেটের মধ্যে ছিল—কতকগুলো শুক্‌নো ফলও ছিল। সিরিন আবার সেই মেয়েটির শরণাপন্ন হলো, তাকে বল্লে,—তোমায় আরও দু'টাকা দেবো, একটু দুধ আর সামান্য কিছু খাবার এনে দাও। সে মাথা নেড়ে বল্লে,—আমি এখনি আনছি।

কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি রুটি আর খানিকটা গরম দুধ নিয়ে এলো। খাওয়া শেষ হলে সিরিন বল্লে—মাত্র ছ'টা সিগারেট আছে, তোমার মতো চিমনির পক্ষে এ কতক্ষণ? তবু অর্দ্ধেকটা করে একসঙ্গে দু'জনে কিছুক্ষণ চালানো যাবে। প্রিয়দর্শন বল্লে—আমারই পক্ষে শুধু ঐ চিম্‌নি আখ্যা প্রযুজ্য, বটে?

সিরিন বল্লে,—আচ্ছা, না হয় আমিও চিমনি! নাও আধখানি।

এবার ওরা সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্ত্তন করে প্রস্তুত হলো। সিরিন ঘড়ি দেখে বল্লে—এখনি এ স্থান ত্যাগ করতে হবে, নূতন ঘোড়া নিয়ে লোক আসছে এখানে।

গৃহস্বামী ফিরে এলো,—ওদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে। সিরিন বল্লে,—আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে; খাবার তোমার ছেলেমেয়েদের দাও। বুড়ো তবু শুনলো না—সামান্য ফল নিতে অনুরোধ কল্লে। সিরিন সাগ্রহে তুলে নিলে বুড়োর দান।

দু'জন লোক এসে সিরিনের সঙ্গে কি কথা বল্লে,—তারপর একতাড়া কাগজ আর নোট দিয়ে গত রাত্রের ঘোড়া দুটো নিয়ে তারা চলে গেল।

সিরিন ও প্রিয়দর্শন নূতন ঘোড়ায় উঠে সে স্থান ত্যাগ করলে। যাবার সময় গৃহস্বামীকে আর একখানা দশ-টাকার নোট দিয়ে গেল।

পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে চলেছে দু'জনে। মাঝে মাঝে চওড়া রাস্তা পেলে পাশাপাশি যাচ্ছে কথা বলতে বলতে। পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য উপভোগে পথের দুর্গমতা সরস হয়ে আসছে। প্রায় সন্ধ্যা হলো, তখন একটি গ্রামের শেষ প্রান্ত দেখা গেল! তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে কিছু আহার জোগাড় করে নিলে, তারপর আধঘণ্টা ঘোড়া দুটোকে দ্রুত চালিয়ে ছোট্ট একটি ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো। ট্রেণ ষ্টেশনে ঢোকবার পর দুজনে গিয়ে ষ্টেশনে হাজির হলো। ভীড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি টীকেট কিনে উঠে পড়লো গাড়ীতে,—ঘোড়া দুটো সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে নিয়ে গেল।

ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বেশী ভীড় না থাকলেও এ শ্রেণীর

আরোহীদের কৌতূহল স্বভাবত কম। অনুসন্ধিৎসা জাগবার মতো মনের স্তর ওদের তৈরী হয়নি! কোন রকমে জায়গা করে নিয়ে মনের বোঝা দেহের বোঝাকে নামাতে পারলেই নিষ্কৃতি। অল্পক্ষণ পরেই ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

সিরিন তখন একটা বেঞ্চে খানিক জায়গা করে নিযে সেই গাঁটরী খুলে কম্বলখানা আর পোষাকগুলো বিছিযে শয্যা রচনা কল্লে। ক্লান্তি দূর করবার জন্য দেহটাকে একটু এলিযে দেওয়া দরকার, কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। দুজনে মাঝে মাঝে কথা যা হয়,—আধা দেশী এবং আধা বিদেশী ভাষায়। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই দুজনে খুব সতর্ক থাকে।

রাত্রি বারোটার সময় দু'জনে জানলার ধারে মুখ করে বসে কথা বলতে লাগলো,—এ সময় আর টিকিট চেক্‌ করতে আসবে না। সিরিন ইরানী গ্রাম্য-মহিলা, কাজেই প্রিয়দর্শন একজন গ্রাম্য-চাষীর ভাষায় ও ব্যবহারে দু'একবার টিকিট চেক ইত্যাদি ব্যাপারে কথা বলেছে। যে-ষ্টেশনে নামবার কথা, রাত্রি তিনটের সময় সেই ছোট ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামলো,—কোন যাত্রী আর নামলো না, উঠলো না,।

ষ্টেশনে জনপ্রাণী নেই। সেখানে নেমে ষ্টেশনের বাইরের পথ দিয়ে হেঁটে চললো। খানিক গিয়ে এক নিরালা জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি দু'জনে সামরিক পরিচ্ছদ পরে নিলে। তারপর টর্চ্চ হাতে সিগারেট ধরিয়ে স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলো। যুদ্ধের কল্যাণে সহর, গ্রাম, উপনগর, নদী, পথ, বাজার, হাট, বন-জঙ্গল,—আকাশে-বাতাসে পর্য্যন্ত মিলিটারী মানুষ আর সাজ—কে কাকে কি সন্দেহ করবে!

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের মধ্যে এলো। সেখানকার এক জমিদার-বাড়ীর গাড়ী ভাড়া করতে চাইলে। মিলিটারী অফিসার,—যুদ্ধের জন্য সবই তারা কচ্ছে,—মিলিটারী-সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে জমিদার

গাড়ী দিলে,—ভাড়ার প্রশ্নই নেই! ওরা বল্লে,—সহরের ডাক-বাংলোয় যাবো কিংবা কোনো মিলিটারী আস্তানায়।

সব-চাইতে ভালো গাড়ীখানায় ঘোড়া জুতিয়ে মিলিটারি-অফিসারকে সাহায্য করে রাজভক্তির পরিচয় দিলে জমিদার—কোচম্যান ওদের নিয়ে সহরের ডাক-বাংলায় চলেছে, প্রায় দু'মাইল দূরে।

সহরের মধ্যে গিয়ে অফিসার-সাহেব বল্লেন,—এখানকার হাসপাতালের বড় ডাক্তার সাহেবের বাড়ী কোন্ জায়গায়? কোচম্যান বল্লে,—কাছেই। অফিসার-সাহেব বল্লেন,—আচ্ছা, সেইখানে আমাদের নামিয়ে দাও। আমরা ডাক্তারকে অসুখ দেখিয়ে ডাক-বাংলায় যাবো,—ডাক-বাংলা কত দূর? কোচম্যান বল্লে,—খুব কাছেই। বলে রাস্তা বাতলে দিয়ে চলে গেল। অফিসার-সাহেব বখশিশ দিলেন তাকে খুশী করে।

গাড়ী থেকে নেমে হসপিটালের ঠিক উল্টো পথ ধরে এরা চলতে লাগলো। বেলা তখন বেশ, পথে মাঝে মাঝে লোক চলছে। একটু সুবিধা-মত স্থানে গিয়ে তাড়াতাড়ি সামরিক পরিচ্ছদ বদলে নিয়ে আবার চলতে লাগলো। কিছুটা পথ গিয়ে এক পথিককে প্রশ্ন করলো,—ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীটা কোথায়? পথিক বল্লে,—এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

পথিকের সঙ্গে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেল, তার পর পথিককে বল্লে,—আচ্ছা, থাক, অন্য সময়ে যাবো। এখন আমরা যাচ্ছি অন্য কাজে। বাড়ী চিনিয়ে দিলে—ধন্যবাদ।

পথিকের সঙ্গে খানিক চলে তারা পথের বাঁক নিলে। পথিক অদৃশ্য হলে উল্টো পথে ফিরলো ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী। গেটের কাছে গিয়ে বল্লে—আমরা ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

গেট খুলে দিলে মালী। ভিতরে গিয়ে সিরিন কার্ড দিলে। ইরাণী

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সামনের বারান্দায়, আপ্যায়িত করে ওদের দুজনকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ব্যারিষ্টার-সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—এঁরা মেহেরার বন্ধু, এঁদের জন্য এখনি সব ব্যবস্থা করো,—শ্রান্ত এঁরা। তারপর সিরিনকে বল্লেন,—আমি আশা করেছিলাম ভোর বেলায় এসে পৌছুবে। সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, পথ চেনার একটু অসুবিধার জন্য এত দেরী হলো। প্রায় চার ঘণ্টা দেরী হয়েছে পথের বিপাকে।

গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি স্নানের ব্যবস্থা করে ওদের ডাকতে এলেন।

স্নান শেষ করে পোষাক পরিবর্ত্তন করে গৃহস্বামী এবং কর্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে প্রাতরাশ সারা হলো।

সিরিন বল্লে,—যাবার ব্যবস্থা কখন হবে? গৃহস্বামী বললেন,—তাড়া নেই—,এখন একটু বিশ্রাম করো, দুপুরের খাওয়া হলে পর আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। দুটোর সময় তোমার বন্ধু এখানে আস্‌বে।

গৃহকর্ত্রী বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। দুজনে শ্রান্ত ছিল, ঘুমিয়ে পড়লো। দুটোর সময় গৃহকর্ত্রী এসে সিরিনের গায়ে হাত দিলেন—সে স্পর্শে সিরিনের ঘুম ভাঙ্গলো। ব্যস্ত হয়ে সিরিন জিজ্ঞেস কল্লে—কত বেলা? দুটো বেজে গেছে? আমাদের দেরী হয়ে গেল? গৃহকর্ত্রী বললেন—না, মোটেই দেরী হয়নি। আমি ঠিক সময়ে জাগিয়েছি। মুখ ধুয়ে আসুন, খাবার তৈরী।

সিরিন প্রিয়দর্শনকে জাগালো, তাড়াতাড়ি পোষাক পরে খাবার টেবিলে গেল। মেহেরা জিনিষ-পত্র নিয়ে উপস্থিত হলো। সিরিন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে,—আমাদের জন্য সকলের খাওয়ার দেরী হয়ে গেল। এমন ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হয়নি,—আমি বড় লজ্জিত।

ব্যারিষ্টার সাহেব বল্লেন—এ সময় আপনাদের ডাকতে হোল বলে

আমরাই বিশেষ লজ্জিত, সারারাত ট্রেণের কষ্ট, তারপর পথ খোঁজায় আপনারা যে রকম ক্লান্ত—এখন বেশ খানিক ঘুমোনো প্রয়োজন ছিল।

খাবার টেবিলে নানা কথা হতে লাগলো। সিরিন এবং প্রিয়দর্শন অত্যন্ত সংক্ষেপে সব কথার উত্তর দিচ্ছিল। আহার-শেষে সিরিন মেহেরার সঙ্গে অন্য ঘরে গেল। প্রায় দু'ঘণ্টা ওদের কথা হলো; তারপরে ফিরে এলো বাইরে। প্রিয়দর্শন তখন সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে বিশেষ সংবাদের সন্ধান কচ্ছিল,—কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না। সিরিন বল্লে,—এবার তো রওনা হতে হবে। আশা কচ্ছি, এবার নিরাপদ স্থানে পৌঁছুতে পারবো।

জিনিষপত্র গোছ করে নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় বাজলো সাইরেন। সব ব্যবস্থা স্থগিত হলো। মেহেরা বল্লে—ভালই হলো। পথ-ঘাট নির্জ্জন হবে,—বেশী রাত্রে রওনা হলেও ভোরে পৌঁছুতে পারবে।

সিরিন আরও কতক্ষণ মেহেরার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেলে। বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত বন্ধ হবার পরেও অনেকক্ষণ গোলমালে কাটলো। ব্যারিষ্টার সাহেবের বাংলোয় আজ সন্ধ্যায় লোকের ভীড় ছিল,—ছুটির দিন, তাই।

রাত্রের খাবার আলাদা ঘরে এরা খেয়ে নিলে। বেশী রাত্রে সকলে বিদায় নিলে সিরিনদের যাবার ব্যবস্থা হলো। একখানি বড় মোটর প্রস্তুত ছিল,—জিনিষ-পত্র সাধ্যমত গাড়ীর মধ্যে নিয়ে গৃহকর্ত্রী এবং ব্যারিষ্টার-সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলো। মেহেরার কাজ ছিল জিনিষ-পত্র পৌঁছে দিয়ে চিঠিপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া। সে কাজ শেষ করে সে চলে গেল।

ড্রাইভারটির বেশ পুরা ইউরোপীয়ান, ইরাণী বলে চেনা দুষ্কর। বদ্ধ-গাড়ীর মধ্যে আরোহী দু'জনের অভিজাত পরিবারের সাজসজ্জা কারও

নজরে পড়লে তার জৌলুস দেখে সসম্ভ্রমে সকলে সরে যাবে দূরে। গাড়ীর সামনের দিকে শীকারের সরঞ্জামপত্র।

দীর্ঘ পথ। সারারাত্রি মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে, মাঝে মাঝে ওদের দু'একটি কথা হচ্ছে মাত্র। পাহাড়ের পথ মাঝে মাঝে ওঠা নামা, মাঝে মাঝে মিলিটারী গাড়ী যাতায়াত কচ্ছে। কোথাও কোন জিজ্ঞাসাবাদের বালাই নেই। সিরিন বল্লে,—এবার আর আমার তেমন উৎকণ্ঠা নেই। নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছুতে পারবো,—এই পথটুকু শেষ হলেই স্বস্তি।

প্রিয়দর্শন বল্লে,—আমারো আর কোন উৎকণ্ঠা নেই, এখন যা কিছু সামনে আসবে, তাকেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারার চেষ্টা এবং সংগ্রাম করবার জন্য আমি প্রস্তুত। অতীতকে টেনে বর্ত্তমানে অসুবিধা ঘটানো বা ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করতে চাওয়া সৈনিক-জীবনের শিক্ষা নয়। কিছু করবার আগে পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ করে ভাবি তার ফলাফল, ভাল-মন্দ, তারপর যা পিছনের, তাকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলি,—সে অগ্রপথ যতই দুর্ভোগের হোক, যতই বিপদসঙ্কুল হোক। সিরিন বল্লে,—তা আমি জানি।

ভোরের আলোয় সমস্ত পাহাড়টায় তখন রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। পথের ধারে-ধারে পাহাড়িয়া বসতি দেখা যাচ্ছে। তাদের ছোট ছোট কুটিরগুলি যেন সারি দিয়ে সাজানো। ছোট ছোট দোকান-ঘরও দেখা যায়।—সেই পল্লীর শেষে সহরের মতো সাজানো কখানা বাড়ী। স্থানটি প্রকৃতির শোভায় মনোরম। কৃত্রিম সজ্জায় ইটপাথর যদিও সামান্য একটু স্থান অধিকার করেছে, সেটুকু ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না। চারিদিকে সবুজ গাছপালায় ভরা পাহাড়—পাথরের রুক্ষতার সঙ্গে শ্যামলের স্নিগ্ধতা

চমৎকার হয়ে মিশেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কখানি সুন্দর বাংলো। উপরে নীচে মিলে বেশ একটু ভীড় করেছে ওগুলো।

ঐ বাংলোগুলোর একখানার সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। চালক ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এসে বল্লে,—কর্ত্রী এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি,—ভৃত্য কিম্বা পাচক কেউ নেই। মালী বল্লে—এক ঘণ্টা পরে তিনি উঠ্‌বেন। সিরিন বল্লে,—এই তো ভালো সময়! আমরা ভিতরে যাই, তার পর তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবো।

গাড়ী থেকে জিনিষ-পত্র নামাবার সময় একবার সব দিক দেখে নিলে, কেউ কোথাও নেই। অন্য বাংলো থেকেও এ বাংলোর কিছু দেখা যায় না। সামনেটা বড় বড় গাছে ঢাকা,—গাড়ী একেবারে পোর্টিকোর ভিতরে আছে।

জিনিষ-পত্র নিজেরাই নামিয়ে নিলে। মালীকে একটা অজুহ তে দূরে পাঠিয়ে মোটর খালি করা হলো। গাড়ীর চালক ছাড়া আর কাউকে বাড়ীতে যেতে দেখা গেল না। সিরিন তখন মোটর-চালককে বল্লে,— তুমি নিজেই গাড়ীটা একটু ঝেড়ে দিয়ে এসো—যেন দূরের গাড়ী বলে না বোঝা যায়। চালক বল্লে,—কোন চিন্তা নেই, চাকররা কেউই আসবে না। মালী ফিরে যাবে আমারি সঙ্গে। ওকে তিন-চার দিনের জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি ওকে নিয়ে এখনি এ স্থান ত্যাগ কচ্ছি। একটু আগে গিয়েই আমার বিশ্রামের স্থান পাবো। সেখানে সারা দিন রাত থেকে কাল আবার একবার তোমাদের কাছে এসে তারপর ফিরবো।

সিরিনের সঙ্গে আরো দু-একটা কথা বলে সে বিদায় নিলে। সিরিনকে বলে গেল,—সব কিছুই এখানে ঠিক করা আছে,—বুড়ী কর্ত্রী উঠলেই তুমি সব পাবে। স্থানীয় বেয়ারা রাখা ঠিক হবেনা, আমি কাল

একজন বেয়ারা নিয়ে আসবো,—সে অন্য-দেশী লোক। আজ তোমরা শুধু বিশ্রাম করো।

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে সিরিন গোছগাছ করতে লাগলো—প্রিয়দর্শন বল্লে,—আমি এই পার্স্‌টা নিয়ে বড় ঝঞ্ঝাট ভোগ কচ্চি—তুমি রাখো এটা। সিরিন সেটা নিয়ে খুলতে আরম্ভ করলে প্রিয়দর্শন বল্লে,—এখন দরকার নেই, পরে দেখে রেখো। সিরিন বল্লে,—এটি কখন নিলে তুমি? আর এতবার বেশ-পরিবর্ত্তনের সময়-তো এটার খবর ছিল না।

প্রিয়দর্শন বল্লে—যখন তোমার চিঠির নকল করলাম, সেই সময় আমার আইডেন্‌টিটি-বই আর পাশ-বই একসঙ্গে করে চিঠির মধ্যে রাখলাম; আর এটা ঠিক করা ছিল কদিন থেকে, এটাও নিলাম। সিরিন বললে—তবে এখন খুলবোই—কি আছে দেখবার জন্য।

প্রিয়দর্শন বাধা দিলে,—সিরিন শুনলো না, খুলে দেখলে—হাজার টাকার সাতখানা নোট আর পাঁচশো টাকার ছ'খানা এবং ছোট ছোট ক'খানা, এবং তার সঙ্গে রয়েছে সিরিনের লেখা চিঠি। সিরিন প্রিয়দর্শনের দিকে এমন করে চাইলে যার ফলে প্রিয়দর্শনের আর স্থির থাকা সম্ভব হলো না। আবেগ-উচ্ছ্বাসে সিরিনকে বুকে টেনে নিয়ে গাঢ় চুম্বনে তাকে একেবারে রক্তিম করে তুললো। বাঁধ-ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস-আদরের অভিব্যক্তিতে সিরিনও মাতাল করে দিলে প্রিয়দর্শনকে। হঠাৎ গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বরে দু'জনের চমক ভাঙ্গলো।

সিরিন তাড়াতাড়ি গেল বৃদ্ধার কাছে। বৃদ্ধা আপন-মনে বকে চলেছে—লোকগুলো কোথায় গেল? আমি একেবারে একা, এমন কেউ নেই যে আমায় দেখে। জলের মত টাকা খরচ করেও আমি এতটুকু যত্ন পাই না।

মধুর-ভাষিণী সিরিন আস্তে আস্তে বল্লে,—তুমি আমার দিদিমণি,

আমি তোমাকে দেখবো। আমি ভারী দুঃখী, তোমার কাজের জন্য আমায় তুমি নাও।

বুড়ী চোখে ভালো দেখতে পান না, বল্লেন,—ও, ডোরথি বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে? ওকে আমি অনেক করে বলে এসেছিলাম। সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এসেছি,—তোমায় সর্ব্বদা দেখাশুনা করবো। বাংলোর অর্দ্ধেকটাতেই আমাদের কুলিয়ে যাবে। বৃদ্ধা বল্লেন,—না, না, তোমরা সবটাই ব্যবহার করো,—আমার শুধু একখানা শোবার ঘরের প্রয়োজন,—বাইরের বারান্দাটা আমার বসবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাকে দেখবার কেউ নেই,—তোমরা শুধু আমায় একটু দেখো। আমার কোন ঝঞ্ঝাট নিতে হবে না তোমাদের,—আমার জন্য দাস-দাসী ঠিক করে দিয়ো,—তারাই আমার সব করবে।

সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, তোমার সব ব্যবস্থা, সব ভার আমি নিলাম।

বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিশুর মতো অসহায় ভাবে সিরিনকে আলিঙ্গন করলেন,—চোখ ভরে এলো জলে—সিরিন সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে কৌচে বসালো।

আসবাব-পত্রে বাংলোখানা সাজানো। চারখানা ঘরই সজ্জিত,—দুখানা শয়ন-কক্ষ, বসবার ঘর, খাবার ঘর, স্নানের ঘর—সুন্দর ব্যবস্থা। সিরিন বল্লে,—কালকেই তোমার চাকর-বাকর আসবে,—আজ নিজের হাতে আমি তোমার সব করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা বল্লেন,—না, না, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমার যা কাজ, সব আমি নিজেই করে নিতে পারি, কেবল আমাকে একটু দেখবার যদি কেউ থাকে। আমার চোখ গেছে,—কাণেও ভাল শুনতে পাই না। এই অবধি বলেই ব্যাকুল ভাবে তিনি কাঁদতে লাগলেন। সিরিন শান্ত করলে তাঁকে। তাড়াতাড়ি চা তৈরী করে নিয়ে এলো। কোথায় কি ছিল বৃদ্ধা

সব বলে দিলেন। তিনজনে একসঙ্গে চা বিস্কুট ফল খেলো। বৃদ্ধা বল্লেন—টীনের খাবার আর ফল আমার অনেক মজুত আছে,—যে ক'দিন লোকজন না পাই, আমাদের চলে যাবে বেশ। দুধ দিয়ে যায় পাহাড়ী মেয়ে। তারাই এসে দুধের অনেক কিছু করে দিয়ে যাবে।

বুড়ীকে শান্ত করে সিরিন এসে স্নান করতে যাবে, দেখলে, প্রিয়দর্শন স্নান শেষ করে বসে আছে সেই ময়লা পোষাকে।

সিরিন বল্লে,—এ কি, আজও জংলী হয়ে থাকবার সাধ? এ সব ছাড়ো! বলে' সুটকেশটা খুলে ক্ষৌর-কর্ম্মের সরঞ্জাম থেকে পোষাক ইত্যাদি সব কিছু বার কল্লে।

প্রিয়দর্শন বল্লে,—এ সবেরও ব্যবস্থা আছে? আচ্ছা, তা হলে সম্পূর্ণ ভাবেই পরিচ্ছন্ন হই। সিরিন বল্লে,—আমি স্নান করে আসি। তারপর তোমার দরকারী জিনিষ যতটুকু পারি, গুছিয়ে দেবো। প্রিয়দর্শন বল্লে, —এখন আর কোন প্রয়োজনের কথা চিন্তা করবার অবসর নেই।

সিরিন বল্লে—তবে থাকো এই রকম জংলী হয়ে। বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বৃদ্ধার স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে তার ঘরের সামান্ত কাজ সেরে তারপরে সিরিন স্নান করতে গেল। ক'দিনের পর তৃপ্তি-ভরে স্নান করে' প্রসাধন সেরে সুন্দর একটি রঙীন নূতন পোষাক পরে প্রিয়দর্শনের কাছে এলো। প্রিয়দর্শন প্রসাধন সমাপ্ত করে একটি আলগা পোষাক পরে গায়ে নীল রঙের সাটিনের ড্রেসিং-গাউন চড়িয়ে কৌচের উপর আধ-শোয়া ভাবে দেহ এলিয়ে আছে—ঠিক যেমন সৈন্ত-শিবিরে বিশ্রাম-কক্ষে বসতো। সিরিনের সব গোলমাল হয়ে গেল,—আমি কোথায়? আজও তুমি কি সেই দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের মাঝে প্রাণ-মাতানো রূপ নিয়ে বসে আছো! ঘরের দরজার কাছে এসে সিরিন মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে

আছে,—দেখছে! তার জানলা থেকে যেমন মুগ্ধ চোখে দেখতো প্রিয়তমকে। প্রিয়দর্শনও ছিল অন্যমনস্ক,—সিরিনের আসা জানতে পারেনি। হঠাৎ চেয়ে দেখলো। মনে হলো, সিরিন আজও দূরের দর্শন-প্রতিমা? না, না, এ যে অকল্পনীয় ঘটনা বাস্তবে সার্থক হয়েছে! এক-মুহূর্তের জন্যও আর এতটুকু ব্যবধান সম্ভব নয়। সিরিন ঝাঁপ দিয়ে প্রিয়তমের তৃষিত বুকে অমৃত সিঞ্চন করলে।

দুপুরে বৃদ্ধার জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে দিলে,—নিজেরাও ফল-টল খেযে মধ্যাহ্ন-ভোজন কল্লে। বৃদ্ধাকে বলে এলো,—গতরাত্রে পথে আমরা ঘুমোতে পারিনি, এখন একটু ঘুমোতে যাচ্ছি,—তোমার প্রয়োজন হলেই আমায় ডেকো।

বৃদ্ধা বল্লেন,—নিশ্চয়। তোমরা এখন বিশ্রাম করোগে, কিন্তু এত সামান্য খাবার তোমাদের এ সময়ের উপযুক্ত হলো না।

সিরিন বল্লে,—যথেষ্ট হয়েছে,—এর বেশী খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধা তখন চাবির গোছা সিরিনের হাতে দিয়ে বল্লেন,—সব কামরা তালা বন্ধ করে দাও। বাইরের দরজা-গুলো তালা বন্ধ করো। আমি এখন বিশ্রাম করবো। রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনা, তাই দিনের বেলা ঘুমোই।

সিরিন সারা বাড়ীটা তালা বন্ধ করলে। কারাগারের তালার কথা মনে পড়তে লাগলো। ভাবলে, সত্যই কি মুক্ত হয়েছি? আজও যে লক্ষ বন্ধন,—এ বন্ধন থেকে মুক্তি মিলবে কবে?

শয়ন-কক্ষে প্রিয়দর্শনকে বল্লে বিশ্রাম করতে। বললে,—ঘুম পাচ্ছে?

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শন বললে,—না। স্বপ্নের রাজ্যে···

মৃদু হেসে সিরিন বললে,—না গো, আর স্বপ্ন নয়, কল্পনায় স্বর্গ রচনা নয়,—এখন প্রতি-মুহূর্তে নব-নব স্বর্গ রচনা করবো। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা আর সম্ভব হবে না।

বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। বৃদ্ধা এসে দরজায় শব্দ করে' সিরিনকে ডাকলেন,—তখন চমক ভাঙলো ওদের। সময় কোথা দিয়ে চলে গেছে, বুঝতে পারেনি। ঘড়ি দেখবার কথাও মনে ছিলনা। দীর্ঘ দিনের মানসিক এবং বাহ্যিক অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ে যে-প্রাণ সাঁতার দিচ্ছে, সে কি সময়ের হিসাব রাখে? বৃদ্ধার ডাকে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং-গাউন পরে নিয়ে বাইরে এলো। সিরিন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে,—ক্লান্ত হয়ে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তোমার কত অসুবিধা হলো। আমি ভারী লজ্জিত।

বৃদ্ধা বল্লেন,—না, না, তোমাকে ডাকাই আমার উচিত হয়নি। তোমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের দরকার,—কিন্তু বাইরে থেকে দুধওয়ালী এসে ডাকাডাকি কচ্ছে বলে তোমায় ডাকতে হলো।

সিরিন বাইরের দরজা খুলে দুধওয়ালীর কাছে দুধ নিলে। বৃদ্ধা আগে থেকেই দুধওয়ালীকে বলে ব্যবস্থা করেছিলেন রাত্রের জন্য খাবার তৈরী করবার।

সে সব ব্যবস্থা ঠিক করে সিরিন আবার বন্ধ করে দিলে বাইরের দরজা। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে চা তৈরী করে বৃদ্ধাকে নিয়ে এক সঙ্গে চা খেলে তিনজনে।

সন্ধ্যার বাতি জ্বালবার আগে স্নান সেরে নিয়ে দুজনে বসে বৃদ্ধার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। বৃদ্ধার আলোচনার ধরণ বড় সুন্দর—নবীনদের সঙ্গে আলোচনা করবার সরঞ্জাম যথেষ্ট,—ইতিহাস-সমাজের ক্রমোন্নতির ধারা নিয়ে কথা আরম্ভ কল্লে,—দু'জনেই খুব খুশী হলো,—ভেবেছিল, বুড়ো মানুষকে নিয়ে দিন কাটাতে প্রতি-মুহূর্ত্ত ঝঞ্ঝাটে পড়তে

হবে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বুড়ীর অসুখ আর রাত্রে একটু দেখাশুনা করলেই তাঁর বার্দ্ধক্যের বাতিককে সামলানো যাবে।

বৃদ্ধার সঙ্গে গল্প-আলোচনা করতে করতে রাত্রি আটটা বাজলো। বুড়ী তখন বল্লেন,—তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে তোমরা যাও, বিশ্রাম করোগে। তিন-দিনের রেল-পথ, তার ওপর এতখানি মোটরে এসেছো।

সিরিন বুঝলে, এই ধারণাই তাঁর মনে গাঁথা যে আমরা বহুদূরের প্রবাসী! বৃদ্ধার কথা-অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি সেরে বিশ্রাম করতে গেল। বুড়ীকে বল্লে,—আমার ঘুম খুব সজাগ, তুমি একবার ঘণ্টা বাজালেই আমি আসবো,—যখনই দরকার, ঘণ্টা বাজাতে সঙ্কোচ করো না। বুড়ী খুব খুশী হয়ে বল্লেন,—আচ্ছা। আমার এইটুকুই একান্ত প্রয়োজন। রাত্রে আমার খুব বেশী ভয় করে। এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

সিরিন আবার সব দরজগুলোয় তালা বন্ধ করলে।

শোবার ঘরের কৌচটায় প্রিয়দর্শন বসেছিল, আলো ছিল কমানো, সিরিন ঘরে আসতেই বল্লে,—ভাবছিলাম, রাত্রের অর্দ্ধেকটা কেটে যাবে বুঝি তোমার ঘর সামলাবার কাজে। সিরিন দরজা বন্ধ করে এসে খুব আদর করে বল্লে,—মাত্র পনেরো মিনিট তোমার কাছ-ছাড়া হয়েছি,—ঘড়িটা একবার দেখো।

—ঘড়ি দেখবার সময়টুকুও নষ্ট করবার ইচ্ছা আমার নেই! বলে সিরিনকে বুকের মধ্যে চেপে নিলে প্রিয়দর্শন! একটু পরে সিরিন বল্লে,—আচ্ছা জফি, এখন কি তোমার কোন রকম উৎকণ্ঠা বা ভয় নেই?

জফি বললে—না সিরিন,···ভয় উৎকুণ্ঠা একটুও নেই। তবে সব সময়েই প্রস্তুত আছি বিপদ কখন আসে এবং সে বিপদ অতিক্রম করবার জন্ত।

সিরিন বললে—কিছুদিন এখন এখানে নিঃশঙ্কে কাটাতে পারবো,···

কোন রকম ভয় বা বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত নেই। কারণ সর্ব্ব-রকমের পথ-ঘাট বেঁধে ব্যবস্থা হয়েছে। সর্ব্বক্ষণ তোমার কাছে থেকে···

জফি বল্‌লে,—সিরিন, জীবনের এই কটা মুহূর্ত্তে যে স্বর্গ রচনা হবে, তা কল্পনার অতীত। এতখানি বিপদের মধ্যেও আমার প্রাণ ভরপুর হয়ে ছিল। অনুভব যতই তীব্র হোক, পরিপূর্ণ সান্ত্বনা ছিল তাতে। এখনও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, সত্য···না, কল্পনা? দিনের পর দিন তোমাকে এমনি করে' কল্পনায় পেয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছি, সে-দিনগুলো আমার জীবনে কি ভাবে কেটেছিল তা বলে তোমায় বোঝাতে পারবো না,···তুমি আমার বুকের প্রতিটি স্পন্দনে তা বুঝতে পারবে। এখন তাই মুহূর্ত্তের জন্য তোমার সঙ্গ-ছাড়া হলে······

গাঢ় চুম্বনে জফির অসমাপ্ত কথার উত্তর দিলে সিরিন।

প্রিয়দর্শন বল্লে,—দুর্গম পথের যাত্রীদের সতেজ ও জীবন্ত হয়ে চলবার জন্য এমন স্নিগ্ধ পান্থশালার প্রয়োজন হয়, —তাই নয় কি?

সিরিনের মন চমকে উঠলো। ভাবলে, পান্থশালা?···জফির আর আমার জীবনের গতি-পথের বৈপরীত্য শেষ পর্য্যন্ত কি পান্থশালায় পরিণত হবে? আমাদের এ মিলন মানুষের চিরন্তন আহ্বানে সম্ভব হয়েছে,··· তার মাঝখানে মানুষের সৃষ্ট সমাজ-নিয়মের কৃত্রিম গণ্ডি এবং কঠোর নিয়মের যে কঠিন ব্যবধান,···তাকে তো আজও ভাঙ্গা হয়নি! জফির মজ্জাগত সংস্কারে যে-সমাজের নীতি দৃঢ় ভিদ্ গেঁথেছে, যার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, সেখানের দ্বন্দ্ব আজও তেমনি আছে। তবে এ মিলনের পরিণতি কি? আজ আমাদের পূর্ণ প্রেমের রাজ্যে মুক্ত বিচরণ হচ্ছে কি? পরক্ষণেই মনে সান্ত্বনা এলো। ভাবলো কেন, আমি তো ওর সঙ্গে আলোচনা করেছি। ও শিক্ষিত-প্রাণবন্ত, জীবনের গতিকে ও অস্বীকার করে না,·· তাই ও বিপ্লবী। ওর সংগ্রাম-কারিণী শক্তিকে ভিন্ন মুখে

চালিত করে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে চলেছিল,···সে কথা বুঝতে পারলে ওর মন ঘুরে যাবে। এত বড় প্রকাণ্ড বাঁধকে প্রাণের স্বচ্ছ গতিতে আজ ভেঙ্গে এসেছে। ওখানে দুর্ব্বার বাধা দিয়েও ওর সংস্কার পরাস্ত হয়েছে। এইখানে ও প্রমাণ করেছে, এই বিকৃত সমাজ-নিয়ম ভাঙ্গাতেই মানুষের প্রাণের পরিচয় ও স্বতস্ফূর্ত্ত বৃত্তির মুক্তি! না, না, ওকে আমি আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাথী রূপে পাবোই···আমার দুঃখ-ঝঞ্ঝা-ভরা জীবনে অতীত ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি হবে না, জীবন-ভোর কতই তো সয়েছি!

জফি এভাবে সিরিনকে অন্যমনস্ক থাকতে দেখে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো,—আদরের মধুর লেপনে মুখখানি ভরিয়ে দিয়ে বল্লে,—এ সময়ে কোন্ দুশ্চিন্তায় মনকে এমন ম্লান কল্লে,—বলো, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব,—আমি যদি তার কারণ হই, তাহলে জীবন পণ করে তা দূর করতে আমি প্রস্তুত—বিশ্বাস করো সিরিন।

সিরিন বললে—জীবনকে বিরাটত্বে প্রসারিত করো, প্রাণকে বিশ্ব-ব্যাপৃত করো,—জীবন্ত গতিকে সীমাবদ্ধ করোনা প্রিয় আমার! জীবণ পণ—কেন তোমায় করতে হবে? জীবনের নিয়মকে পালন করবে, এই তো তোমার মতো প্রাণময় স্বরূপের পরিচয়। তুমি তো শুধু প্রেমিক নও, তুমি সাহসী, তুমি বীর। তোমার গণ্ডীর সীমা কেউ টানতে চাইলে সে পরাজিত হবে! না, না জফি, তোমাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব করে সাথী রূপে পাবোই—তোমার-আমার চলার পথ ভিন্ন হতেই পারেনা। জীবন-ভোর বহু বহু ব্যর্থতায় ক্ষত-বিক্ষত দগ্ধ হয়ে অসহ্য যাতনা ভোগ কচ্ছি। তুমি আমার রাত্রিশেষের শুকতারা জফি, আমার জীবনে চির-উজ্জ্বল থাকবে।

সিরিন অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। যে নির্ম্মম আঘাত কল্পনা করতে

মানুষ শিউরে ওঠে, যে আঘাতের বেদনা সিরিনকে আতুর করেছে, আর্ত্ত করেছে, অহরহ জর্জরিত হয়েও যে-ব্যথা সিরিন দীর্ঘ দীর্ঘ কাল বুকের গহনে গোপন রেখেছে···যে-ব্যথার আভাসও কেউ জানতে পারেনি কোনদিন সিরিনের সঙ্গে মিশে · হাসি-গল্প করে'···আজ কোন্ স্রোতে সিরিনের মনের কূল ভেঙ্গে সে-ব্যথা এমন করে উৎসাহিত হলো,· পূর্ণ প্রাণের প্রেমিক ছাড়া এর মর্ম্ম অপরে বুঝবে না!

অফি বিশ্ব ভুলে গেল, নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেললে,—আবেগে উত্তেজনায় সিরিনকে বুকে তুলে নিয়ে বল্লে,—সিরিন, জীবনে কোনদিন তোমার কণামাত্র অশান্তির কারণ হবো না। যে-আশঙ্কায় তুমি আজ শঙ্কিত হচ্ছ, যে-বিচ্ছেদের দুশ্চিন্তা তোমায় এতখানি অধীর করেছে, তার সুমীমাংসা হওয়া অসম্ভব নয়। তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলে আমার মনে হয় আমাদের প্রেম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে জীবনকে গতিশীল রাখবে। তুমি বিশ্বাস করো সিরিন, আমি অন্ধ সংস্কারী নই,—আমার শিক্ষা আর জ্ঞান চিরদিন যুক্তি মেনে চলে।

ভাবোচ্ছ্বাসে সিরিন আরও ধৈর্য্য-হারা হয়ে উঠলো,···এমন দুর্দ্দান্ত চঞ্চলতা চির-বিপ্লবী প্রাণেরই সম্ভব!

পূর্ণ প্রাণেই সে অধীরতাকে গ্রহণ কল্লে। অকূল পারাবারের দুই-তীর-বাসী এ-দুটি প্রাণের মিলনের ক্ষণকে ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা, সেই উত্তাল তরঙ্গের সুবিশাল দোলা অন্তরের অনুভূতিকেই শুধু চঞ্চল করতে পারে!

অনেক রাত্রে বৃদ্ধার ঘণ্টা-বাজানোর শব্দে চমক ভেঙ্গে সিরিন গেল তাঁর কাছে—বিশেষ কিছু করতে হলো না। শুধু তাঁকে জানানো,—তুমি একা নও, অসহায় নও। সে-সান্ত্বনায় বৃদ্ধা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সিরিনের বন্ধু এলো, কাজ করবার লোক এবং চিঠিপত্র, সংবাদ-পত্রের সব ব্যবস্থা জানিয়ে দিলে। দলের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও ঠিক করে ক'দিনের মধ্যে আবার আসবে বলে চলে গেল। বৃদ্ধা সম্বন্ধে এখানে দু'-একজন শুধু জানে,—বুড়ো মানুষ, একা থাকে,—তাই কোনো সময় সাহায্যের প্রয়োজন হলে ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দিয়ে লোক আনায়। সিরিনের এখানে থাকা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন রইলো। বৃদ্ধার বন্ধুর পাঠানো সহায় বলে পরিচয় দিলেই যথেষ্ট। তাছাড়া এখানে বাসিন্দা বড় কেউ নেই, স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য সময় সময় লোক আসে যায়, তারা কারও খবর রাখে না।

খবরের কাগজ পেয়ে সিরিন জফিকে দেখাতে এলো—তার পালানোর সংবাদ বেরিয়েছে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। তার পরিচিত বহু লোক—যারা একটু প্রকাশ্যে ছিল—গ্রেপ্তার হয়েছে। জফি বল্লে,—আমার খবর কোন রকমেই প্রকাশ করতে দেবে না; তবে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে কিনা জানি না। তবু আমার বাড়ী এবং আত্মীয়দের ওপর নজর রাখবে নিশ্চয়। কারণ ওদের কালো খাতায় আমার নাম উঠেছে প্রায় দু'তিন বার। দেশী সৈন্যদের চেয়ে ওরা দেশী অফিসারদেরই বেশী সন্দেহের চোখে দেখে,—তার কারণ, ওদের মজ্জাগত দম্ভে যে পার্থক্য ওরা করে, তার দরুণ আমাদের অসন্তোষের কথা ওরা ভালো করেই জানে,—এবং আমাদের সংহত হতে দেখলে কড়া নিয়ম করে আলাদা করে দেয়। কজন দেশী সৈন্যের উপর সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য আর অফিসারদের দুর্ব্যবহারের কথা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাই,—তার ফলে কজনের পদচ্যুতিও হয়। আমাকে বারে-বারে বদলি করতো,—তারপর একবার বড় কর্ত্তার সঙ্গে আমার বেশ খানিকটা বচসা হয় এই

বিকট পার্থক্য করার প্রতিবাদে। তার ফলে আমায় দিলে ফ্রণ্টে পাঠিয়ে। সেখান থেকে এক অজুহাতে ফিরে আসি এবং সব চাইতে কড়া ডিউটির ষ্টেশনে শাস্তি হিসেবে আমায় রাখে। কিন্তু সে-শাস্তির যে-পুরস্কার আমি পেলাম, তা জীবনের সব-কিছুকেই সহ্য করবার ক্ষমতা দেবে।

সিরিন বল্লে,—তোমাদের অনুভূতি এত তীব্র থাকা সত্ত্বেও কেমন করে অত বড় অবিচারের বন্দীশালায় স্বেচ্ছায় প্রবেশ করো জফি? তোমরা তো আর বলতে পারো না অর্থের অভাবে বা দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হয়ে নিজের দেশের পরম-শত্রু সাম্রাজ্যবাদী শাসকের তরফে যুদ্ধ করে তাকে শক্তিশালী করে নিজেদের সর্ব্বনাশ করতে এসেছ! তোমরা তো সঙ্গতিপন্ন পরিবার থেকেই এসেছো, এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজে তোমাদের অর্থ উপার্জ্জন না করলেও স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু অভাব হবে না।

জফি বললে—সিরিন, দারিদ্র্য বা অন্নাভাবের তাড়নায় না আসতে হলেও আর একটা তাড়না যা আছে তা তো জানো! অভিভাবকদের নিজ-কৃতিত্বের পরিচয় দেবার গর্ব্ব, তার উপর আছে রোমান্স,—পরাধীন দেশের উৎসাহ-হৃত আশা-হত যুব-জীবনের একটা প্রকৃষ্ট পথ এই এ্যাডভেঞ্চার। তাছাড়া যারা স্বাধীন দেশের লোক, তারাও বেশীর ভাগ এই কারণেই এসেছে। আমার যোগ দেওয়ার দু'টো বিশেষ কারণ আছে। আমাদের বংশ-পরম্পরায় যোদ্ধার শৌর্য্য-বীর্য্যের ঐতিহাসিক ধারা প্রবাহিত। আমার বাবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা তিনি একজন এত বড় সামরিক পদমর্য্যাদাধারী অধিনায়ক ছিলেন, তাঁর ছেলে নিশ্চয় যোদ্ধা হয়ে তাঁর দেশ আর বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করবে। এই হলো প্রথম কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হলো আমার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা—সে বড় করুণ, বড় দুঃখময়, যন্ত্রণাময়! কিন্তু থাক সে কথা। এখন আর কিছু বলবো না।

সিরিন দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে জফির মুখে মলিন ছায়া! সিরিন চঞ্চল হলো, বিষণ্ণ হলো! তার মুখে কথা ফুটলো না—নীরবে ম্লান চোখে সে চেয়ে রইলো জফির পানে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জফি বল্লে,—তোমরা কতটুকুই বা জানো দেশী অফিসার আর সৈন্যদের দুর্গতির কথা,—আমরা তার মধ্যে থেকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

জাফির এ-রকম ভাব সিরিন কখনো দেখেনি। চেষ্টা করেও জফি সহজ হতে পাচ্ছে না,—সিরিন আলোচনা ঘুরিয়ে নিতে চাইলো,—কিন্তু কি কথা বলবে,—বুঝতে পাচ্ছেনা,—জফি এত গম্ভীর!

সিরিনের কি মনে পড়লো, সে বাইরে গেল।

জফি ভাবছে, আমাদের ওপর সিরিনের ধারণা বদলানো সহজ হবে না,—আদর্শের নির্দ্দেশে ওরা যে-পথে চলেছে, সহযাত্রী ভিন্ন ওদের জীবনের সাথী হওয়া সম্ভব নয়। মুক্তি-পথের যাত্রী ওরা, কোন বন্ধনই ওদের আটকে রাখতে পারে না। আমার ভালোবাসা, আমার প্রেম ওর গতি রোধ না করলেও সমান তালে না চলতে পারলে চির-বিচ্ছেদের ব্যথাই হবে এর পরিণতি! আর সুখ-স্বর্গ-রচনা সে দিন···

জফি আর পারে না ভাবতে! সিগারেট ধরিয়ে ঘর-ময় পায়চারি করতে লাগলো,—গতি অত্যন্ত ধীর। মনের প্রত্যেকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে পা পড়ছে, মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কপালে-নেমে-আসা-চুলগুলোকে মাথার ওপর তুলে দিচ্ছে।

সিরিন নিঃশব্দে এলো—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে,—ব্যাকুল অন্তরে গভীর ব্যথার ভারে! জফির গম্ভীর মূর্ত্তি সিরিনের অন্তরকে ব্যথিত করে তুললো। কি গভীর বেদনা প্রিয়তমকে এমন ভাবে ভারাতুর করে দিলে! আমিই দিলাম সেই ক্ষত স্থানে আঘাত? পিছন দিক থেকে এগিয়ে

গিয়ে দু-হাত দিয়ে আবেগের ভরে জফিকে বুকে মিশিয়ে নিলে। জফি ধীর ভাবে সেই আবেষ্টনের মধ্যেই সিরিনকে নিয়ে গেল শয্যার উপর। কিছুক্ষণ শান্ত মনে সিরিনের বুকে মুখ চেপে রইলো।

জফির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সিরিন বল্লে,—জফি আমি তোমার ব্যথার উপর আঘাত করেছি! আমি বুঝি নি কোথায় তোমার সুপ্ত বেদনা! আমার বড কষ্ট হচ্ছে! কি করলে তোমার স্বস্তি হয়, বলো।

সিরিনের বুক থেকে মাথা তুলে গভীর আলিঙ্গনে সিরিনকে টেনে নিয়ে জফি বললে,—সব রকমে পারো গো, সব রকমে পারো আমার ঐশ্বর্য্যময়ী প্রতিমা! তুমি আমায় আঘাত দেবে কেন বন্ধু? তুমি আমায় সম্মানিত করেছ। থাক এ-সব সিরিন,—চলো, সামনের ঐ জায়গা থেকে দুজনে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য উপভোগ করি, চলো।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধাকে নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে এলো। রাত্রিটা সুখময় হয়ে কাটলেও দুজনেরই মন যেন ভার হয়ে রইলো! শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল,—ভোর বেলায় সিরিনের ঘুম ভাঙ্গলো। জানলা দিয়ে পাহাড়ের সবুজ শান্ত প্রভাতী আলোর ছবি পড়লো চোখে প্রথম জাগরণের ক্ষণে। মনটাকে নিয়ে গেল কোন্ সুদূরে—যেমন করে পাহাড়টা মেশাতে চাইছে তার শোভা-মাধুরী অসীম আকাশের সঙ্গে। অতীতের সুখ-দুঃখ-মেশানো স্মৃতি মিশে গেল ভবিষ্যতের অজানা আলো-আঁধারের চিন্তায়। একটুও স্থির হয়ে ভাবতে পারলে না,—শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লো। বাইরে এসে প্রকৃতির সঙ্গে মনকে মেশাতে চায়। সুন্দর প্রভাত,—চারিদিকের সাজানো রূপ যেন বেদনার সুর শোনাচ্ছে! নিরবচ্ছিন্ন-মিলনের মাঝে মন কেঁদে ওঠে কেন? কেন বিচ্ছেদের আশঙ্কা? মনকে বার-বার প্রশ্ন করে, উত্তর পায় না। কেন এমন হচ্ছে? কাল

জফির বেদনার প্রতিবিম্ব আমার মনকে শঙ্কিত করেছে,—না, না,—আর প্রকৃতির শোভা দেখবার প্রয়োজন নেই—অসহ্য লাগছে! প্রাত্যহিক কাজে দেখি, মনকে যদি হালকা করতে পারি।

চলে গেল সে স্নান করতে। স্নান সেরে প্রসাধন সমাপ্ত করে আবার এলো শয়ন-কক্ষে। গাঢ় ঘুমে জফির শান্ত গভীর রূপ স্থির বিদ্যুতের মতো বিছানা আলো করে আছে। সিরিন ভাবলো, কি অপরূপ! সুন্দর প্রভাতের আলো তোমার ঘুমন্ত রূপের ওপর এখনও এসে পড়েনি —আঁধারের আধঘোর তোমার প্রভায় প্রদীপ্ত হয়েছে। তোমার ঔজ্জ্বল্য তোমার বাইরের রূপকে এমন জ্যোতির্ম্ময় করেছে! কত বার বলি,—প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবি, কিছুই তবু বলা হয় না,—আশ মেটেনা চোখ ভরে দেখি, প্রাণ ভরে উপভোগ করি, শান্তি রূপে তুমি আমায় শান্তি দাও, আমার এই অজানা আশঙ্কাকে তুমি দূর করো প্রিয়তম।

কাছে এগিয়ে এসে শুধুই দেখবে ঐ মোহিত-করা মূর্ত্তি - তবু যায় না প্রাণের শঙ্কা! স্তব্ধতা আর সইতে পাচ্ছে না,—এ কেমন অনুভূতি! এতটুকু উচ্ছ্বাস নয়,—উন্মাদনার প্রকাশ নয়, খুব কাছে এসে অত্যন্ত সন্তর্পণে সারা মুখখানি চুমায়-চুমায় ভরিয়ে তুলতে লাগলো। উত্তেজনা নয়,...মাদকতা—তাই বুঝতে পারেনি, ঘুমের মাঝেও জফিকে সে মাতাল করে রেখেছে! আধভাঙ্গা ঘুমের ঘোরে জফি সিরিনকে বুকের ওপর টেনে নিলে। সিরিনের তখন সংজ্ঞা এলো, বল্‌লে,—জফি, আর ঘুমিয়ো না, আর স্তব্ধ থেকোনা,—আমার বড় নিঝুম লাগছে, বড় শূন্যতা বোধ করছি। প্রকৃতির স্তব্ধতা আর তোমার সুপ্তি...আমায় বড় শঙ্কিত করেছে। জফি বল্লে,—শঙ্কিত করেছে আমার সর্ব্বস্বকে? কেন আমায় ছেড়ে গিয়েছিলে সিরিন? দুজনের যে একসঙ্গে ঘুম ভাঙবে,—আমায় ঘুমন্ত রেখে কেন তুমি চলে গেলে? এক-মুহূর্ত্তও কাছ-ছাড়া

হয়োনা বন্ধু। জীবনের এই কটি মুহূর্ত্তকে কোন মতেই আর অপচয় করতে চাই না। ঘুমের মাঝেও তোমায় খুঁজছিলাম,—কত সোহাগে ডাকছিলাম তোমায়—আর যেয়ো না এমন করে। আমাকে তোমার সঙ্গেই জাগিয়ে দিয়ো। কিন্তু আশঙ্কিত কেন হবেছ প্রিয় তুমি,...কেন অশুভ চিন্তায় মনকে বেদনাতুর কচ্ছো? আমার ওপর সন্দেহ? জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে বহু আঘাত মানুষের কাছ থেকে পেয়েছ তুমি, তাই তোমার বাস্তব-বাদী যুক্তি-বাদী মনে এ সন্দেহ, এ আকাঙ্ক্ষা জাগা স্বাভাবিক! কিন্তু আমায় পরীক্ষা করে নাও আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। আমি এমন করে কাউকে কোনদিন ভালোবাসিনি সিরিন। এ আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম মাদকতা নয়, এ আমার অভিজ্ঞ-জীবনের যুক্তি-তর্কের অঙ্ক-কষা অন্তরের অন্তস্তলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির মিলনের আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা। কিন্তু আর নয় · সিরিন, ভাষায় ব্যক্ত করে এর গভীরতা বোঝানো যায় না।

অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সিরিন বল্লে,—না জফি, তোমায় সন্দেহ করবো, বাইরের কষ্টি-পাথরে তোমার মতো খাঁটি সোনার যাচাই করতে যাবো, —কেন, আমার প্রাণ নেই? প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে তোমার অপরিমেয়, ভালোবাসার অনুভূতি আমি পাই! আজকের মনের এ আতঙ্কিত অবস্থার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আর নয়—ওঠো তুমি, কালকের দিনের ঘটনা মুছে ফেলবার পরশ পাথর তোমার কাছে আছে—চলো একটু বাইরে।

জফির দেরী হবে বুঝে সিরিন বুদ্ধাকে আগেই চা খাইয়ে রেখেছিল। স্নান সেরে প্রসাধন করে দুজনে চা খেতে বসেছে। পেয়ালার চা ঢালবে কি, চেয়ে আছে মুগ্ধ হয়ে জফির পানে। মনে পড়ছে সেই কারাকক্ষের মাঝে চা খাবার কথা। জফি বসতো চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আর

সিরিনকে সে সময় বহু হাঙ্গামায় চা যোগাড় করে একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা করতে হতো! চা ঢালতে গিয়ে পেয়ালায় না ঢেলে ঢাললো ট্রেতে। দেখে জফি প্রলুব্ধ হলো—সিরিনের কপালে মৃদু করাঘাত করে বললে—এত তন্ময়!

মুখে অপ্রতিভ হাসি সিরিন বল্লে,—ভুলে গেছ সে-সব দিনের কথা! কতদিন চা পড়ে ঠাণ্ডা হতো, গ্রামোফোন আপনা হোতে বন্ধ হয়ে যেতো! জফি বললে,—আমি খুব উপভোগ কচ্ছি সিরিন তোমার এলো-মেলো কাজগুলো,—তুমি শোধ নেবার জন্য ব্যস্ত কেন? পেয়ালা শূন্য পড়ে থাকলেও আমার তৃষ্ণা মিটে যাবে।

সিরিন বললে,—তখন তুমি কি রকম সব গোলমেলে কাজ করতে, আর আমি বসে হাসতাম, কত কি যে বলতাম তোমায়! সঙ্গীদের সঙ্গে থাকলে তোমার সতর্কতাও খুব লক্ষ্য করতাম। কত রকম ছল করে তুমি বাইরে আসতে। ওদের চোখ এড়িয়ে রুমালে মুখ মোছার অজুহাতে চুরি করে চাওয়া, আবার মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে সঙ্গীদের কত কি তুমি বলতে।

—জানো সিরিন, আমার সঙ্গীরা মাঝে-মাঝে আমাকে প্রশ্ন করতো, কেন তুমি ঠিক ঐ সময়টায় জানলায় থাকো, আমাকে দেখতে কি? আমি বলতাম, নিশ্চয়ই,—জেলখানায় বসে নূতনত্ব কিছু না পেয়ে আমাদের দেখে তুমি সময় কাটাও। ওদের মধ্যে একজন তোমার রূপে মাথা গুলিয়ে ফেলেছিল। আমায় বলতো, এদেশের মেয়েদের ওড়না-পরা সাজটা বড্ড বেশী আকর্ষণের, আমাদের দেশের মেয়েদের ওড়না-খোলা রূপ সয়ে গেছে,—কিন্তু এ আবরণ-ভেদ-করা রূপের জেল্লা! বুঝলাম, বেচারা মরেছে। তাকে বল্লাম, রূপকে লুকিয়ে রাখতে চওয়ার ঐ ভাণ করা, ওর মধ্যে আছে অত্যন্ত জটিল ফাঁদ! রূপকে ছড়াবার জন্যই ঢাকঢাক

এ বন্দি ! সঙ্গী বল্লে, না, সত্যি, এমন সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। ওরা কতদিন বলেছে, কেন তুমি ওদের এমন করে সাজা দিচ্ছ! একজন আবার বলেছিল, চাঁদের গ্রীক-নামের কথা,...তুমি ছিলে ওদের লুনা! তোমায় দেখে ওরা পাগল হতো, কিন্তু কেউ কোন দিন এতটুকু অভদ্র মন্তব্য করতে সাহস পায়নি। সে তাদের সুশিক্ষিত অন্তরের জন্য নয়,...বাঁধা নিয়মের সভ্যতার পরিচয় দেবার জন্য। আচ্ছা সিরিন, ওদের মধ্যেও তো দু'একজন বেশ সুপুরুষ ছিল, তাদের তোমার সুন্দর লাগতো না? আমি ওদের জন্য করুণা চাইতাম তোমার কাছে কিন্তু তুমি কেবল চাইতে কখন ওরা বিদায় হবে,.. সত্যি, এ দারুণ অবিচার!

সিরিন বললে,—তোমার দরদ আর সুবিচারের প্রশংসা-পত্র পরে লিখে দেবো। কিন্তু জফি যাঁরা সুন্দর ছিলেন, তাঁদের দেখতে ভালো লাগতো—যোদ্ধার বেশে সতেজ দেহে একসঙ্গে নিয়মানুবর্ত্তিতায় হেঁটে যাওয়ায় বাহ্যিক সজীবতা লক্ষ্য করতাম, আর ভাবতাম, হায়রে প্রাণহীন মূঢ় মানুষ-যন্ত্র, একবার ভাবোনা, জীবনের পরিচয় কি! অথচ বেঁচে আছ তোমরা মরণের নিশান উড়িয়ে! আবার যখন একসঙ্গে কচি-কচি সৈন্যদের অনেকগুলিকে দেখতাম,...তখন যে কি বুক-ফাটা বেদনা হতো, তা তোমায় বোঝাতে পারি না। মনে হতো, চিৎকার করে বলি... ওগো অপ্রস্ফুটিত মুকুলদল অকারণে ধ্বংশ হতে যেয়ো না। এই জীবন্ত সুন্দর প্রাণগুলিকে নিয়ে যে সব নর-রাক্ষস ছিনিমিনি খেলছে, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে' পশুবৃত্তি পরিতৃপ্ত কচ্ছে, তাদেরই ধ্বংশ করো, নিজেরা ধ্বংশ হয়ো না। কিশোর তোমরা, নবীন তোমরা, নরহত্যা তোমাদের কাজ নয়, শুধু অবিচার আর দানবের তাণ্ডবলীলা-ক্ষেত্রে ওরা তোমাদের পাঠাচ্ছে নিজস্বার্থ সিদ্ধ করতে।

জফি বললে,—আচ্ছা সিরিন, এই যুদ্ধটার পিছনে 'কি জাতির কোন উদ্দেশ্য নেই? নর-হত্যাই শুধু উদ্দেশ্য?

সিরিন বললে—উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে,—এবং সেই নীচ হীন পশু-বৃত্তির উদ্দেশ্যটা জানা তোমাদের প্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। মানুষকে চিরদিনের মত হীনতম কাজে নিয়োজিত করা—কজনের স্বার্থ সিদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজয়ী পক্ষ আরম্ভ করবে তাদের এই নীতি এবং মুখে বড় বড় কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে; তার জন্য খশড়া ব্যবস্থা-লিপি তৈরী হবে, ঘটা করে বড় বড় সম্মেলন করবে, ভাড়াটে প্রতিনিধি ডেকে রকমফের করে কথা বলে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। একটি স্থায়ী বিশ্ব-সঙ্ঘও এই সব অভিনেতাদের সাজ-ঘর হয়ে থাকবে; সময়ে তার স্বরূপ প্রকাশ পাবে জতুগৃহ রূপে। আর পরাজিত জাতির কর্ণধাররা অগৌরবের কশাঘাতে জনগণকে আবার দেশ এবং জাতির মর্য্যাদা সম্মান প্রভৃতি লুপ্ত উদ্ধারের জন্য উত্তেজিত করবে! তাদের বর্ত্তমানের পরাজয়-কলঙ্ক এবং দৈনন্দিন জীবনের দৈন্য ও অভাব এবং প্রতি-মুহূর্ত্তে বিজয়ী শাসকের কাছে নতি-স্বীকারের গ্লানি তাদের মনকে দুর্দ্দান্ত ভাবে সমর-আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত করবে প্রয়োজনের তাগিদে। ধনতন্ত্র-নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে ঐ সব দেশের মানুষ আবার যুদ্ধের সরঞ্জাম হয়ে হিংস্র পশুর বৃত্তি নিয়ে আর-এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি এমনি ভাবেই জার্ম্মান জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তাই এত তাড়াতাড়ি হিটলার জার্ম্মান-জাতির মনস্তত্ত্ব এবং বাস্তব অবস্থার সুযোগ নিয়ে সারা জার্ম্মান জাতটাকে সমরানলে আহুতি দিতে পেরেছিলেন। গতবারের শান্তি-সঙ্ঘ বিশ্ব-নিরাপত্তার কথা বলতে জুয়াচোরের দল কিছুমাত্র ত্রুটি করেনি। সে-ইতিহাস একটুও ঘোলাটে হয়নি, জলন্ত প্রমাণ সর্ব্ব-সমক্ষে স্পষ্ট হয়ে আছে! তার পর পঁচিশ বছরও কাটলো না!

জফি বললে—সে ইতিহাস বুঝতে পারবার মতো করে ক'জন পড়েছে? প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখতে পাবার সুযোগ গ্রহণ করবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে সিরিন। কার্য্যক্ষেত্রে যদি তোমাদের মতবাদ ফলপ্রসূ হতো, তা হলে এত বছর ধরে মানুষ অতীতের দুর্নীতির অবসান ঘটাবার ব্যবস্থা করতো না? প্রচার করবার তো নানারকম ধারা জানা গেছে, এবং রাশিয়া সাম্যবাদের নিশান উড়িয়ে উদাহরণ-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল কি, মানুষ-সমাজের চটকদার নানারকম পরিবর্ত্তন বাইরের দিক দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আসল জায়গায় সব ঠিক আছে। যুদ্ধ আরম্ভ মাত্রেই মানুষ আগের দিনের মতোই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গত যুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বিরাট যুদ্ধ বুঝেও তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখীর মতো প্রাণ দিতে আসছে। হিটলার যে দিন প্রথম নূতন সাবমেরিণ পরীক্ষার জন্য (Experiment) কজন মানুষ চাইলেন "নিশ্চিত মৃত্যু জেনে কে আসতে চাও?" পনেরো মিনিটের মধ্যে সাতশো যুবক নাম দিলে। আগে বরং যুদ্ধ-রত সৈন্যরাই যুদ্ধে আসতো, প্রাণ দিত, কিন্তু আজ দেশ এবং জাতির সমস্ত মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা-জালে জড়িয়ে পড়ে প্রাণ দিতে আসছে। পরিবর্ত্তন তো এই দিকেই বোঝা যায়,—সভ্যতার অবনতি, জীবনের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সৈন্য বা যোদ্ধাদের না হয় আলাদা করে রেখে কেবল যুদ্ধের সরঞ্জামের মতো তৈরী করেছে··· তোমার মতে রোমান্সের মদ খাইয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ আর শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়? তারা তো আর অবরোধে ছিল না, নানারকম "বাদ" অধ্যয়ন, সংবাদপত্র, রেডিও, সভা-সমিতি, আখড়া, পাঠ-চক্র, ইতিহাস স্কুল থেকেই তা মুখস্থ করেছে। তারা তো কই এই পঁচিশ বছর পরেই আবার এই বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধে বাধা দিতে চাইলো না! বাধা

দেওয়া দূরে থাকুক, স্বেচ্ছায় এলো দেশের নামে প্রাণ দিতে, জাতিকে রক্ষা করতে, গৌরব-মণ্ডিত করতে! ইয়োরোপে হিটলার একটির পর একটি দেশ গ্রাস করে সেখানে ফ্যাসিষ্ট-আইন চালিয়ে সেই সব দেশের সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করিয়ে যাচ্ছে, সে সব দেশের শ্রমিক, কৃষক যুবকদের দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী করাচ্ছে, কৈ, তারা তো উত্তেজিত হয়ে বিদ্রোহ করলে না! যারা দু'দিন আগে দেশের জন্য প্রাণ দিতে গেল, তারাই আবার হিটলারের পক্ষে যুদ্ধ করছে। তাদের মধ্যে তো অনেক দেশই রাশিয়ার প্রতিবেশী। সমাজতন্ত্রবাদীর অত নিকটের জনগণের এই ভাবে যন্ত্র-চালিতের মতো চলার মানেই হলো তারা কোন জ্ঞান বা শিক্ষার আলো পায়নি। প্রচার যে হয়নি তা বলা চলে না, আমি ইয়োরোপে আমার পাঠ্যজীবন কাটিয়েছি। ইংলণ্ডে ছাত্র-জীবনে আমি সাম্যবাদী ক্লাবের সভ্য ছিলাম, বই পড়া, প্যামফ্লেটে ও পত্রিকায় সাম্যবাদী প্রচার ব্যবস্থা ভালোভাবেই দেখতাম। প্রতি সপ্তাহে ডিবেট হতো। বহু দেশী শিক্ষিত যুবকরা ঐ ক্লাবে যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে হাইড্ পার্কে বড় বড় সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্র-বাদীর বক্তৃতা শুনতে যেতাম। ছুটির সময় আমি বিভিন্ন দেশে বেড়াতে যেতাম, এবং সেখানেও সাম্যবাদী আর সমাজতন্ত্র-বাদী যুবকদের আড্ডায় মিশতাম এবং আলোচনা করতাম। এই সময় ইয়োরোপে শিক্ষিত যুবকদের কমিউনিষ্ট হওয়া ফ্যাশন হয়েছিল। তোমায় এমন উদাহরণ অনেক দিতে পারি। প্রচারের ঘটা কত! থিওরীর পর থিওরী পড়া ঐ সব যুবকদের দৈনিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বল্লে ভুল হবে না। কিন্তু সিরিন, তার সার্থকতা তো এই!

সিরিন একাগ্র মনে শুনেছিল, জফির তর্কের ধরণ এবং সাম্যবাদ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের দিকটা তার মনে কেন জড় বেঁধেছে, সে কারণ আজ বুঝলো। জফির যেভাবে পড়া-শুনা করা আছে, সহজেই ওর সঙ্গে পড়া

আরম্ভ করা যাবে—এই সব চিন্তা কচ্ছিল, এমন সময় জফি জিজ্ঞেস কল্লে,—উত্তর দিলে না যে সিরিন?

সিরিন বল্‌লে—উত্তর আছে জফি, যুক্তির অকাট্য খণ্ডন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে করতে হয়। তোমরা বিজ্ঞানকে নাও আংশিক ভাবে, আমরা নিই সমগ্র ভাবে এবং মূলের সন্ধান বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই করতে হয়। প্রচারের কথা বা আর যা বল্লে, তা সবই স্বীকার করি, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রচার এবং ক্লাবে বসে ডিবেট আর পার্কে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিলেই তো বিপ্লবীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না,...সব-আগে সাম্যবাদীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই। বিপ্লবী সংগঠন প্রস্তুত তার প্রধান কাজ। থিওরী আওড়ে আর থিসিশে বিদ্যা ফলালে সত্যকার সাম্যবাদীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না! তা' হলে তো ধর্ম্মবেত্তারা যুগে যুগে এই মহা-মানবতার বাণী প্রচার করে গেছেন,...দার্শনিকরা নব নব নীতি দিয়ে গেছেন, তার পরিণতি কি, আমায় বলো? বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সমাজ-তন্ত্র-বাদ আর অঙ্ক-শাস্ত্রের মূল কারণ সন্ধান করলে ইতিহাসের ধারাবাহিক নিয়মে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা না প্রমাণ করলে কোন সুফল হবে না। শুধু পুঁথি পড়লে আর বক্তৃতা দিলে হবে কি? যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার ঢেকে আছে, নানা দার্শনিকের অসংখ্য মতের জালে জড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়ে আছে যারা, তাদের কাছে শুধু ফাঁকা বক্তৃতা ছড়িয়ে কি হবে? বিপ্লবের কাজ সক্রিয়তায়, বিরামহীন সংগ্রামে। গত মহাযুদ্ধের পর যখন বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক আর সামাজিক সঙ্কট উপস্থিত হলো, তখন ইয়োরোপের বহু দেশে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে এবং সাম্যবাদী সংগঠনের দুর্ব্বলতায় জাতীয় সংগ্রামের জয় হলো। সুবিধাবাদীরা ক্ষমতা নিলে, প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের আত্মহত্যার নীতি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো—তারই পরিণতি

এই বিকট দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর। কিন্তু অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে অনুশোচনা বা অভিযোগ করা বিপ্লবীর কাজ নয়। কারণ অনুসন্ধান করে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রতিক্রিয়াপন্থিদের বিশ্বাসঘাতকতার নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে আমরা এগিয়ে চলবো আমাদের বিপ্লব-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে। বিশ্ব-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের কর্ম্মসূচী আমাদের পন্থা এবং সামরিক কৌশল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের অভ্রান্ত নীতিতে প্রস্তুত, যে-নীতির অনুসরণে রাশিয়ায় লেনিন ট্রট্স্কি সর্ব্বহারা বিপ্লবের সার্থকতা এনেছিলেন, এবং সাম্যবাদী সমাজের প্রথম ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন সর্ব্বহারা এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। লেনিন ট্রট্স্কির মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া-পন্থী সুবিধা-বাদীরা সে-নীতিকে বিকৃত করেছে, আমরা তার উচ্ছেদ করবো,—দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর আমাদের সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সামাজিক দুর্য্যোগ চরম ভাবে উপস্থিত হবে এবং হচ্ছেও, সেই বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের পূর্ণ সহায়ক। বিশ্বের নির্য্যাতিত শোষিত জনগণ বিশ্ব-বিপ্লবের সৈনিক যোদ্ধা এবং আমাদের বিশ্ব-সাম্যবাদী সঙ্ঘের সদস্যরা সেই সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

জফি বললো,—বিশ্বের শ্রমিক কৃষকদের দ্বারা সে সংগ্রাম আরম্ভ হবে, মানলাম। কিন্তু তাদের যুদ্ধাস্ত্র কি ঐ ধর্ম্মঘট আর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন বা বিদ্রোহ করা?

—না জফি, আজকের অভাবনীয় যন্ত্রসমরের যুগে (mechanised war technique army) এবং যন্ত্র-কৌশলী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে খণ্ডবিদ্রোহ বা ধর্ম্মঘট ইত্যাদির দ্বারা অরাজকতা আনার কথা বাতুলেই ভাবতে পারে,—কিন্তু আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, আমাদের কেন এ কথা বলছো! এই বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-যুদ্ধের ফলে

সংগ্রামকারী সৈন্য এবং জনগণের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। এছাড়া যোদ্ধারা বা সৈন্যরা তো আর আশমান থেকে আসেনা, তারা এই সমাজেরই মানুষ এবং সামান্য কজন মাত্র উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী ছাড়া আর-সবাই আসে ঐ নির্য্যাতিত শ্রেণী থেকে। কৃষক মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায়, শ্রমিক কেউই আজ যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজ কচ্ছে না বা অত্যাচারের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। দেশ ও জাতির সমস্ত শক্তি আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে যুদ্ধরত সৈনিক ও যোদ্ধাদের মধ্যে—আমরাও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, এবং আমাদের বাহিনী সৈনিক, মধ্য-অফিসার শ্রমিক কৃষক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত।... আমরা জানি, সামগ্রিক যন্ত্র-যুদ্ধে সহস্র সহস্র মানুষের প্রতিরোধ দু'চারটী যন্ত্রের সুইচ টিপে দিলেই অনায়াসে হয়। হাওয়াই জাহাজের একজন চালক শত শত মানুষকে বোমা ফেলে ভস্মীভূত করে। কজন মাত্র ট্যাঙ্ক-চালক, সাবমেরিন-চালক, জীবন পণ ক'রে বিরাট যন্ত্র-সজ্জা ও রণতরী ধ্বংশ করে। এদের শুভ বুদ্ধি এবং সহজ দৃষ্টিকে ঘোরাতে হবে। ঐ সমর-দস্যু রক্ত-পিপাসুদের দুর্নীতি,—যে-নীতির মধ্যে এমন বর্ব্বরতা,—তাকে ধ্বংশ করবার জন্য ঐ সব যোদ্ধা এবং সৈন্যরা উল্টো যন্ত্র চালাবে, নরকের পথ-যাত্রীদের স্বর্গের পথে ফেরাবে। ওদের দুর্জ্জয় শক্তি ব্যতিরেকে বিপ্লবী সংগ্রামের কথা কল্পনা করাও বাতুলতা এবং হাস্যকর। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন, অসাধ্য-সাধনে তা সম্ভব করতে হবে। ঐ যে ভ্রান্ত মূঢ় যোদ্ধারা আজ হিটলার, মুসোলিনী, চর্চ্চিল, রুজভেল্ট, তোজোর ধাপ্পাবাজীর মোহে অন্ধের মতো পশুত্বে নেমে চলেছে, ওদের বোঝাতে হবে, ওদের ফেরাতে হবে; তবেই বিপ্লবী-সংগ্রাম সার্থক হবে। ওরা পারে একদিনে বিশ্ব ঘুরিয়ে দিতে, সে ওরা বুঝবেই। চিরদিনের জন্য

বিশ্ব থেকে এই বীভৎস যুদ্ধের অবসান করে সুন্দর মানব-সমাজ সৃষ্টি করবে ওরা। একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সেই বিশ্ব-বিপ্লব সম্ভব। লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সেই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের কবর দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল আর আমলাতান্ত্রিক সদস্যরা, কিন্তু বিশ্ব-বিপ্লবের সূচনা মাত্রেই তার প্রেত-আত্মা বা মৃত কঙ্কালগুলো মাঝে মাঝে বাধারূপে এসে হাজির হয় আর বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সময় এবং অবস্থা আসন্ন—তখন এই সব সাম্যবাদের মুখোস-পরা ধনতন্ত্রবাদী সাম্রাজ্যবাদীর ধামা-ধরারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের আদর্শে আমরা অটল।

জফি বললে,—তোমার বিপ্লবী প্রাণের নিষ্ঠা এবং চলন্ত জীবনের দুর্ব্বার গতির মাপকাঠি নিয়ে দুনিয়াকে দেখলে কি ঠিক হবে? তোমাদের কাজ আর পথ অত্যন্ত কঠিন! আমার মনে হয়, জগৎ আজ যেভাবে চলেছে, তা তোমাদের ধারার ঠিক বিপরীত। এই দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রূপ দেখেও তো মানুষের মনে সাড়া জাগেনি,—এখনও দেখতে পাই সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান-বাহিনী এবং যুদ্ধের অন্য অন্য কাজে লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিদিন যোগ দিচ্ছে। যে সব দেশ এখনও প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়নি, সে সব দেশেও কি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ধুম! যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ, রসদ পাঠানো সহজেই হয়ে চলেছে। অথচ সেই সমস্ত দেশে আজ যুদ্ধের কারণেই দারুণ অর্থসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ মহামারী—সর্ব্বরকমের অত্যাচার সত্ত্বেও তারা অতি-সহজে অবাধে সব করে চলেছে। কোথায় চেতনা? কোথায় মানুষের সাড়া? অথচ ওদের সঙ্গে কথা কইলে বোঝা যায়, ওরা সব বুঝতে পারে। এই তো আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে এমনি ভাবের কত

আলোচনা হয়, কিন্তু মীমাংসার কথা বলতেও তাদের ভয়। তারা অবস্থার কথা বলে দুঃখের-জ্বালা জানিয়ে শুধু গুমরে মরবার পন্থাটুকুই জানে।

সিরিনের আগ্রহভরা আলোচনায় মাঝে এসে পড়লো তার সর্ব্বক্ষণের প্রশ্ন—কেন মানুষগুলো বুঝছে না? যারা বুঝছে, যারা অন্তর দিয়ে অনুভব কচ্ছে, কেন তারা এগিযে আসছে না? মৃত্যু তো দুদিকেই—কিন্তু একটা মৃত্যু হলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা, —আর একটা মৃত্যু হলো বংশ-পরম্পরায় এই ভাবে ছাগ-বলি হবার আয়োজন। কেন ওরা বোঝেনা? এ চিন্তা সিরিনকে অস্থির অধীর করে তোলে।

জফি বল্লে,—সিরিন, তুমি ক্ষুন্ন হলে তোমার চিন্তা-ধারার বিপরীত দিকটা আলোচনা করলাম বলে?

সিরিন বললে—ক্ষুণ্ন হবো কেন! এই চিন্তা, এই প্রশ্ন আমাকে অহোরাত্র শান্তিহারা করে। কিন্তু হতাশা আমার কোথাও নেই—এবং এর মাঝে থেকে মানুষ অসহ্য হযে উত্তপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, ইতিহাস্ যুগে-যুগে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমার যুক্তির মীমাংসা অদূর ভবিষ্যতে হবে বলে আমার ধারণা। আজ যেখানে ভুল ধারণা রয়েছে, তা স্পষ্ট করে' পরিষ্কার করে' আলোচনা করতেই হবে। তার মধ্যে যত দ্বন্দ্ব, যত অমিল থাকুক, সেটার প্রকাশ যদি কঠিন হয়, তাও প্রয়োজন।

জফি বললে—মানুষের চিন্তাধারায আর চলার পথে যদি সহজেই মিল আসতো তাহলে জটিলতা এবং অশান্তির পরিমাণ অনেকখানি কমে যেতো। দ্বন্দ্ব-মূলক নীতি-অনুসারে মনুষ্য-সমাজ চলেছে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এবং সেই সংঘর্ষের পরিণতি হয় বিপ্লবে। তারপর আসে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও নীতি। কিন্তু উপস্থিত ধনতন্ত্রী সমাজে সর্ব্বদেশের

শাসকদের মধ্যে নীতির মিলটা ঠিকই আছে,—তাই তাদের অন্তর্নিহিত অসন্তোষ সংগ্রাম বাধায় এবং সেখানে একটা মীমাংসা করে ফেলে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে'। সমাজের মূল শক্তিকে তারা খাটিয়ে নেয় বিপ্লবের বিপরীত কাজে, তাই সমাজ-বিপ্লবের ব্যাপকতা হয় না। মানুষ আজ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ স্তরে উঠে অতীতের অনেক কিছুর আমূল পরিবর্ত্তন করেও স্বার্থপর পার্থক্য ও শাসন-শোষণের মূল পদ্ধতি সেই আদিম যুগের মত অটল রেখেছে। এই ব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য তাদের সুচতুর কৌশলও বড় চমৎকার। বড় বড় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, রাজনীতি-বিশারদ অঙ্কশাস্ত্র-বিদদের বেতন-ভোগী করে রেখেছে,— তারাও ঐ শোষণ-যন্ত্রের এক-একটি অংশ! বড় বড় পুঁথিতে নানা রকম থিওরী লিখবে, সহজ তথ্য ও সুমীমাংসাকে কথার রকমফেরের কায়দা করে' যতদূর সাধ্য জটিল করবে, ইতিহাস-বেত্তারা ইতিহাসকে অস্পষ্ট করে' বাহ্যিক ঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে মূল কারণকে চাপা দিতে চাইবে, অঙ্কশাস্ত্র-বিদেরা অর্থ-নৈতিক বিজ্ঞানকে উল্টে বসাবে। ওদের বৈজ্ঞানিকরাও অর্থের বিনিময়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করেন না। মানুষকে অন্ধকারে রাখবার পাকা ব্যবস্থা করতে এতটুকু ত্রুটি নেই! সব চাইতে বড় চাতুরী হলো ওদের গণতন্ত্রের ধাপ্পা—শোষণ-নীতিকে বিনা-বাধায় চরম করে চালাবার জন্য বড় চমৎকার পন্থা! ফ্যাসিষ্ট-নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট! মনে হয়, সংহার করবার জন্য শত্রু সদর্পে মূর্ত্ত হয়ে এগিয়ে আসছে,—তার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু গণ-তন্ত্রের ছদ্মবেশ ফ্যাসিষ্ট অপেক্ষাও অনিষ্টকর! তারা তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবার জন্য আসে,—ওদের জড় ভাঙ্গতে মূল উপড়ে ফেলতে বিলম্ব ঘটে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, আমেরিকাতে সব-চাইতে বড় কথার বেশী প্রচার। সেখানে অর্থ-নৈতিক প্রভেদটা আকাশ-পাতালের মতই

বিরাট। ওদের ধনকুবেররা গগনস্পর্শী স্বর্ণস্তূপে বসে থাকে, আর সেই সোনা যারা বুকের রক্তে বহন করে আনে, তারা থাকে দুর্দ্দশার তিমিরে! পশুর মতো জীবন কাটায় তারা।

আলোচনা এত গভীর, এত অন্তরস্পর্শী হলেও সিরিন মাঝে মাঝে অন্য-মনস্ক হয়ে পড়ছিল। জফি বল্লে—সিরিন, তোমায় কেন এমন ম্লান দেখাচ্ছে? এ-সব আলোচনা যে তোমাকে অত্যন্ত উৎসাহী করে তোলে।

সিরিন বল্লে—কি জানি! মাঝে মাঝে আমার ভোরের ঐ দৃশ্যটাও মনে পড়ে যাচ্ছে। চলো একটু বাইরে ঘুরে আসি। আজ মেঘলা করেছে বেশ, রোদের তাপ নেই।

• •

দুজনে বাইরের পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লো সামনের পাহাড়টায়। সেখানে গিয়ে একটা ভ্যালির দিকে নেমে গেল—ওখানে কোন বসতি নেই, একেবারে নির্জ্জন। সামনে আর একটা খুব উঁচু পাহাড়। একটা পাথরের উপর দু'জনে বসলো। অনেক দিন পরে জফি আজ যোদ্ধার পোষাক পরেছে,—সে সাজ সিরিনকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। পাথরটার ওপর আধশোয়া ভাবে বসে জফি সিরিনকে টেনে নিয়েছে বুকের কাছে,—তার বাঁ হাতে মাথা রেখে সিরিন সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছে পাথরটার ওপর,—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার অবসর কই? সিরিনের চোখ পড়লো সামনের পাহাড়ের দিকে। তার মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া ভ্যালি নেমে গেছে। সিরিন কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ বলে উঠ্‌লো,—দেখ জফি, ঐ যে ভ্যালি নেমে গেছে পাহাড়টার মাঝ দিয়ে—পাহাড় আর ভ্যালিকে ও দু'ভাগে ভাগ করেনি, সংযুক্ত করেছে,—ঐ সবুজে বুক ভরা ভ্যালি দুটো পাহাড়কে কেমন সুন্দর করেছে!

ভাষায় কোন উত্তর না দিয়ে সিরিনকে বুকে টেনে নিয়ে অজস্র চুম্বনে জফি তার মুখখানি রাঙিয়ে তুললো, বললে—সবুজ বুকেই তো মিলনের আকাঙ্খা! বসন্তের সবুজ শ্যামলিমার স্পর্শে জীর্ণ পৃথিবী যৌবনে রমণীয় হয়ে ওঠে।

সিরিনের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ পূর্ণতর হলো। জফির ভুবন-ভোলানো রূপে ডুবে গেল তার সব চেতনা!

বিহ্বল হয়ে তন্ময় দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো জফির কমনীয় মুখের পানে। তার মনের আগল খুলে দিয়ে আবেগ-ভরা কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, আজ ভোরের ঐ শান্ত স্তব্ধ ভাবটি আমার খুব ভালো লেগেছিল,—কিন্তু কেন এমন শূন্যতার অনুভূতি আমায় আকুল করে তুললো, বলতে পারো? তোমার কাছ থেকে একটু সরে গেলাম, তাতে সে অনুভূতি আরো তীব্র হলো, ছুটে এলাম ঘরে—কিন্তু শান্তিতে গাঢ় ঘুমে তোমার এমন সুকান্তি শোভা ফুটেছিল তখন যে তার পাশে ম্লান হয়ে গেল প্রকৃতির শোভা! সে শোভা আমায় এমন চঞ্চল করে তুললে যে তোমাকে না ডেকে থাকতে পার্‌লাম না।

জফি—যখন জেগে থাকি, তখন আমার মনকে কি তুমি অশান্তিময় দেখেছ সিরিন? যতটুকু ঘুমোই মনে হয়, সময় বৃথা গেল! এতখানি উৎকণ্ঠা,—সব সময় অসম্ভব বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে এত অস্বাভাবিক ভাবে দিনগুলো কেটেছে, একবারও মনে হয় না। মনে হয়, জীবনের অনু-মুহূর্ত্ত সুখ-সাগরের তরঙ্গে সাঁতার দিয়ে চলেছে,—থেমে থাকবার অবসর তার নেই, অবাধ গতি! জানো সিরিন, আমি কোনদিন ভাবতে পারতাম না, কোন কিছুর মধ্যে বাঁধা পড়বো! কত দেশ ঘুরেছি, দু'একজন মেয়ের প্রেমের আকর্ষণেও আকৃষ্ট হয়েছি,—কিন্তু এমন করে ধরা পড়িনি কোথাও। সে আকর্ষণ ক্ষণিকের তৃষ্ণা মেটাতো মাত্র। শিবিরে কতদিন

পরে ফিরে এসে দূর থেকে যেদিন তোমায় দেখে অধীর হয়ে উঠলাম, সেদিন কি মনে হয়েছিল, জানো? মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির রণাঙ্গনে যখন যাই, সে সময়ে আমাদের পঁচিশ জনের জন্য মাত্র দু'বোতল জল ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই দু'বোতল জল পঁচিশ জনের ছাতি-ফাটা তৃষ্ণার সময় দু'এক চুমুক যখন পেলাম, তখন জলের জন্য কি অসহ্য আকাঙ্খা! বুক পর্য্যন্ত ভিজলো না সে-চুমুকে তৃষ্ণা বেড়ে গেল সহ্যের অতীত হয়ে—সে অবর্ণনীয় অবস্থা আমি বোঝাতে পারবো না। কোনদিন যদি সাহারার মরুতে গিয়ে সে-রকম তৃষ্ণার্ত্ত হও, তবেই পারবে অনুভব করতে! আর ঐ তিন মাস প্রতি-মুহূর্ত্ত তোমার দর্শন-চিন্তা, কাজের অসম্ভব চাপে উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা কেটে গেছে ডিউটিতে! জরুরী অবস্থার জন্য সে-কাজে আমায় পাঠিয়েছিল, অতখানি দায়িত্ব এবং কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তোমার আকর্ষণ আমায়——

বাধা দিয়ে সিরিন বল্লে—জফি, তুমি বলেছ সুখ-সাগরে সাঁতার দিয়ে চলেছি! যেদিন তীরে উঠতে চাইবে, ক্লান্তি যদি তোমায় তীরে টানে? বলতে গিয়েই সেই ভোরের আশঙ্কা সিরিনের মনে উদয় হলো।

জফি ব্যথিত হলো—সিরিনের এই সংশয় তাকে আঘাত করে,—অবশ্য যুক্তি দিয়ে তার কারণও যথেষ্ট পায়—এবং নিজের মনের মাঝে সময় সময় যে প্রশ্ন, যে সন্দেহ জাগে, তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। দু'জনে স্তব্ধ···নিজেদের মধ্যে যে-প্রশ্ন অমীমাংসিত, তার উত্তর সহজে মেলে না।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটলো। মেঘ এসেছে ঘোর হয়ে,—আকাশে পাহাড়ে মিশে গেছে,—ধোঁয়াটে রং·····ওদের মনের সঙ্গেও প্রকৃতি রং মিশিয়েছে। পরিবর্ত্তনশীল গতির নিয়মে প্রকৃতিকে চলতে হয়। বৃষ্টির ধারা আরম্ভ হলো—তখন চমক ভাঙ্গলো ওদের ধোঁয়াটে

চিন্তার। ছাতা বা বর্ষাতি নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবে বলে উঠলো।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। জফি বল্লে,—সিরিন কালটা যে বর্ষা এবং পাহাড়েরও নানারকম খেলার খেয়াল হয়, চিন্তা কর্‌বার ফুরশত ছিল না। সিরিন একটু হেসে জফির মুখের পানে চাইলে মাত্র ; তারপর বল্লে,—হ্যাঁ। এখন চলো। তোমার মতো হুঁশিয়ারের সঙ্গে চললে আছাড় না খাই !

—কোথায় আছাড় খেতে চাও ?

সারা পথ বৃষ্টিতে ভিজে দু'জনে বাড়ী ফিরেছে। বৃষ্টি তখন থেমেছে, একটা দিক মেঘমুক্ত সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত ঝক-ঝক কচ্ছে—জফির চুলগুলো ভিজে, সুন্দর কপাল থেকে মুক্তা বর্ষণের মতো জল গড়াচ্ছে। বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। বেশ-পরিবর্ত্তনের কথা ভুলে রূপ-সুধা পান কচ্ছে সিরিন—জফির অবস্থাও অনুরূপ। তার ইচ্ছা হলো সিরিনকে খোঁচা দিতে। বল্লে—আচ্ছা সিরিন, তুমি নিজে এত সুন্দর—তোমার ঐ উদ্‌ভ্রান্ত-করা সৌন্দর্য্য-পিপাসা মেটাতে আয়নার সামনে দাঁড়াও না কেন ?

সিরিন বল্‌লে—এ উপদেশ আমায় না দিয়ে নিজে গ্রহণ করলেই তো হতো, তা হলে আর ক্যাম্পে দূরবীন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো না।

জফি—হ্যাঁ, আয়না দিয়েই তো রূপ-সাধনা করতাম, দূরবীনটা সাহায্য করতো মাত্র।

ওদিকে বুড়ী বড় ব্যস্ত···খাবার সময় পার হয়ে গেল ওরা ফেরেনি,

চাকরকে পাঠাচ্ছেন সন্ধানে। ওরা তখন পিছনের বারান্দায়,—বুড়ীর কথা শুনতে পেয়ে সাড়া দিলে—আমরা ফিরেছি।

দিন কেটে চলেছে। সিরিনের কমরেডরা মাঝে-মাঝে নানা ছদ্মবেশে আসেন। বই-কাগজ ইত্যাদির নিয়মিত ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁদের আসা কেউ বড় জানতে পারে না; গভীর রাত্রে এসে রাত্রেই ফিরে যান। সাম্যবাদী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি চয়ন করে জকি ও সিরিন একসঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে। সিরিনের তালিকা-অনুযায়ী ধারবাহিকভাবে পড়বার সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। বিশেষ বিশেষ বইগুলির সঙ্গে জকি মোটেই অপরিচিত নয়। দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য জীবনের গতিকে গতানুগতিক করেছে। জকির সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে' এবং আলোচনা করে' সিরিনের মনে আশার আলো দেখা দিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে এখনও দেরী আছে—এইটেই তার সব সময় মনে জাগে। আগে নিজের দু'একটা কাজ যা করে নিতে সময় কাটতো, এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। কাজ করবার জন্ম লোক এসেছে।

আজ দু'পুরে সামরিক পরিচ্ছদে এক ভদ্রলোক এসে সিরিনকে ডাকলেন। জকিকে সিরিন বল্লে,—এসো আমার সঙ্গে। উনি আমাদের কমরেড।

প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হলো না,—সিরিনের সঙ্গে ভিতর-দিকের বন্ধ শয়ন-কক্ষে ওদের আলোচনা সুরু হলো। উপস্থিত যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে বহু সংবাদ কমরেডের কাছে পাওয়া গেল। ইনি ইয়োরোপের রণক্ষেত্র থেকে ফিরছেন, সংক্ষেপে রণাঙ্গনের বিকট বর্ণনার চেষ্টা করলেন। ইয়োরোপে ও এশিয়ার এই সময় যুদ্ধের ভয়ঙ্কর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তারই সাধারণ আলোচনা কিছু হলো। সিরিনের সংবাদ সংগ্রহের জন্ম

স্তূপীকৃত সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্র ইত্যাদি দিয়ে সন্ধ্যার সময় তিনি বিদায় নিলেন।

রাত্রের আহার-শেষে মিলিটারী মনস্তত্ত্ব এবং নিয়মানুবর্তিতার কথা উঠলো। সিরিন বল্লে,—আচ্ছা জফি, তোমাদের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে আটকে রাখার জন্য জীবনের বৈচিত্র্য কি একেবারে হারিয়ে যায় না? ওর মাঝে তোমরা আনন্দ পাও কি করে?

জফি—আমাদের গতানুগতিক শিক্ষার ধারা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে কৃত্রিম আনন্দের ব্যবস্থার মধ্যেই আনন্দ আমাদের খুঁজে নিতে হয় এবং সে সব ব্যবস্থা সাধ্যমতো ওরা করে —নাচ, গান, সিনেমা, খেলা-ধুলো, হৈ-চৈ করতে বাধা নেই। তার ওপর মদ খাওয়া আছে, মেয়েদের নিয়ে মাতামাতি করা আছে। ওপরের একটা স্বাভাবিক আবরণও সকলের দরকার হয় না! বড় বড় অফিসারদের মহিলা-সঙ্গিনী হলো মর্য্যাদার কথা। সে উদাহরণ নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী বা সৈন্যরা অনুসরণ করে যথেচ্ছভাবে। তার জন্য কোর্ট-মার্শাল-এর ভয় থাকলেও বিশেষ বাধা হয় না। তার ওপরে আছে আদর্শ বাণী—দেশের জন্য, জাতির জন্য আমাদের এই ত্যাগ উৎসর্গ ইত্যাদি বুলি। অনেক আবার গর্ব্ব অনুভব করে, জাতির কল্যাণে নিজেদের ব্রতচারী মনে ক'রে। তা ছাড়া কজনই বা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে এই বৈচিত্র্যহীন একটানা দিনের অসহনীয়তা? বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে—সমাজে তারা কোন দিনই আসল মর্য্যাদা কাকে বলে তা বোঝবার অবসর পায়নি। অথচ ধনবান, মর্য্যাদাবান উচ্চ শ্রেণীর আভিজাত্য, ভোগ, বিলাস, মান, মর্য্যাদা সবই বুঝতে পারবার মত শিক্ষা এবং সুযোগ তারা পেয়েছে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে তুলনা করেছে

তাদের বিদ্যাবত্তা ও সমাজের দারুণ পার্থক্যের ব্যবস্থা। মিলিটারীর মধ্যে এসে সহজে সেটা পায়। মর্য্যাদার মোহ ঐ যুবকদের অত্যন্ত প্রবল। আর একদিকে তুমি যেমন বলো যে তারা যুদ্ধে যায় অভাবের তাড়নায় পেটের ভাত-কাপড়ের সংস্থানের জন্য—কিন্তু অন্য দিকটার তাড়নার কথাও তো তোমরা বোঝো সিরিন!

সিরিন—নিশ্চয়ই বুঝি। আমাদের কাছে ঐ শ্রেণীর অর্থনৈতিক বা সামাজিক মর্য্যাদার অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে ওরা সর্ব্বহারা। সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক অঙ্কশাস্ত্রে তা প্রমাণিত। কিন্তু ঐ যে বল্লে, মর্য্যাদার স্তরকে স্বতন্ত্র করে রাখার মোহ, সে মনস্তত্ত্বের কথা আমরা অস্বীকার করি না। হিটলার জার্ম্মানীতে এসে ক্ষমতা অধিকার করবার পরেই জার্ম্মানীর যুবকদের কাল্পনিক শ্রেণী-মর্য্যাদার মনস্তত্ত্ব ভালো করে বুঝেছিলেন এবং সামরিক পদ-মর্য্যাদা দিয়ে তাদের নানা ভাবের চাহিদা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জার্ম্মানীর যুবকদের (militarize) সামরিক বাহিনীতে পরিণত করে চমৎকৃত-করা সমর-শক্তির পরিচয় দিলেন। অন্যান্য জাতিও এই পন্থা গ্রহণ করে, তবে হিটলারের অভাবনীয়-ভাবে-বেড়ে-ওঠা অত অল্প সময়ের মধ্যে—এই ব্যবস্থাই তার বেশী সাহায্য করেছিল।

জফি—কিন্তু সিরিন, তুমি কি কেবল মিলিটারী মানুষেরই শুধু এই বৈচিত্র্যহীন একটানা জীবন দেখতে পাও? সমাজের সর্ব্বস্তরে, সকল ক্ষেত্রেই গতানুগতিক জীবন কাটানো—সত্যকার আনন্দ-উপভোগ কজন করতে পারে? সর্ব্বত্রই সংখ্যা-গরিষ্ঠরা একঘেয়ে জীবনের নিষ্ফল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। চেষ্টা করে আনন্দ করলেও কতটুকু সম্ভব হয়, বলো? সাধারণ মানুষের মনের শিক্ষা এত ক্ষুদ্র যে জীবন্ত মনের ধারণা তাদের নেই বল্লেই হয়। দৈনন্দিন কাজে শুধু কোনো রকমে দিন কাটিয়ে

দেওয়া! পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের মনের সুখ-দুঃখের গণ্ডিকে নিম্নতর করে দিয়েছে। সমাজের কোন্‌ স্তরের লোক সত্যকার আনন্দ উপভোগ করে, সহজ স্বচ্ছ চলন্ত জীবন অনুভব করে, আমায় দেখাতে পারো? কিন্তু তবু তারা আনন্দ খুঁজে নেয়, দিন কাটিয়ে চলে, দুঃখের দহনে বিদ্রোহ করেনা, সমাজে বিপ্লবও ঘটায় না। এইটেই সমাজের নিয়ম বলে মেনে নিয়ে তারা স্বাচ্ছন্দ্য পায়!

সিরিন—সত্যই স্বাচ্ছন্দ্য পায়, জফি? আনন্দ করতে পারে এই সমাজের মানুষরা? মোটেই নয়। আমি শুধু সর্ব্বহারা নির্য্যাতিত শ্রেণীর কথা বলছি না। তারা তো কোন রকমে আধপেটা খেয়ে, পর্ণকুটিরে বা পথে পড়ে দিন কাটায় বা ত্রিশ-টাকা বেতনের কলম-পেশা সেরে মৃতবৎ সমাজের মিউজিয়ামে সাজানো থাকে,—তাদের কথা নয়, তারা মানুষের স্তরে নেই। আমি বলছি ধন-কুবের আর ভোগ-বিলাসের উচ্চাসনে যারা বসে আছে, যারা কোটি-কোটি মানুষের রক্ত শুষে সমাজের শীর্ষ স্থান দখল করেছে, রাজা-মহারাজা সম্রাট-বণিক ইত্যাদি,—তাদের জীবনই কি সুখের? তারা স্বস্তিতে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে? তা'হলে আজ বড় বড় বিচারালয় উঠে যেতো, আইন-সভার প্রয়োজন হতো না, আইনজ্ঞের সৃষ্টি হতো না। বিশ্বাসঘাতকতা খুন, জখম, মারামারি, ব্যভিচার, এ সব ঘটনা ঐ উচ্চস্তরের মানুষদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। দস্যুবৃত্তি, জালিয়াতি, জোচ্চুরি, নারী নিযে কদাচার, এ-সব কলঙ্ক-কলুষের সৃষ্টিকর্ত্তা হলেন তাঁরাই। মজা এই—সুসভ্য সমাজের এই কলঙ্ক-কালিমা বড় বড় উপন্যাস, নাটক, নাট্যশালা, চিত্রগৃহ—সর্ব্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। সমাজ-বেত্তারা তাঁদের নব-নব আদর্শের পথ দেখিয়ে এ-সব নীচবৃত্তি এবং দুষ্কার্য্য বন্ধ করবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন। দার্শনিক, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজ-হিতৈষী কিছুরই অভাব নেই—দেশ-বিদেশের

—মিলিটারী সাব্‌! আর কিছু বলতে পাল্লে না। কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে জফি বল্লে,—বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করতে এসেছি,—তোমাদের গুলি করবো কেন?

এবার তারা একটু আশ্বস্ত হোল। জফির গাম্ভীর্য্যে তাদের আতঙ্কের ভাব কেটে গেল। সিরিন ওদের চারজনকে দু'টো টাকা দিয়ে বল্লে,—কাল এই সময় এখানে আসবো। তোমরা যেমন ফুল গেঁথে চুলে পরেছ, ঐ রকম ফুল গেঁথে এনো। তারা বল্লে—টাকা দিতে হবে না,—এ ফুল আমরা জঙ্গলে তুলেছি, আমরা তোমায় অমনি দেবো। বলেই নিজেদের মাথায় গোঁজা ফুল খোলবার উদ্যোগ করলো। সিরিন বল্লে,—না, ফুল তোমাদের মাথায় থাক,—কাল আমায় ফুল এনে দিয়ো। এই টাকা দুটো নাও,—তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো।

ওরা কজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে। কি যেন পরামর্শ হলো। তারপর বল্লে,—না, আজ নেবোনা। কাল ফুল আনবো, তখন টাকা নেবো। বলে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সহজ ভঙ্গীতে চারজনে চলে গেল।

সিরিন বল্লে,—মিলিটারী পোষাক মেয়েদের মনে কি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, এই সব সরল জংলী মেয়েগুলো—এরাও বুঝে ফেলেছে মিলিটারী পোষাকের মাহাত্ম্য! মিলিটারী লোকের সামনে পড়লে এরাও যেন কেঁপে ওঠে। জেলখানায় কত আসতো মিলিটারীদের অনুগ্রহের বীভৎস নিদর্শন।

জফি সোৎসাহে বল্লে,—কি অপরাধে তারা আসতো?

সিরিন—অপরাধ? এ অপরাধ তো সমাজের কর্ত্তরাই সৃষ্টি করেছেন—মানুষের অনাচারকে প্রশ্রয় দিতে! এ অনাচারে বাধ্য করাচ্ছেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আর শাসন? সে ব্যবস্থাও এমনি ভাবে তৈরী হয়েছে। অস্বাভাবিক জীবনের রুক্ষতায় একান্ত

দৈহিক প্রয়োজনকে সৈনিক এবং অফিসাররা যখন মরিয়া হয়ে মেটাতে চায়, তখন এই সব অভাগা মেয়েগুলো হয় উপকরণ! তারপর আইন-আদালতের অভিনয়-শেষে এদেরই জেলে দিয়ে নিখরচার হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়ে সরকারী ট্রেজারিতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা! দিনের পর দিন ওদের কথা আমি শুনতাম আর সমাজের বীভৎস ছবি চোখে দেখতাম। জেলটা এমন জায়গা যেখানে সমাজের সর্ব্ব-রকম জঘন্যতা, ব্যভিচার আর দুর্বৃত্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখা যায়। আমি সর্ব্ব-শ্রেণীর অপরাধীদের ইতিবৃত্ত ও জীবন-কাহিনী লিখে পাঠাতাম বাইরে। সমাজের নগ্ন রূপ দেখতে পাবার অমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও নেই! আইন, আদালত, পুলিশ, গুপ্তচর গভর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিধ দুর্বৃত্ততার প্রমাণ কাগজে-কলমে সেখানে লিপিবদ্ধ। এই হলো বর্ত্তমান ব্যবস্থার আসল রূপ আর প্রকৃত পরিচয়।

জফি—কেতাবে অনেক পড়েছি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝতে পারা যায় অনেকখানি, তবু তোমার কাছে শুনবো।

সিরিন—বেলা বেড়ে গেছে, চলো, এখন ফিরি।

বাড়ী ফিরে দেখে, সিরিনের সুন্দরী ফলওয়ালী অপেক্ষা কচ্ছে। জফি বল্লে,—সিরিন আমি স্নান করতে যাই, তুমি তোমার ফল বাছবার কাজ সেরে নাও। প্রতি সপ্তাহে ফলওয়ালী আসে—দু'ঘণ্টা ধরে তো ফল বাছতে বসো। আজ ও নিশ্চয় বেশীক্ষণ বসে আছে, তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

সিরিন—ফলওয়ালীর ওপর অত দরদ কেন জফি? হ্যাঁ, হবার কথা আছে! সুন্দরী ফলওয়ালী, তার ওপর রঙীন ওড়না ঢাকা দিয়ে থাকে।

জফি—তা হলে তো মন্দ হতো না, কিন্তু দরদটা আমার নিজের ওপর! কতক্ষণ যে ঘড়ির কাঁটা গুণে কাটাতে হবে জানিনা। স্নানের ঘরে আমি এখন সময়টা কাটাই, তুমি নিখুঁত ভাবে ফল বেছে নাও।

সিরিন এ-কথার আর কি উত্তর দেবে, ফলওয়ালী আছে সামনে,—বল্লে,—আচ্ছা, এর পর থেকে আর তোমায় ছেড়ে ফল বাছতে বসবো না, তোমায় সঙ্গে নিয়ে বসবো।

এক ঘণ্টা পরে ফলওয়ালীকে বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সিরিন খাবার টেবিলে এসেছে। প্রতিদিন সুন্দর আপেল আঙ্গুর প্লেটে সাজিয়ে জফিকে দেয়, আজ দুটো লাল টুকটুকে তাজা আপেল আর এক-থোলো আঙ্গুর জফিকে দিয়ে বল্লে,—দেখ তো, নিজে ভাল করে বেছে নিলে কত সুন্দর ফল পাওয়া যায়। যা কিছুই ভাল করে পেতে চাও, তার জন্য সময় দিতে হয়, পরিশ্রমও করতে হয়। দেরী হয় বলে তুমি কত কি বল্লে!

জফি বললে,—ভালো সময়টুকু অনর্থক নষ্ট হয় বলে আমি রাগ কচ্ছিলাম। তোমার ফলওয়ালী এলেই তুমি অন্তর্ধান হও।

সিরিন—আর রাগ করতে হবেনা। ভালো জিনিষ বাছবার সময় তুমি আমায় সাহায্য করতে এসো।

জফি—না; তোমার ফলওয়ালী আমায় দেখলে বড় অস্বস্তি বোধ করে। সে-দিন তুমি স্নানের ঘরে ছিলে, আমি ওকে বলতে গেলাম একটু অপেক্ষা করো,—কথারও উত্তর দিলে না, কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল। তারপর দেখি, তোমার সঙ্গে উৎসাহ-ভরে কেমন সহজ হয়ে কথা বলছে! গ্রাম্য মেয়ের জড়তা মোটেই নেই।

সিরিন—তোমাদের জাতকে দূরে রাখলেই নিরাপদ—তাই ভেবে বোধ হয় ও-রকম করেছে। সত্যি তোমরা ভয় পাবার জাত।

জফি—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে কথাটা তোমার কিন্তু উল্টো হলো সিরিন। তবে এটা ঠিক, তোমরা সব সময়ই মনের কথাটা উল্টে বলো। ইচ্ছা আর ভাবকে নানা কৌশলে বিপরীতভাবে প্রকাশ করো! তোমাদের ঐ আর্টটুকু আমরা উপভোগ করি।

সিরিন এমন মোলায়েম গালাগালটুকু সহ্য করে কেমন ক'রে? অথচ জবাব দিতে গেলে মিথ্যা যুক্তিতে হার মানতে হবে, তাই প্রতিশোধের পন্থা নিলে, বল্লে,—তবে দেখছি আমায় সাবধান হতে হলো, সুন্দরী ফলওয়ালী যদি আবার উল্টো করে কিছু জানিয়ে গিয়ে থাকে, তা উপভোগ করতে তোমার দিনের কতখানি সময় কেটে যাবে।

জফি—এখনো পর্য্যন্ত তোমার ফলওয়ালীর কোন ভাবই লক্ষ্য করবার অবসর হয় নি! কেবল ভাবি, কত তাড়াতাড়ি চলে যাবে!

খাওয়া হয়ে গেলে ঘরে এসে সিরিন বল্লে,—জফি, বুড়ী না হয় কানে শোনে না, কিন্তু তুমি এমন কাণ্ড করো যে বুঝতে ওর কিছু বাকি থাকে না।

জফি—না বোঝবার কি আছে সিরিন? তোমায় মূহুর্ত্তের জন্য···

বাধা দিয়ে সিরিন বল্লে,—থাক্‌ গো, আর বলতে হবে না। আচ্ছা জফি, তোমরা সৈনিকের দল যেন স্বাভাবিক ইচ্ছা দমন করে সব-তাতেই উদাসীন, কোনো-কিছুতে কৌতূহল নেই—এই দেখাতে ব্যস্ত। মন তোমাদের মেশিনেরই মত স্ক্রু দিয়ে টাইট্‌ করা—অবশ্য মিলিটারী মেশিনের রীতিই তাই,—মানুষগুলোকে যন্ত্রে রূপান্তরিত করা, তা নাহলে মানবীয় সংস্কারের সুকুমার বৃত্তি নিয়ে কেমন করে নির্ম্মম হত্যা কাজে লাগ:তে পারে? ঠাণ্ডা মাথায় কিভাবে নরহত্যা করে চলেছে! পাখী শিকার করতেও যতটুকু মন টলে, তাও টলে না ঐ ঘাতকদের। কতদিনে এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পাবে মানুষ!

জফি—সাধারণ অনুসন্ধিৎসা এবং অনাবশ্যক কৌতূহল আমার স্বভাবতই কম ছিল, এবং আমার শিক্ষাও সেই ভাবে হয়েছিল। তারপর সামরিক নিয়মে সেটা আরও বেশী বেড়েছে। আমার মনে হয় ও-দুটো কম থাকলে মানুষ অনেকখানি স্বস্তিতে থাকে। অনাবশ্যক কৌতূহল, আর অকেজো অনুসন্ধিৎসা জীবনে শুধু জটিলতা বাড়ায়, পদে পদে ঝঞ্ঝাট আনে।

সিরিন—ঐ যে অনাবশ্যক আর অকেজো কথা দুটো ব্যবহার কল্লে, ওতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তি। আমি বলছি স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এবং জানবার আগ্রহে যে কৌতূহল জাগে, মানুষের অভিজ্ঞতা-লাভের পক্ষে তা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই মানব-সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে মানুষের ঐ বৃত্তির অনুশীলনের ফলেই জগতে কত বড় বড় আবিষ্কার, সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে। জানবার দুর্দ্দম আগ্রহেই মানুষ জীবন তুচ্ছ করে প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছে। অনুসন্ধিৎসার আবেগে এ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নব নব সৃষ্টি এবং আবিষ্কার করেছে। আজও তার শেষ নেই। প্রকৃতির দুর্ব্বার শক্তিকে জয় না করা পর্য্যন্ত মানুষ অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং আবিষ্কারের প্ররোচনায় ছুটে চলবে। মানুষের মধ্যে যে সংগ্রাম-কারিণী শক্তি আছে, সেই শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করবে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃত মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য তা অপরিহার্য্য। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি—এই গভীর অনুসন্ধিৎসা না থাকলে মানুষ মানুষকে বুঝতে পারে না। তীব্র আগ্রহ নিয়ে মানুষের রীতি, আচার-ব্যবহার, দোষগুণ ভালমন্দ বিচার করা চাই,—নাহলে মানুষের মনের প্রকৃত সন্ধানী হওয়া যায় না। পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সমগ্র মানব-প্রকৃতিকে বিচার করবার যে নীতি,—তা হলো মনের সন্ধানে আগ্রহশীল হওয়া। বই পড়ে যে জ্ঞান হয়, তাতে মানুষ সত্যকার অভিজ্ঞ হতে পারে না, জ্ঞানী হতে

পারে না। পুঁথির পাতার সঙ্গে যখন মানুষের স্বাভাবিক গতি মানুষের মনের ধারা আর ক্রিয়াকে মিশিয়ে নেয়, তখনই পারে জ্ঞান অর্জ্জন করতে, শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় দিতে। আদর্শবাদী কর্ম্মী হতে হলে এই ভাবের জ্ঞান আর মনের শিক্ষাই সব আগে প্রয়োজন, নাহলে পুঁথির বিদ্যা আউড়ে থিওরী-থিসিশের তর্ক-বাগীশ হলে কাজ কিছুই হয় না, তোমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-বৈঠকে হাততালি মেলে মাত্র।

জফি—নিশ্চয়ই, বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া বই-পড়া জ্ঞানের মূল্য শুধু অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে দর বাড়ায়। পুঁথি রচনা হয় বাস্তব অবস্থা থেকেই। তাকে তো মিলিয়ে নিতে হবে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে, নাহলে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। জীবনে আমাদের বহু মানুষের সংস্পর্শে আসবার সুবিধা যথেষ্ট, কিন্তু তাদের মনের তথ্য সংগ্রহ করা বা ঘনিষ্ঠতা করার সুযোগ পাওয়া যায় না, সেখানে বিধি-নিষেধের অত্যন্ত কড়াকড়ি। তা সত্ত্বেও মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং নানা রকমের চরিত্র বিশ্লেষণ করবার সুযোগ আমার হয়েছে। বহু জাতির সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময় তাদের মনোবৃত্তি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের রীতিনীতি শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। তাদের মধ্য থেকে দেশ আর জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা বেশ বোঝা যায়। তাদের ট্রেনিং দেবার সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের সমাজের রূপ, কিন্তু আমরা ওদের একত্র করে ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা মোটেই করতে পারি না। কাজের অতিরিক্ত কথা বলার আইন নেই।

সিরিন—হ্যাঁ, সে তো করতেই হবে আলাদা! মানুষের সমাজের বিরাট দিককার দ্বার রুদ্ধ না করলে কি করে সম্ভব হবে অমানুষিক কাজ করাবার? কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে আলাদা করে রাখতেই হবে ঐ শক্তিকে—কারণ সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর সুখ-দুঃখময় জীবনের সঙ্গে

সৈনিকদের জীবন জড়িত, তাদের মধ্য থেকেই এসেছে ওরা। সমাজের ঐ দারুণ অসন্তোষ দৈন্য নির্য্যাতন ওদের গোচরে যত কম আসে, তা করতে হবে যে। কিন্তু যেদিন সমাজের মধ্যে জ্বলে উঠবে অসন্তোষের আগুন, সহের সীমা যেদিন ছাড়িয়ে যাবে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তার চরম পরিণতির সময় ঐ সব বেড়া-দেওয়া জালে-মোড়া সৈন্যরা আসবে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে। সেই বিপ্লবের প্রতীক্ষা কচ্ছে আজ ওদের সুপ্ত মন, তা ওরা বোঝে না। মিলিটারী ব্যারাকে ওদের মন কারাবদ্ধ হলেও মনকে কবর দেওয়া সম্ভব হয় না,—সহজ জীবনের আর সমাজ-জীবনের সাড়া অন্তরে থাকে, সেজন্য বিদ্রোহে-বিপ্লবে তারা অগ্রণী হয়, ইতিহাসে সে পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি কজন মধ্য-অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, তাঁরা অন্তর মুক্ত করেই অবস্থা বৈগুণ্যের কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে অসন্তোষের অনল ধূমায়িত। অন্তরের সুকুমার বৃত্তি এবং মানবীয় সংস্কারের কি ভাবে শ্বাস রুদ্ধ করা হয় ঐ "লৌহ-নিয়মে" (iron discipline), সে অন্তর দহনের পীড়া তাঁরা অনুভব করেন। পথ খোঁজেন, কিন্তু সবদিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি —পিছু ফেরবার পথে গুলি, সামনের দিকেও গুলি! তবু এগিয়ে যেতে হবে। তোমাদের মধ্যেও যে অসম্ভব শ্রেণী-পার্থক্য, তার পরিণতিও ভীষণ ভাবে প্রকাশ পাবে। সাধারণ সৈন্যদের কাছে অফিসাররা তো ক্ষমতার ভগবান, আবার অফিসাররা তাঁদের উচ্চপদস্থ-দের কাছে নগণ্য জীব।

জফি—আচ্ছা সিরিন, তোমার কৌতূহলী মন সম্বন্ধে আমার একটা উত্তর আছে। যেদিন তোমায় প্রথম দেখি, সেদিন যদি আমার একটুও কৌতূহল জাগতো সেই সৈন্যটির বিষয়ে, তা'হলে কি মনে হতে পারতো বলো তো?

সিরিন—তার চাইতে যে আরও ভালো,—বনে গিয়ে বাস করা, মানুষের সংস্পর্শে না আসা, বনের পশু-পক্ষী মেরে খাওয়া, ফল কুড়িয়ে খাওয়া, তা'হলে আর শিবির থেকে রোমান্টিক ভাব জানানোর ঝক্কাটও থাকে না, আর ফল-ওয়ালীর আগমনে বিরক্ত হয়ে বসে ঘড়ি দেখতেও হয় না।

জফি—ওগো আমার সুরসিকা আনন্দময়ী, গভীর আলোচনাকে সরস মধুর করে তুলতে আশ্চর্য্য তোমার ক্ষমতা! আচ্ছা, আমার জীবন সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধিৎসা তো কোন সময় বুঝতে পারিনি, অথচ তোমার কাছে কত কত মানুষের জীবন-গাথা শুনেছি,—তা থেকে বুঝেছি তুমি কত গভীরভাবে তাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করেছো,—কত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছ। ধরণীর ধূলা থেকে কত নগণ্য জীবন তুলে নিয়ে মানুষের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছ, কিন্তু কৈ আমার জীবন সম্বন্ধে তোমার কোন আগ্রহ নেই কেন সিরিন?

জফির এই প্রশ্নের মধ্যে একটু বেদনার অনুযোগ সিরিন অনুভব করে ব্যথিত হলো। এতদিন ধরে যে অব্যক্ত কাব্য রচনা করেছে, তাকে প্রকাশ করিয়ে দিলে এই মধুমাখা অনুযোগ। উচ্ছ্বাস-ভরে জফিকে বুকে টেনে নিযে সিরিন বল্লে,—জফি, কোনদিন ভাষায় ব্যক্ত করে আমার এ স্বর্গীয় কবিতাকে প্রকাশ করতে পারবো, তা ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম আমার নিভৃত প্রাণের গভীর ভাব তোমার অন্তরকে জানিয়ে দেবে প্রতিটি অভিব্যক্তির মাঝ দিয়ে; তোমার ভাবপ্রসূ প্রাণ আমার কবিতার ছন্দে স্পন্দিত হবে। তোমার অতীত জীবন না জানতে চাওয়ার মধ্যে আমার কত বড় কাব্য রচনা হয়েছে, তা প্রকাশের ভাষা নেই। তোমার অতীত জীবন আমার কবিতার প্রয়োজনীয় নয়। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য যেদিন আমার জীবনে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এনেছিল, সেই আমার কবিতার ছন্দ! যেমন অকল্পনীয় ভাবে তোমায় পেয়েছি,

এ পাওয়ার পরিণতি হবে তেমনি অভাবনীয় হয়ে, আমার জীবনে পূর্ণতা আসবে, আমার প্রেমের প্রতিষ্ঠা, আমার সৌন্দর্য্য-সাধনা সফল হবে। চিরাচরিত প্রথায় তোমার পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই,—অনাদি কাল ধরে নর-নারীর যে স্বাভাবিক স্বচ্ছ আহ্বান, সে আহ্বানের মাঝে তোমায় পেয়েছি,—যাচাই করবার কষ্টি-পাথর এখানে প্রেমের নিষ্ঠা, মানবীয় সংস্কার হলো এর নিক্তি।

জফি—এত-বড় বাস্তববাদী হয়েও তুমি এতখানি ভাব-প্রবণ, কবিতা সৌন্দর্য্যে এমন বিভোর, এ আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে সিরিন।

সিরিন—বাস্তব-বাদীরা কি প্রাণের কবিতাকে অস্বীকার করে? কল্পনা-শক্তি বা ভাবের বিকাশ কি বাস্তব জগতের বাহিরের বস্তু? সভ্যতা দর্শন, কলা, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাব-প্রবণতা সব কিছুই এই বস্তু-জগতের বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশ হয়েছে। কল্পনা বা ভাবপ্রবণতাকে জগতের বাইরের বস্তু বলে মনে করা কি আশ্চর্য্য কথা নয়? তবে এ-কথা বলতে পারো, আবেগ-উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতাকে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মানবের কল্যাণে যথাযথ সমঞ্জস করে প্রকাশ আর চালনা করা বাস্তব বাদীর নীতি। সে-নীতির বিপরীত ব্যবহার আমি কখনও করিনি জফি! জীবনে ভুল অনেক করেছি এবং দণ্ডও দিয়েছি বহু কঠোরতার মধ্যে, কিন্তু আমাকে বিপরীত গতিতে কোনদিন নিয়ে যেতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে ভুলের দণ্ড দিয়ে শিক্ষা অর্জ্জন করেছি, অভিজ্ঞ হয়েছি কিন্তু পথহারা হইনি! জীবনভোর বহু আঘাত পেয়েছি, সহজাত মানুষ-মনের সুকুমার বৃত্তি নিয়ে মানুষকে কাছে টেনেছি, মানবীয় সংস্কারে শ্রদ্ধা দিয়েছি, বিশ্বাস করেছি—তার বিনিময়ে কি পেয়েছি, জানো? বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সৌজন্য, ভদ্রতা, আত্মীয়তা, ভালবাসার অভিনয়! সে অভিনয় মানুষের দ্বারা সম্ভব বলে কখনও

কল্পনা করিনি। তারপর যখন মানুষের এই বীভৎস রূপ প্রকট হয়ে উঠলো, জঘন্যতার নীচতার চরম পরিচয়ের তীব্র অনুভূতি যেদিন পেলাম, সেদিন হয়ে পড়লাম হিসেবি, তথাকথিত বস্তু-তান্ত্রিক, কতকাংশে মানুষ বিদ্বেষী ভাব। তার পর সাম্যবাদী দর্শনে শিক্ষা পেয়ে সামগ্রিক দৃষ্টি সুস্পষ্ট করলাম। মানুষের মধ্যে এই যে নীচতা, স্বার্থপরতা, পশুবৃত্তির প্রাবল্য, এগুলো খণ্ড করে চিন্তা করা যেতে পারে না, ব্যক্তি-বিশেষকে স্বতন্ত্র করে দায়ী করা যায় না, সমস্ত মানব-সমাজ এর জন্য দায়ী। আজ পর্য্যন্ত সমাজ-নীতি আর ব্যবস্থা যে ভাবে চলেছে, তাতে মানুষের আসল শিক্ষা সম্ভব নয়, এবং এই সকল নীচতা অমানুষিকতা তার অবশ্যম্ভাবী ফল। বিচার-শক্তি দিয়ে এ সমস্ত বুঝে, যুক্তি-তর্কের মূর্ত্ত প্রতীক হয়ে মানুষের সঙ্গে মিশলাম। তাদের অতীত জীবনের খুঁটি-নাটি তথ্য সংগ্রহ করে বর্ত্তমানের স্বভাব-চরিত্রের বিশিষ্টতা, ভাব উচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আবেগ-আকর্ষণের কারণ-নির্দ্ধারণ, বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করে মন মেশালাম। তাদের চলার গতিবেগ পর্য্যন্ত হিসেব কষা হয়ে গেল, তার-পর কোন মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে মনের তার গেল ছিন্ন হয়ে, গতি গেল থেমে,—কে কোথায় কতদূরে চলে গেল! হিসেব করা, অঙ্ক কশা, ইতি-বৃত্তান্ত জানা, সবই ব্যর্থ হয়ে গেল ভুল প্রতিপন্ন হয়ে। কোথাও বা জীবনের সূক্ষ্ম তারের সুর-ঝঙ্কার শুনে সুর মেলাতে চেয়েছি, সুরের মূর্চ্ছনা আরম্ভ হলে সেই সূক্ষ্ম তারগুলি ছিঁড়ে গেছে, ছন্দ হারিয়ে গেছে! না, না জফি, আর পারিনা বলতে আমার দুর্ভোগ-ভরা, ঝঞ্ঝায় ভরা জীবন-গাথা, জ্বালাময় স্মৃতিতে ভরা—থাক সে সব! তোমাকে বুক ভরে নিয়ে, পূর্ণ প্রাণে পেয়ে আমি জীবন্ত হবো, পূর্ণতায় জীবনের গতিকে দুর্ব্বার করে দুর্গম পথে চলবার অপরিমেয় শক্তি পাবো।

জফি দেখলে সিরিনের অসম্ভব পরিবর্ত্তন, এমন বিহ্বল বিগলিত—

এতখানি বেদনার বোঝা সিরিনকে দগ্ধ করে, অথচ কণামাত্র প্রকাশ পায় না! এ যে বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণার অসহনীয় অভিব্যক্তি। জফি পরিপূর্ণ প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাসে সিরিনের অসহ্য বেদনাকে অমৃত সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করলে। সেই স্নিগ্ধ-করা মাদকতায় সিরিন বিভোর হয়ে বল্লে,—জফি, তোমার যেদিন কিছুই জানতাম না, এমন কি তুমি কোন দেশী তাও বুঝতে পারিনি,—সেইদিনই তুমি আমার কত আপন, কত কাছের হয়েছিলে। আমার হঠাৎ-চমকে-ওঠা মনের জীবন্ত ছবি ছিলে সেদিন তুমি, সম্পূর্ণ সহজাত অভিব্যক্তির আকর্ষণে তোমায় পেয়েছি আমার প্রাণের মণি-কোঠায়, বলো জফি, এখানেও পাবো ?

জফি বল্লে,—সিরিন আমার জীবনের সবটুকু তুলে দিয়েছি তোমার বুকের মণি-কোঠায়! সেই মণির আলোয় যদি তার সত্য রূপ দেখতে পাও, তবেই সংশয়হীন হবে,—আর তো আমার কিছুই নেই।

পরের দিন ফলওয়ালী এসেছে, সিরিন জফির হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল ফলওয়ালীর কাছে, গিয়ে বল্লে,—ওগো সুন্দরী ফলওয়ালী, তোমার সঙ্গে এই নূতন খরিদ্দারের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি খুব ভালো লোক,—তুমি যত চড়া দামেই জিনিষ দাও না কেন, সে দাম দিতে ইনি কৃপণ হবেন না।

ফলওয়ালী তখন ওড়নাটা একটু সরিয়ে চোখে মিষ্টি হাসি ভোরে জফিকে অভিবাদন জানালো। জফি একটু বিব্রত হলো। অবশ্য সৌজন্যে ভদ্রতায় সে চির-অভ্যস্ত, আভিজাত্যের শিক্ষায় মার্জ্জিত, প্রতি-অভিবাদন সঙ্গে সঙ্গে জানালে। এবং সহজ ভাবেই বল্লে,—ফলের ঝুড়িতে এত চমৎকার ফলাফল থাকতো তা কি আগে বুঝেছি সিরিন!

ফলওয়ালীও ঝুড়ি থেকে সুন্দর কটা ফল তুলে জফির হাতে দিলে।

জফি সাদরে অভ্যর্থনা করে ফলওয়ালীকে বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল, কৌচটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বললে। সিরিন একটু পরে ঘরে এলো—এসে বল্লে—বেশ সোফি, তুমি এতখানি—

সোফিয়া বল্লে,— তোমার অন্যায়ের শাস্তি হওয়া উচিত সিরিন,—অকারণে ভদ্রলোককে তুমি অপ্রস্তুত করেছ!

জফি বল্লে,—চায়ের বন্দোবস্ত করো সিরিন, এঁকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

সিরিন বল্লে,—পরিচয় করিয়ে দেবার পর অন্ততঃ একটুও তো সময় লাগে সহজ হতে,—বিশেষ যে-মানুষের ওপর ছিল এতখানি রাগ!

জফি বল্লে,—সিরিন, তোমার অভিসন্ধি পরে কাজে খাটিয়ো, এখন থাক।

চা খাবার সময় অনেক কথা হলো। বিশেষ এক আলোচনার জন্য ফলওয়ালীকে দু'দিন কাটাতে হলো এদের এই আত্ম-গোপন-আবাসে। জফির সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হলো। জফি জানলো, সে ফলওয়ালী নয়,—সিরিনের সহকর্ম্মিণী সোফিয়া।

মানুষের বসতি থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে এই নির্জ্জন বাংলোয় অসুস্থা বৃদ্ধা মহিলার আবরণে সুখ-শান্তিতে দিনগুলো কেটে চলেছে। সর্ব্বক্ষণ পড়া আর আলোচনা। বাইরের কাজের ব্যবস্থায় সিরিন যখন ব্যস্ত থাকে, জফি তখন বই-এর মধ্যে ডুব দেয়। মাঝে মাঝে কমরেডরা গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে আসেন। দলের কাজে অংশ নেবারও সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। জফির সঙ্গে দলের প্রাথমিক নিয়ম এবং পন্থা সম্বন্ধে অবাধে আলোচনা হয়। উপস্থিত কি ভাবে দল কাজ কচ্ছে ও কর্ম্মপন্থা কি,—জফির কাছে তাও আজ বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই শান্তির নীড়ে বিশ্রামের অবকাশে, প্রাণের প্রতি তন্ত্রীকে সুস্পষ্ট উন্মুক্ত করে সামনের পথে দু'জনেই একসঙ্গে এগিযে চলবার জন্য সঞ্চয় করছে, প্রস্তুত হচ্ছে। জফির অভিনব ভালবাসা সিরিনের কর্ম্ম-জীবনের গতিকে এতটুকু রুদ্ধ করেনি, সে গতিকে এ ভালোবাসা দ্রুত করেছে,--প্রাণে পূর্ণতা দিয়ে আরও সক্রিয় আরও জীবন্ত কবে।

বিপ্লবী জীবনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নির্বিঘ্নে দিন কাটানো কঠিন। কোন প্রতিবন্ধক বা আইনের বাধ্যবাধকতায ক্ষণকালের জন্য সম্ভব হয, – অবস্থার বিপাকে। সিরিন খবব পেয়েছে তাব দুধওয়ালীর কাছে,—মিলিটারী-পোষাক-পরা বহুলোক এ অঞ্চলে খুব বেশী ঘেরাফেরা করে। পাহাড়ের নীচে যে সব অধিবাসী আছে, তাদের ওখানে কি সব গোলমাল ইত্যাদি।

পাহাড়ী পথে মোটর-চলাচল হয় বটে তবে সিরিনরা যেখানে আছে, সেখানে মোটর আসে কদাচিৎ। চাষীদের মাল বহন করে গরুর গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদির যাতাযাত দেখা যায। একেবারে নিরিবিলি স্থান হলেও এ সংবাদ পেযে ভালো করে খোঁজ নিলে। সোফিও এই সংবাদ নিয়ে এলো। এ অঞ্চলে সামরিক অফিসারদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা, এবং সৈনিকদের ক্যাম্প করা হবে। বেশীদিন আর এ স্থান নিরাপদ নয—বৃদ্ধার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে সিরিন এবং জফিকে অন্যত্র যেতে হবে। কবে কোন সময়, বলা সম্ভব নয়। সিরিন বল্লে, এমন একটি স্থান ঠিক করতে হবে যেখানে মানুষের ভীড়! কাজের তাড়নায় সকলে যেখানে ব্যস্ত, কেউ কারও খোঁজ রাখেনা। সোফিযা বল্লে,—যতদূর পারি চেষ্টা করবো আমাদের কাছাকাছি রাখতে।

যুদ্ধের করাল মূর্ত্তি, বিমান-আক্রমণ দেশের চরম দুর্দ্দশায় জনগণের

মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এ সময় কাজ করতে হবে খুব সতর্ক হযে ; এবং বিরামহীন ভাবে সে কাজ চলবে।

এর পরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বৃদ্ধার কাছে বলে রেখেছে—আমার মায়ের অসুখের খবর পেয়ে বড় অস্বস্তিতে আছি, যে কোনদিন অশুভ সংবাদ আসতে পারে, তখনই আমরা চলে যাবো। তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে তবে যাবো। বৃদ্ধা সিরিনকে পেয়ে যেন স্বর্গে বাস কচ্ছিলেন, তাঁর কোন চিন্তা কোন কষ্ট ছিল না। আকুল হয়ে শিশুর মতো তিনি কেঁদে উঠ্লেন, বল্লেন—আজ পনেরো বছরের মধ্যে এমন একজন কেউ ছিল না আমায় একটু যত্ন করে! আমার চোখ-কান দুই-ই গেছে—আমি একেবারে অসহায়। এই দেড় বছর আমি যেন অন্য মানুষ হয়েছি! আবার তোমরা ফিরে আসবে তো?

সিরিন বল্লে,—নিশ্চয়, এবং তোমায় চিঠি দিয়ে জানাবো! তোমাকে দেখাশুনা করবার জন্য আমি এমন একটি মেয়েকে এখানে রেখে যাবো যে তোমার যত্নের ত্রুটি করবে না।

বুড়ী আশ্বস্ত হলেন। তাঁর এ আশ্রয়টুকু অত্যন্ত নিরাপদ ছিল, এখানে জন-মানব আসে না। কদাচিৎ কেউ এলে এই সংবাদই পায়—অসহায় বৃদ্ধার পরিচর্য্যার জন্য সিরিন এখানে আছে; অবস্থা ভালো নয়, তাই জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থায় সে এই কাজ নিয়েছে।

হঠাৎ একদিন রাত দুপুরে সোফিয়া এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা ভিতর থেকে সর্ব্বদা তালা বন্ধ থাকে। সিরিন আগেই সঙ্কেত পেয়েছিল। সোফির ধাক্কায় দরজা খুলে দিলে। সোফি বল্লে,—দোরে গাড়ী হাজির বেগম সাহেবা, বিলম্ব চলবে না। খবর খুব সুবিধার নয় বলে তাড়াতাড়ি এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গেই গোছ করা সুরু হলো। সোফিয়া—আমি গোছ করবো কি রকম? অফিসার সাহেব কোথায়? তাঁদের তো মুহূর্ত্তে তলপী বেঁধে তৈরী হওয়া অভ্যাস। তাঁকে জাগাও!

নিদ্রার ভাণ করে জফি শুয়েছিল, এ-কথার উত্তরে উঠে এসে সোফিয়ার করমর্দ্দন কল্লে। সোফিয়া বল্লে—আমার ভুল সংশোধন কল্লে জফি? ঘুম যে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

সিরিন বল্লে,—তবে আর কি, অফিসার সাহেব সেরে নিন সব গোছ করার কাজ। বলে সিগারেট-কেশটি দুজনের সামনে খুলে ধরলো।

তিনজনে তৈরী হয়ে নিলে। প্রয়োজনীয় জিনিষ আগে থেকেই কিছু গোছানো ছিল। জফি বল্লে,—সিরিনের সিগারেটের মহিমা অশেষ নতুবা এত তাড়াতাড়ি কি তৈরী হওয়া যেত? সোফি বল্লে,—তৈরী কোথায়? এখনও যে আসল বাকী, আমি সেটার ব্যবস্থা কচ্ছি। বলে পোষাকের সুটকেশ খুলে বল্লে,—নাও, গ্রাম্য চাষীর মোড়কে নিজেদের ঢাকো।

জফি বল্লে—ফলওয়ালীর ওড়নায় তুমি যেমন ঢাকা পড়েছিলে তেমনি ঢাকা হবে তো? কিন্তু রূপসীদের রূপের জৌলস পোষাকে ঢাকে না, খানিকটা ধূলো-কালি মেখে নাও মুখে।

সোফিয়া বল্লে,—আমাদের যদি ধূলোতে ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয়, তোমায় তাহলে আলকাতরা মাখতে হবে।

সিরিন বল্লে,—আমি যাই সোফি, বুড়ীকে জাগিয়ে টেলিগ্রামের খরচ দিয়ে আসি। আমার ওপর বুড়ীর অত্যন্ত মমতা, আর জফির সে একান্ত গুণ-মুগ্ধ। যে ব্যবস্থার কথা তোমায় বলেছি সোফিয়া, ভালই হবে। তারপর আবার বুড়ীর কাছেই বোধ হয় নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পারবো।

জফি এবং সিরিন গেল বৃদ্ধার কাছে বিদায় নিতে। সিরিনকে অপত্য

স্নেহে বুকে জড়িয়ে বৃদ্ধা বল্লেন,—আবার ফিরে আসতে ভুলোনা, আমি তোমায় পেয়ে শেষ জীবনে পরম-শান্তি পেয়েছি।

সান্ত্বনা দিয়ে সিরিন বল্লে,—একটুও ভেবো না, আমি আবার তোমার কাছে আসবো। খুব একজন ভালো লোককে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, ঠিক মতো সে তোমায় দেখবে ও শুনবে।

বৃদ্ধার কাছে গিয়ে জফি আন্তরিক অভিবাদন জানালে। বৃদ্ধার দু'চোখে অশ্রু···বৃদ্ধা বললেন,—এমন গুণী, এতখানি উদার প্রাণ আমি জীবনে দেখিনি। আবার যেন তোমাদের কাছে পাই।

বৃদ্ধার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা বাড়ীর বাইরে এলো। সিরিন বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ করে জানলা দিয়ে চাবিটা বৃদ্ধাকে দিয়ে বল্লে,—ভোরেই একজন মেয়ে আসবে তোমার সেবার জন্য—আমি আর বেয়ারাকে জাগালাম না। তোমাকেই চাবি দিয়ে গেলাম।

দুখানা গরুর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল বাড়ীর দোরে। জিনিষগুলো নিজেরা গাড়ীতে তুললে। চালক নেই, গরুগুলো বাঁধা রয়েছে। সোফি বল্লে,—এবার গরু চালাতে হবে অফিসার-সাহেব। কিন্তু এত যত্ন করে চাষী বানিয়ে তো গাড়োয়ানী চেহারা করা গেল না! মনে হচ্ছে, অশ্ববল্গা ধরানোই উচিত ছিল।

সিরিন—তুমি আর ও-সব কথা মনে করিয়ে দিয়ো না, সোফি। আমি চিন্তিত হচ্ছি গরুগুলোর অবস্থা ভেবে। ওদের হয়তো মোটরের স্পীড বা হাওয়াই-জাহাজের স্পীড হবে মিলিটারী হাতে। বেচারা গোজাতি!

জফি—এ-সময় তোমার পরিহাস ঠিক নয় সিরিন, সামরিক নিয়মে এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

সোফিয়া—পথে-ঘাটে কোর্ট-মার্শালটা বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখন গরুগুলোকে জুতে নিতে হবে, এসো। সামনের গাড়ীতে আমি থাকি কারণ যে-পথ দিয়ে যেতে চাই, সে পথ তোমাদের জানা নেই।

জফি—থো হুকুম! তোমাদের প্রদর্শিত পথই আমি অনুসরণ করবো। চলো এগিয়ে।

গাড়ী চলতে সুরু কল্লে জফি বল্লে,—ফলওয়ালীর পশরা নিয়ে ঘোরার চাইতে এটা অনেক-বেশী রোমান্টিক!

সিরিন—তোমার রূপ-গুণ-বর্ণনার কৌশল বড় সুন্দর! প্রশংসাকে উল্টে স্তুতি-বাদটা ভালই শোনাচ্ছে।

সোফিয়া—তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই সিরিন।

সিরিন—সোফি, তোমার ভরসা দেবার ব্যস্ততা দেখে' চিন্তা আমায় করতেই হলো।

সোফিয়া—চিন্তা পরে করো, এখন গোযান-চালককে হাওয়াই জাহাজের পাইলট হতে হবে, নাহলে ভোরের আগে পাহাড়ের নীচে পৌছুনো যাবে না। ওখানে পৌঁছে তারপর মোটরের ব্যবস্থা।

রাত্রি তিনটার মধ্যেই ওরা পাহাড়ের নীচে এক বস্তিতে পৌছুলো, সেখানে দু'জন লোক অপেক্ষা কচ্ছিল। নীল আলো দেখতেই গাড়ী থামিয়ে সোফিয়া কথা বলতে নামলো। তার একটু পরেই দু-গাড়ীর জিনিষ একখানা গাড়ীতে নিয়ে গরু দুটো বদলী করলে। পথে তার ব্যবস্থা ছিল। মোটরে যাওয়ার চেয়ে গো-যান নিরাপদ।

সোফিয়া বল্লে,—তোমরা ভিতরে বসো মুড়ি দিয়ে। জিনিষগুলো আমি থলে দিয়ে ঢেকে দিই—মনে হবে যেন ফশলে-বোঝাই গাড়ী চলেছে!

সোফিয়া পাকা চালকের মতো গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে। জফি বল্লে,—চাষী লোক এত ধোঁয়া উড়িয়ে যেতে পারে সোফি ?

সোফিয়া—না পারুক, হাতগুলো জমে গেল যে শীতে। ভোরের আগে সৈনিকদের ছাউনিটা আমাদের পার হতেই হবে।

সিরিন—ওখানে খুব কড়া পাহারা আছে—গাড়ী রুখবে নাকি ?

সোফিয়া—না, তা নয়। বিশেষ একটা প্রয়োজনে খুব ভাল-ভাল ফলের ডালা নিয়ে ও-ছাউনিতে আমি অনেকবার গেছি। এখনকার এবেশ দেখলে যদি সন্দেহ করে, তাহলে কিছু প্রশ্ন করতে পারে হয়তো !

জফি—ওখানে কি ওড়না মুড়ে যেতে ? আর অফিসারদের দেখে অস্বস্তি বোধ করতে সোফিয়া ?

সিরিন—সেই যে প্রথম দিন জফির কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চাওনি, ওকে এড়িয়ে চলেছিলে, সে একেবারে কাঁটা হয়ে ওর বুকে আজও খচ-খচ করছে! কারণটা অবশ্য ভাল করেই বুঝেছিল। তবু—

জফি—সে যাই হোক, আমি জানতে চাইছি, ও-ছাউনির খদ্দের কেমন ছিল ?

সোফিয়া,—বেশ ভালই ছিল, লাভও কম করিনি।

সিরিন—কম করোনি ? তার মানে, কতটুকু ?

সোফিয়া—অত্যন্ত কম। হিসাব কষবার প্রয়োজন হয় না—এত কম। কি ধাতুতে যে গড়া ওদের মন, ভাবলে অবাক হই। কখনও ভাবে উচ্ছসিত হয়ে যতটুকু বুঝতে পারে আবেগ-ভরে প্রকাশ করে,—কখনও বা কঠোর বাস্তব অবস্থাটা একেবারে অলঙ্ঘ্য বলে হতাশ হয়ে পড়ে, আবার কখনো দারুণ নির্লিপ্ত উদাসীন। তবে ওদের মধ্যে নিয়মিত কাজ করতে পারলে সঙ্কটের সময় ওদের পথ ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়,—ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে এটুকু বিশ্বাস আমার হয়েছে।

জফি—তুমি কি অনেকের সঙ্গে মিশতে পেরেছ? বেশীর ভাগ মনই তোমার ঐ মন্তব্যের মধ্যে পড়ে?

সেফিয়া—অনেকের সঙ্গে মানে সংখ্যা খুব বেশী কি করে সম্ভব হবে বলো? তবে নানা স্তরে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। ঘনিষ্ঠভাবে অল্প লোকের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু তোমাদের মনগুলো জংধরা ইস্পাতের মতো, ঘষে শাণ দিয়ে নিলে যেমন ধারালো তেমনি চকচকে পালিশ হয়, বুঝলে? আমাদের ইস্তাহার যখন ওদের মধ্যে ছড়ানো হয়, তখন ওরা বেশ মন দিয়ে পড়ে, মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করে মন খুলে আলোচনা করতে পারে না। একজন আর-একজনকে লুকোতে ব্যস্ত হয়। ভয় ওদের খুব বেশী, গুপ্তচরের কূটপ্রথা, এম-পির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আতঙ্ক ওদের জড় করে রাখে। কিন্তু আমরা আশা রাখি। যথেষ্ট সময় এবং বাস্তব অবস্থার ওয়াস্তা।

জফি—যে-সব ইস্তাহার আর পুস্তিকা আমি দেখেছি, সে সব তো ধারাবাহিক ভাবে ওদের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে, তার সার্থকতা কতখানি বুঝতে পারো?

সোফিয়া—সার্থকতা বোঝবার সময় এখনও আসেনি। তা ছাড়া ওদের সংখ্যা-হিসাবে কতটুকুই বা আমরা অগ্রসর হতে পারি? আমাদের সঙ্ঘের ওপর কী অসম্ভব তীক্ষ্ণদৃষ্টি, এবং দমন-নীতির চরম অবস্থার ফলে কারাগারে দেশান্তর-বহিষ্করণে, সঙ্ঘের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়েছে। আমাদের সঙ্ঘ বহুদিন যাবত ভীষণ বাধার মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছে। বে-আইনী সঙ্ঘের যে কত অসুবিধা তা' আর বলে বোঝাতে হবে না। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের কারারুদ্ধ করে রেখেছে,—এই প্রচণ্ড বাধার মধ্যে আমরা দুর্গম পথ ধরে চলেছি—আমাদের চারিদিকে শত্রু।

কথা বলতে বলতে দীর্ঘ-পথ তাড়াতাড়ি কেটে গেল। সোফিয়া বল্লে,—ঐ যে ছাউনি দেখা যাচ্ছে, ওটা বৃটিশের। ওর পরে একটা বড় মাঠ তার পরে আমেরিকানরা জাঁকজমকে সুসজ্জ নগর স্থাপনা করেছে, সেই নগরে সৈন্ত-শিবির হাওয়াই-জাহাজের স্থান, (aerodrome) কারখানা ইত্যাদি হয়েছে।

জফি—আমরা কি ওগুলোর মধ্য দিয়ে যাবো!

সিরিন—কেন, তার মধ্যে তোমায় লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?

জফি—তেমন আকর্ষণ জীবনে একবারই হয়েছে। জীবনের সমস্ত সঙ্কটকে সামনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কোন্ সময়, সিরিন?

সোফিয়া—জফি, তার চাইতেও দুরন্ত মহাসাগরের সম্মুখীন হতে হয় যদি?

জফি—তাতেও ঝাঁপ দেবার শক্তি অন্তরের দৃঢ়তা দিয়ে অর্জ্জন করেছি, ভাবকে যুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে এক করে' নিয়েছি।

আনন্দের আতিশয্যে সিরিন জফির হাতখানা চেপে ধরলে। যা বলতে চায়, তা ঐ অভিব্যক্তির মাঝ দিয়ে বলা হয়ে গেল।

সোফিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। জফি বল্লে,—সোফিয়া আমেরিকানদের মধ্যে যাওনি তোমার আদর্শ-প্রচার আর কর্ম্মপন্থা বিস্তার করতে?

সোফিয়া—আমেরিকানদের সবজান্তা ভাব। ওদের বড় বড় পণ্ডিত থেকে সাধারণ অক্ষর-জ্ঞানীরা পর্য্যন্ত সব সমান। ওদের ধারণা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আদর্শ সর্ব্ববিধ নীতির যা সারাংশ, ওরাই তা শুধু আয়ত্ত করেছে। শিক্ষার গর্ব্ব, আভিজাত্যের দম্ভ এবং প্রতিদ্বন্দিতার মনোবৃত্তি এত প্রবল যে ওদের কাছে উপস্থিত কোন আশা নেই,—বড় বড় কথা বলতে ওরা ওস্তাদ,—তবুও যাদের সঙ্গে মিশেছি,

সুযোগ ছাড়িনি। ওরা তর্ক করে ওদের প্রভুদের গ্রামোফোনের রেকর্ড হয়ে। ওদের কর্ণধার গণতন্ত্রের প্রতীক বলে পরিচিত—বড় বড় কথায় ভুলিয়ে রাখবার কৌশল ওদের ভালই জানা আছে। চতুঃস্বাধীনতা, বিশ্ব-শান্তি, মানব-কল্যাণ, এ-সব কথা ওদের একচেটিয়া। রাজনীতিবিদ্, লেখক, সাংবাদিক সকলেই তথাকথিত গণতন্ত্র-নীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। ওদের দেশের ধন-কুবেরদের সঙ্গে সাধারণ লোক আর সর্ব্বহারা শ্রেণীর পার্থক্য এত গভীর যে তার আর সীমা-পরিসীমা নেই। সকলেই সে-কথা জানে,—রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বদলাবার কোন প্রয়োজনও নেই। ওদেশ থেকে গণতন্ত্রের প্রেম বহন করে লেখক টুরিষ্ট সাংবাদিকের দল দেশ-বিদেশে তাদের থলি উজাড় করে বেড়ায়। মোটা-মোটা পুঁথি লিখে তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করেন। এ-সব কথা নিয়ে আমি ওদের সঙ্গে তর্ক করি,—ওরা বোঝাবার চেষ্টা করে যে ওদের মধ্যে ফাঁকি নেই। আমি একজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান সামরিক অফিসারকে বলেছিলাম "হিটলার যত অপরাধ করেছে, সে তার আর্য্য-বংশের মর্য্যাদার মোহে। আর তোমরা আমেরিকানরা যে তার চেয়ে হাজার-গুণ দম্ভ করো নিজেদের আমেরিকান বলে!" ভদ্রলোক প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন—তারপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলাম, প্রতি-পদে মনে করিয়ে দিলাম। শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশ্যেই তিনি স্বীকার কল্লেন,—হ্যাঁ, তিনি তা বোঝেন।

জফি—ওদের অহমিকা দম্ভ আমরা খুব ভাল করে বুঝি—আর্ম্মির মধ্যে তো সেটা অত্যন্ত প্রকট। ছুঁৎ-মার্গের মতো তারা অন্য দেশ বা জাতির জিনিষ পরিত্যাগ করে,—তার মূলে অবশ্য ওদের অর্থনীতি! কিন্তু সাধারণ লোক সে-কথা অত তলিয়ে ভাবে না আর ব্যবহারিক জীবনে তা চলেও না! তার প্রকাশ হয় ঘৃণা ও অবহেলার মধ্য দিয়ে—

গণতন্ত্রের বুলি সেখানে আভিজাত্য-তন্ত্রের রূপে প্রকাশ পায়। ওদের বেশভূষা আহার-বিহার ব্যবহার সব-কিছুর মধ্যে প্রকাশ পায় ওদের দম্ভ।

সোফিয়া—তুমি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ভালই বুঝেছ, কিন্তু আমেরিকানদের ওপর বিভিন্ন দেশের নির্বোধ লোকগুলোর দারুণ মোহ জন্মে গেছে,—তার কারণ সাধারণ লোক এবং সুবিধাবাদীরা কোন কিছুই তলিযে বুঝতে চায় না। বাইরের ফাঁকা বুলির চাকচিক্য একটু চমকপ্রদ হলেই ঘাবড়ে যায,—মোহ জন্মায় তাদের।

জফি—যুদ্ধের সময় ও:দর বাহ্যাড়ম্বরে এটা আরও বেড়েছে। জীব:ন কোন মহৎ আদর্শ তো নেই-ই, উপরন্তু ভাড়াটিয়া ভলান্টিযার হয়ে ওদের দেশেব হাজার-হাজার যুবক ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছে, বিভিন্ন দেশে তাদের যাবতীয় ব্যয়-ভার আমেরিকান্ গভর্ণমেন্টের। থাকবার ব্যবস্থা ভাল ভাবেই পাবে—এবং প্রতিবারেই যখন যাবে বম্বিং করতে—, তার দরুণ টাকা পাবে পাঁচশো .করে'। যে-দেশের যুবকরা পয়সার জন্য এই ভাবে নরহত্যা এবং সভ্যতা ধ্বংশ করতে পারে, তারা জগতের কাছে সভ্য-জাতি বলে বুক ফুলিয়ে চলছে! আমেরিকা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম। আমার কজন কমরেড্ আমেরিকায় ক'বছর কাটিযে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন, যুদ্ধের সময় তা প্রত্যক্ষ দেখছি।

কথা শেষ হবার আগেই তারা ছাউনি পেরিয়ে পথে মোড় ফিরলো—সেই পথ ধরে দু মাইল গিয়ে ছোট একটা গ্রাম। গ্রামের সামনে বড় মাঠ, সেখানে কজন লোক দাঁড়িয়ে। সোফিয়া একখানা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো। গাড়ীখানা এগিয়ে চললো লোকগুলোর দিকে। ওদের মধ্য থেকে দু'জন লোক গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে

একটা লাল রুমাল পকেট থেকে বার করে আবার পকেটে রাখলে। সোফিয়া গাড়ী নিয়ে ডান দিকে মোড় ঘোরালো, তখন ঐ দুজন লোক গাড়ীর পিছনে আসতে লাগলো লোকচক্ষুর আড়ালে এসে তারা গাড়ীতে উঠে পড়লো। তাদের একজনের উপর গাড়ী চালাবার ভার দিয়ে সোফিয়া গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলো। সকলেই নীরব।

তাড়াতাড়ি খানিকটা পথ গিয়ে এক চাষীর বাড়ীর সামনে গাড়ীখানা রাখলে। গরুগুলো খুলে দিয়ে চালক কুটীরের মধ্যে গেল। একটু পরে ফিরে এসে ওদের নামিয়ে নিয়ে গেল বাড়ীর মধ্যে।

দীন চাষীর বাড়ী। একটি মেয়ে মাটীর কলসীতে মুখ ধোবার জল নিয়ে এলো। মুখ-হাত ধুয়ে মাটীর দাওয়ায় বসলো। একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি। মেয়েটির পরণে জীর্ণ বস্ত্র, দু'চার জায়গায় তালি দেওয়া। ঘরের চালের অবস্থাও বস্ত্রের মত জীর্ণ। দু'খানি ঘর পাশাপাশি, মাটীর দেওয়াল, তাও খসে পড়বার অবস্থা। উঠানে একটু চালা বাঁধা। তার একধারে রান্না করবার জায়গা আর-একধারে গরু আর ছাগল আছে। চাষী-মহিলা এদের কিছু শুকনো ফল আর রুটি এনে দিল। সারা রাত্রির ক্লান্তি এখন বেশ অনুভব হচ্ছিল। খাবারটুকু বোধ হয় বেচারাকে অতি কষ্টে জোগাড় করে অতিথি সেবা করতে হয়েছে। সে অত্যন্ত সঙ্কোচে বল্লে,—আমার ঘরে তো আর কিছুই নেই।

সোফিয়া তার পিঠে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে,—যথেষ্ট হয়েছে! এর বেশী আমরা খেতে পারবো না। তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে খাবে। চাষী-মহিলা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ওদের সঙ্গে খেতে বসলো। কিন্তু তাকে জড়সড় বা আড়ষ্ট মনে হলো না।

সে যে এ-ধরণের লোকের পরিচিত তা তার ব্যবহারে এবং আচরণে বোঝা গেল। যে দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁরা বল্লেন,—আমরা এখন যাচ্ছি, তোমরা সারাদিন এখানে বিশ্রাম করো, সন্ধ্যার সময় মোটর নিয়ে আসবো। জিনিষপত্রগুলো গাড়ীটাতে বস্তা ঢাকা দেওয়া থাক। গরুর ব্যবস্থা আর করতে হবে না। এদেরই গরু।

সিরিন তখন চাষী-মেয়েটির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো। কুটীরের অবস্থা দেখে সবই বুঝে নিয়েছিল তবু জফিকে শোনাবার ইচ্ছা। সিরিন প্রশ্ন কল্লে,—তোমার সংসারে কজন লোক?

চাষী-মহিলা—আমার দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, স্বামী এবং তার ভাই।

সিরিন—তোমার নিজের জমি আছে?

চাষী-মহিলা কপালে হাত দিলে, বল্লে,—জমি? সে-কথা আমাদের স্বপ্ন! অন্তের কাছে জমির কাজ করে আমার স্বামী এবং তার ভাই। আমার এক ছেলে সহরে গেছে কাজ করতে, আর এক ছেলে পল্টনে যোগ দিয়েছে। লড়াই করে না, লড়াইয়ের মজুরের কাজ করে। মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়। কিছুদিন থেকে তার আর কোন খবর পাচ্ছি না। জানিনা, ভগবান তার কি করলেন!

সিরিন বল্লে,—আর একটি ছেলে কি করে?

চাষী-মহিলা—তা বলতে পারি না, কোন কারখানায় কাজ করে। দু'তিন মাসের পর একবার বাড়ীতে আসে—একদিন থেকেই আবার চলে যায়। সে বিয়ে করেছে। বৌও কাজ করে সেই কারখানায়।

সিরিন—মেয়ে কোথায়?

চাষী-মহিলা—মেয়ে গেছে আমার স্বামী আর দেওরের খাবার নিয়ে। ভোর বেলা তারা মাঠে চলে যায়। বেলা নটার সময় তাদের রুটি

তৈরী করে পাঠিয়ে দিই। সারাদিন ওতেই চলে, সন্ধ্যায় ফিরে এলে সবাই একসঙ্গে খাই। সব-দিন সকলের পেট ভরে খাওয়া জোটে না। দেওরের ছোট ছোট তিনটি ছেলে। তাদের মা নেই। এতগুলি প্রাণীর দিন চালানো এই লড়াইয়ের সময় বড় কষ্টকর হয়েছে। তাইতো ভাবি, কেমন করে দুঃখী লোকের দিন কাটবে! আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে হাহাকার—কি কষ্টে যে সব দিন কাটছে! এই লড়াইই সর্ব্বনাশ করলে মানুষের! বোমা পড়ে গ্রামের কত মানুষ যে মরে গেছে,—কি দুষমন এই লড়াই! বলে মহিলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে।

সিরিন বল্লে,—তোমার আপনার লোক কেউ বোমা পড়ে জখম হয়েছে?

চাষী-মহিলা মাথা চাপড়ে বল্লে,—আমার? দু-দুটো জোয়ান ভাই, বুড়ো মা আর আমার বোনগুলো সব মরেছে গো, এই বোমা পড়ে। বোনাই লড়াইয়ে গিয়ে মরেছে। আর তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে আমার মার কাছেই ছিল! একেবারে নির্বংশ হয়েছে। এই বলে মহিলা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

সিরিন ভাবলো, সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু কি বলে দেবে? যা বলবার, এ অবস্থায় তা বলা ঠিক হবে না। সিরিন বল্লে,—এত দুঃখ এত যন্ত্রণা তোমাদের কেমন করে' যে ঘুচবে! চাষী-মহিলা বল্লে,—আমার ছেলে সহরের কারখানায় কাজ করে, অনেক-কিছুই সে জানে। অনেক ভাল জ্ঞানী লোক নাকি ঠিক কচ্ছেন, মানুষের এ সব কষ্ট আর থাকবে না, লড়াই আর হবে না। মানুষকে যারা এত কষ্ট দেয়, লড়াই করায়, তাদের ক্ষমতা নাকি চলে যাবে। দুনিয়ার সব কিছু তৈরী করছে অথচ তারা নিজেরা কিছু পাচ্ছে না,—তাদের ঠকিয়ে ভয় দেখিয়ে বড়

লোকেরা সর্ব্বস্ব নিয়ে নিচ্ছে—এ আর তারা করতে পারবে না, এই রকম নাকি সব ব্যবস্থা হচ্ছে,—আমার ছেলে বলে।

সিরিনের আগ্রহ হলো। শুনতে চাইলে ছেলে আর কি বলে। চাষী মহিলা বল্লে,—ছেলে মাঝে মাঝে গাঁয়ের সব লোকদের সঙ্গে পঞ্চায়েত করে, কথা কয়। বৌও অনেক কিছু বলে। সহরে থাকে, সে কত বোঝে। আমার মেয়েকে এইবারে নিয়ে যাবে সহরে পড়াতে। পয়সা খরচ হবে না, ভালো লোকেরা সব ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরাই ওদের পড়াবেন।

সিরিন—তোমাদের গ্রামের লোকেরা তোমার ছেলের কথা শোনে?

চাষী-মহিলা—হ্যাঁ, ছেলেকে সবাই খাতির করে। কত ভাল ভাল লোককে সে নিয়ে আসে ঐ গাঁয়ের লোকদের বুঝিয়ে বলবার জন্য। গাঁয়ের লোকের দুঃখ হলে তাঁরা এসে কত দেখাশুনা করেন। যাদের ছেলে-পিলে লড়াইয়ে গিয়ে মরেছে তাদের ডেকে কত কথা বলে বোঝান। আমার স্বামী দেওর—তারাও যায় সে-সব কথা শুনতে। আমিও ক'বার গিয়ে শুনে এসেছি,—বেশ ভাল কথা তাঁরা বলেন।

তিনটি ছোট ছেলে আর একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এসে আঙ্গিনায় ঢুকলো, হাতে গামছায় বাঁধা কখানা বাসন। নামিয়ে দাওয়ার কাছে এগিয়ে এলো। চাষী-মহিলা বল্লে.—এই আমার মেয়ে, আর ঐ ছেলে তিনটি আমারই। ওদের মা নেই, আমিই ওদের মানুষ কচ্ছি।

বালিকাটি সরল দৃষ্টিতে সিরিনদের দিকে চেয়ে রইল কিন্তু আশ্চর্য্য হলো না, বল্লে,—এঁরা বুঝি মা সহর থেকে এসেছেন মিটিং করতে? চাষী-মহিলা বল্লে,—হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের গাঁয়ে নয়, অন্য গাঁয়ে যাবেন। পথে ওঁদের গাড়ী ভেঙ্গে গেছে, তাই এখানে নেমেছেন।

সিরিন আঙ্গিনায় নেমে এসে ছোট শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে আর দু'জনকে ডেকে নিয়ে দাওয়ায় বসলো। ওরা ধূলো-মাখা গায়ে এসে বসে পড়লো জফিদের সঙ্গে। বালিকাটি গেল হাত-মুখ ধুতে। ছেলে তিনটির বেশ অত্যন্ত মলিন ছিন্ন, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে জীর্ণ শরীর। সিরিন জিজ্ঞাসা কল্লে,—কি খেয়েছ তোমরা? ওরা বল্লে,—রুটি। চাষী মহিলা বল্লে,— গরুর যখন দুধ হয়, তখন এদের শরীর একটু সারে, এখন গরুর দুধ নেই, ছাগল তিনটের যা দুধ হয়, তাই একটু করে দিই। গাঁয়ে কোন খাবার জিনিষ থাকতে পায় না, সব চলে যায় মিলিটারীদের জন্য। পয়সা বেশী পাবার জন্য দুধ, ঘি, ফল, ডিম, মুরগী, ভেড়া সব চলে যাচ্ছে, গ্রাম খাঁ-খাঁ করছে। খাবার-পরবার জিনিষ এতদিন বহু কষ্টে যা মানুষ কিনে কোন রকমে দিন চালিয়েছে, আজ তাও পাবার উপায় নেই।

সিরিন প্রশ্ন কল্লে,—তোমার ছেলে সহরের কথা কি বলে,—সেখানে ওদের কষ্ট কম?

চাষী-মহিলা—সহরে গরীবের কষ্ট মোটেই কম নয়, আগের চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু বড়লোকরা যুদ্ধের সময় খুব বেশী লাভ কচ্ছে, করে আরও বড় লোক হচ্ছে। আমার ছেলে বলে, ওদের আর বেশীদিন এ-রকম অন্যায় করে গরীবকে মেরে আরাম করা চলবে না, সে সব ব্যবস্থা নাকি ভাল করে হচ্ছে। সে বলে, গরীবদের বড় বড় কথা বলে, বড়লোকেরা যে ঠকাতো, আজ তা অনেকে বুঝতে পেরেছে।

মেয়েটি মুখ ধুয়ে এলো, মা তাকে বল্লে,—এঁদের জন্য রান্না করবো। উনুনটা ধরাও।

সিরিন বল্লে,—আমাদের জন্য ব্যস্ত হয়োনা। সামান্য-কিছু খাবার হলে আমাদের চলবে। গ্রামে যদি খাবার কিছু কিনতে পাওয়া যায়, আনিয়ে নাও। রান্না করতে তোমার কষ্ট হবে, তার দরকার নেই। এত কাজ

তার ওপর আবার আমাদের জন্ম ঝঞ্ঝাট বাড়িও না। বলে প্রৌঢ়াকে কুড়িটি টাকা দিলে। টাকা নিতে সে কোন মতে রাজী নয়, বল্লে,—আমার ঘরে জিনিষ যা আছে, তাতে তোমাদের সামান্য কিছু আমি খাওয়াতে পারবো। তোমরা আমার অতিথি, টাকা নিয়ে তোমাদের সেবা করবো না।

সিরিন বল্লে,—আমরা খাবার জন্য তোমায় টাকা দিচ্ছি না, বাচ্ছাদের কিছু জামা-কাপড় কিনে দিও আর ওদের কিছু মিষ্টি খাইও। বাচ্ছাদের জন্য টাকা দিচ্ছি। না নিলে মনে কষ্ট পাবো।

চাষী-মহিলা বল্লে,—এখন থাক, আমার স্বামী ফিরে এলে দিও।

সিরিন—না, এ টাকা তুমিই রাখো,—তোমার ছেলেমেয়ের জন্য দিচ্ছি। বলে মহিলার হাতে নোট দিলে।

চাষী-মহিলা রান্না করতে গেল, মেয়েটি মায়ের কথায় কোথায় ঘুরে এলো—একটা থলিতে সামান্য কিছু সব্‌জী নিয়ে।

চাষী-মহিলাটি এদের স্নানের জন্য জল এনে দিলে। স্নান সেরে তিন-জনে বসেছে দাওয়ায়। গ্রামের দরিদ্র চাষীর একখানি বাড়ী দেখলেই সারা গ্রামটিকে বোঝা যায়। চির-দরিদ্র চাষী-মজুর যুদ্ধের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে আজ কতখানি নির্য্যাতন ভোগ কচ্ছে! পৃথিবীজোড়া নির্ম্মম ধ্বংশের মধ্যে এই শ্রেণীর উপরেই অত্যাচার সর্ব্ব-রকমে বেড়ে চলেছে। তাদের বুকের উপর ধ্বংশের তাণ্ডব নৃত্য কি ভাবে চলেছে—আজ চোখ বুজে থাকলেও মানুষের তা অজানা নেই! যুদ্ধে যে সব সৈন্য এবং সমর শ্রমিকরা বিকট মৃত্যুকে বরণ কচ্ছে, তারা এই শ্রেণীর লোক—নিঃস্ব সর্ব্বহারা।

দুপুর বেলা চাষী-মহিলার রান্না শেষ হলে সকলে একসঙ্গে খেতে বসলো। তার পর আবার ওদের দুঃখময় জীবন-প্রসঙ্গ।

সোফিয়া বল্লে,—সিরিন, একটু বিশ্রাম করো, আজও সারারাত কাটাতে হবে গাড়ীতে। সিরিন বল্লে,—ক্লান্ত তো হইনি, আবার কত দিনের মতো এদের সঙ্গ-ছাড়া হয়ে থাকবো, কে বলতে পারে! সোফিয়া বল্লে,—আচ্ছা, তুমি কথা বলো, আমরা একটু বিশ্রাম করি।

সন্ধ্যার একটু পরে মোটর নিয়ে এলো এক কররেড্। চাষী-মহিলার মেয়েটি কতকগুলো সুন্দর ফুল তোড়া বেঁধে এনে ওদের হাতে দিলে। অল্প সময়েই মিষ্টি কথায় সিরিন তার কচি মনখানি জয় করেছে। সিরিন বল্লে,—আমাদের কথা মনে থাকবে তো? আবার কোনোদিন যদি ছাখো, চিনতে পারবে?

মাথা নেড়ে মেয়েটি বল্লে,— পারবো।

সোফিয়া বল্লে,—এই পোষাকে না দেখলে বোধ হয় পারবে না।

গৃহস্বামী এবং তার ভাই মাঠ থেকে ফেরবার পর এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সোফিয়া বল্লে,—তোমার ছেলে যে-সহরে থাকে, আমরাও সেই সহরে থাকি,—সেখানে কাজ করি। অনেক দূরে যেতে হবে, মাঝ-পথে তাই গাড়ী বদলাতে এসেছিলাম। আবার তোমাদের কাছে আসবো।

বিদায় নিয়ে তিনজনে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লো।

বনের মাঝখান দিয়ে পথ—গ্রাম আছে দূরে-দূরে—মাঝখানে বড় বড় মাঠে অস্থায়ী নগর গড়ে উঠেছে। মিলিটারী ব্যারাক নির্ম্মাণের জন্য বনের বুকও আধুনিক যন্ত্র-সজ্জিত। বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল নগর দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। যন্ত্র-সভ্যতা কি ভেঙ্গে, কি গড়েছে! সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরিবর্ত্তে বিকট ধ্বংশের প্রয়োজনে এই-সব প্রাসাদ কারখানা,

যান-বাহন, অভাবনীয় যন্ত্রাগার, অস্ত্রাগার, ধ্বংশ-কারী মানুষের আবাসের এত জাঁক-জমক! সিরিন বল্লে,—সত্যি, মানুষ আজ পশু-বল আর পশুবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত। পৃথিবীর কোথাও সে-পরিচয় আর লুকানো নেই। জেলে বসে আমি সব খবরই পেতাম, এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি নিয়ে যেতো বহু-রকমের অপরাধীরা। যে ধরণের অপরাধ না করলে এই বিকৃত সমাজ চলতে পারেনা, তেমন সব ' কাজ করে তারা সাজা পেতো। এতখানি অবিচার, এত-বড় জালিয়াতি করে চলেছে মানুষ ক্ষমতার দম্ভে, তবু তো—

বাধা দিয়ে সোফিয়া বললে,—শুনবে সিরিন? কণামাত্র বাইরের রূপ দেখছো—সহরের রাজপথে যে সময় গ্রামের দুর্ভিক্ষ করাল-মূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হল, . দুর্ভিক্ষের চরম-সময়ের কথা বলছি—যুদ্ধের জন্য এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবর্ণনীয় মৃত্যুর রূপ নিয়ে এলে গ্রামে ঘাস খেযে পেট ভরিয়েছে, এমন সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরণাপন্ন হযে যেদিন সহরে এসেছে পেটের জ্বালা নিবারণ করতে, সেখানে এসে পেটের জ্বালায় তারা অমানুষিক কাজ করেছে। মা সন্তানকে পেটের জ্বালায় বিক্রী করেছে,—অর্দ্ধমৃত বুভুক্ষু সন্তানকে পথে ফেলে রেখে মা গিয়েছে খাদ্যের সন্ধানে—পেটের জ্বালায় গণিকা-লয়ে মেয়ে বিক্রী করে অল্পদিনের ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়ে আবার মৃত্যুকেই বরণ করেছে। পেটের জ্বালায় নারী দেহ বিক্রী করেছে, সেই কঙ্কাল সার দেহকে ভোগ করতেও পুরুষ এতটুকু দ্বিধা করেনি! পথের ফুটপাতে মৃতদেহের স্তূপ, চারিদিকে হাড়ের ওপর শুধু চামড়া ঢাকা দেওয়া মানুষগুলোকে শ্মশানের প্রেতমূর্ত্তি বলে মনে হচ্ছে সেইরকম দিনে গাড়ীর পর গাড়ী বোঝাই খাদ্য-বস্ত্র চলেছে মিলিটারীর জন্য—পেটের জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞানহীন সেই সব ক্ষুধার্ত্ত লোকদের সামনে

দিয়ে চলেছে মিলিটারীর জন্ত দেশ-বিদেশে খাত্ত—চালান যাচ্ছে মিলিটারীর জন্ত এই প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জোগান;—পরোক্ষে যারা যুদ্ধের মরসুমে বাজারে টাকা লুঠ করবার জন্ত ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে, তারা গুদাম বোঝাই করে খাত্তদ্রব্য জমা করে রেখেছে, চড়া দামে বিক্রী করে লাভ করবে বলে এবং লাভ করে ঐ সব বুভুক্ষু নর-নারীর মৃত দেহের স্তূপের ওপর দিয়ে বড় বড় মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। তাদের জামা কাপড় গহনা আর সাজের কি ঘটা! সহরের সিনেমাগুলি আগের চেয়ে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে। নর নারী নানা ভাবের বেশভূষায় সেজে, প্রেমিকের হাত ধরে বা পাশে বসে ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মাঝখান দিয়ে চলেছে প্রমোদ-শালায়। সেই প্রমোদ-ভবনের পাশেই অনাহারে মৃত দেহের স্তূপ। বিলাস এবং আভিজাত্যের দ্রব্য-সামগ্রীতে দোকান-বাজার পরিপূর্ণ। বড় বড় হোটেলে পৃথিবীর সেরা আহার্য্যের মেনু! নাচ-গান, নাট্যশালায় চিত্রশালায় ভীড়! এ সব দেখে কি মনে হয় জানো? মনে হয়, যা কিছু কচ্ছি আমরা, সবই অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সহর, গ্রাম, রাজপথ সর্ব্বত্রই অগণিত মানুষের বুকফাটা হাহাকার, আর মুষ্টিমেয় সংখ্যার চরম ভোগ-বিলাসের উন্মত্ততা। ঐ সব মনুষ্যত্ব-হীন বর্ব্বররা আবার শিক্ষিত বলে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে! বড় গলায় সমাজ-হিতের কথা বলে!

জকি বল্লে,—সোফিয়া, আমিও দেখেছি প্রত্যক্ষে ঐ সব দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারী! মৃত স্তূপের ওপর দিয়ে আমাদের মিলিটারী লরী বোঝাই করে সাহায্য ভাণ্ডার নিয়ে ওদের সাহায্য করতে গিয়েছি গ্রামে গ্রামে! সে কি করুণ দৃশ্য! সে মর্ম্মভেদী হাহাকারের মাঝে অন্ন-বস্ত্র ঔষধ বিতরণ, আমার কি মনে হতো, জানো? মনে হতো, এরা কেন একবার বলে না ক্ষুধায় আমরা খাত্ত চাই,—পরণের বস্ত্র চাই,—আমাদের পেতেই হবে তা!

সে কথা তাদের মনে নেই,—মরবার জন্তই যেন তারা জন্মেছে! কারও ওপর অনুযোগ পর্য্যন্ত তাদের মুখে নেই! আমরা যে তাদের জন্ত দান-সত্র খুলেছিলাম, তাতে তারা কৃতার্থ! তারা কেন বুঝছিল না যে তাদেরই জীবনের মূল্যে করুণার অভিনয় দেখিয়ে জগতের কাছে সুনাম কেনবার মতলব সে আমাদের? ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের অবস্থা কী বোঝায়? বোঝায় যে এরা মানুষ নয়, এদের বেঁচে থাকার শক্তি অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে! নাহলে কেন এরা লুঠ করে না? কেন কেড়ে নিয়ে পেট ভরায় না? বেঁচে থাকার জন্ত সংগ্রাম করাই জীবনের নিয়ম—সে নিয়ম এরা ভুলে গেছে। কাজেই এরা তো মরে আছে, তাই নূতন করে আর মরবে কি? এদের জীবনী-শক্তি সংগ্রাম-কারিণী শক্তি ধ্বংশ হয়ে গেছে! ধ্বংশ করেছে দেশের ধর্ম্মবেত্তারা, যারা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধ করতে এদের শিখিয়েছে, পরের জিনিষ চুরি করলে পরকালে নরক ভোগ করবে, ভগবান রাগ করবে! নীচ আর স্বার্থপর মানুষ নিজেদের ভোগ-লালসা পূর্ণ করবার জন্তই যে ভগবান আর ধর্ম্ম তৈরী করেছে, এই সব লাঞ্ছিত সর্ব্বহারারা তা বোঝে না! ভগবান আর ধর্ম্ম যতদিন আছে, ততদিন মানুষ কখনো মানুষের পর্য্যায়ে উঠবে না। সহস্র সহস্র দেশবাসী তো বেঁচে আছে—দেশে বড় বড় রাজনীতিবিদরা এই দুর্ভিক্ষের আসল কারণ সংবাদ-পত্রে, পুস্তিকায় লিখে তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের কাছে নিজেদের বিদ্যা আর কৃতিত্ব দেখাতে ত্রুটি কচ্ছেনা। আমাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও করুণা বিতরণের ভাণ করবার জন্ত সাহায্য-ভাণ্ডার খুলেছিল। কই তারা তো কেউ একবার আসল কথা বলে বোঝালে না, এই দুর্ভিক্ষের কারণ কি? এর জন্ত দায়ী কে? সংবাদ-পত্রে বা বড় বড় হলে দাঁড়িয়ে বিদ্যাবাগীশদের কাছে কারণ বাতলে জ্ঞানের পরিচয় দিলে বা সাম্রাজ্য-বাদী ধনতন্ত্র-

বাদীর নীতি বিশ্লেষণ করলে তো আর মূল সংশোধন হবে না। একমাত্র ঐ মরণোন্মুখ নির্য্যাতিতদের সংগ্রাম-কারিণী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের নিজস্ব সম্পদের অধিকার বুঝিয়ে দিলেই এই দারুণ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সংবাদপত্রে বা পুস্তিকায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করে দুর্বৃত্ততা নিবারণ হবে না, তা তারা জানে।

সিরিন—রুফি, তুমি যে গোড়াতেই ভুল করলে। যাদের বিদ্যাবত্তা শিক্ষা-বত্তার কথা বলছো—সত্যকার সমস্যা-সমাধানে তারা আসবে কেন? তাতে যে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে। তারা যদি আজ ঐ বুভুক্ষু জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের দাবী নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে "ক্ষুধার্ত্ত যাত্রা" (Hunger march) ক'রে যদি তাদের সচেতন করে, তাহলে তারা যে বিপ্লব করবে,—তখন ঐ সব বড় কথা-বলা দলের লোকদের পেশা থাকবে কোথায়? কলমের বাহাদুরিও প্রকাশ পাবে না। সদয় হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে চাঁদা তুলে দু'মুঠো খাদ্য বিতরণ করে খবরের কাগজে "উদার" "দয়াশীল" "দানবীর" এ-সব পদবী পেয়ে ভাল-ভাবে শোষণ করবার যে পথ করছে, তাতে বজ্রাঘাত হবে, এ-সব না বুঝলে তারা কি খাদ্য বা বস্ত্র বিতরণ করতে যেতো? তারা জানে এই একটি সুযোগ, যার ফলে জনগণকে আরও অনেক দিন ভুলিয়ে রেখে তাদের কাছে করুণার অবতার বলে পরিচয় দিয়ে লুণ্ঠন এবং শোষণ ভাল করেই করা যাবে। আর ঐ সব চিরতিমিরান্ধ জনগণের কথা বলছো তুমি,—ওদের মধ্যে কি আর কণামাত্র সংগ্রাম-কারিণী শক্তি রেখেছে? যুগ-যুগ দাসত্বের ফলে সে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে! শোষণের ফলে ওদেরও সব শেষ করে দিয়েছে! অনাহারে চরম-দারিদ্র্যে তিলে তিলে মরবে তবু ঘরের পাশে জমিদারের গোলায় যে খাদ্যের পাহাড় সঞ্চিত, তার একটি কণা এরা লুঠ করবে না। তারাই উৎপন্ন করে

বহন করে সঞ্চয় করে রেখে এসেছে এই ধান্যের স্তূপ বুকের রক্ত দিয়ে, সে সব রইল রাক্ষসদের ভোগের জন্য, অনাচারের জন্য। নিজেদেরই স্বোপার্জ্জিত সম্পদ নিলে এরা ভাবে, অপহরণ করা হবে, লুঠ করা হবে! ভগবানের ভয় দেখানো আছে, ভগবানের ন্যায় বিচারে নরক-দণ্ডের কথা বলা আছে, তাই ন্যায্য অধিকার নেওয়ার পাপটুকুও তারা কিছুতে করবে না, দুঃখ-নির্য্যাতনকে গত জন্মের কর্ম্মফল বলে শিরোধার্য্য করবে! এ-সব শেখাবার জন্য ধর্ম্ম, ভগবান আর ভগবানের দূত ধর্ম্ম-বেত্তারা স্বার্থপর নীচ সুবিধা-বাদীদের বেতন-ভোগী রূপে সর্ব্বত্র চৌর্য্য-বৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। সাম্রাজ্য-বাদী ধনতন্ত্রবাদীদের কূটজালে পৃথিবী ঘেরা আর অগণিত জনগণ সেই জালে ঢাকা। পাশবিক সমর-শক্তির দাপটে তারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত।

মোটর গাড়ীর গতিবেগ এদের আলোচনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল কি না জানি না, চালক বল্লে,—এখন তোমাদের চুপচাপ থাকায় প্রয়োজন, মিলের সীমানায় এসে পৌঁচেছি।

পাহাড়ের নীচে তেলের খনি। তারই কাছে একটি লোহার কারখানা। এই কারখানার বড় ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে এঁরা অতিথি হলেন।

ডাক্তার সাহেব সোফিয়ার আত্মীয়। ভোর রাত্রে এসে সোফিয়া ডাক্তার সাহেবের গৃহিণী শেরিয়াকে জাগালে। এতগুলি অতিথির অভ্যর্থনার জন্য সে বোধ হয় একটুও প্রস্তুত ছিল না। ঘুমন্ত চোখে উঠে এসে বল্লে,—সোফি, তোমার সবই অদ্ভুত! আমায় জানাতে হয় তো ভদ্রলোকদের নিয়ে আসবে! আমি জানতাম গভীর রাত্রে তোমার নিশাচর বৃত্তি!

সোফিয়া বল্লে,—আরে সে সময় কোথায়? ডাক্তার সাহেব সব জানেন। অবশ্য এই মাত্র জেনেছেন।

শেরিয়া—তিনি তো সবই করলেন। দাঁড়াও, ঘুমের পোষাক বদলে ওঁদের অভ্যর্থনা করি।

সোফিয়া—অভ্যর্থনা থাক, আগে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। ওঁরা বিশ্রাম করতে পেলেই খুব অভ্যর্থিত হবেন।

শেরিয়া শুনলে না, ব্যস্ত হয়ে সিরিন, জফি এবং চালককে স্বাগত করে বসতে দিয়ে তাড়াতাড়ি গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে। ডাক্তার সাহেব ইতিমধ্যে গাড়ী থেকে জিনিষ-পত্র ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শেরিয়া কফি তৈরী করে আনলে। জফি এবং সিরিনের সঙ্গে সোফিয়া গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলে—আমার বোন শেরিয়া আর তার ফিয়াসেঁ ডাক্তার! ডাক্তার সাহেবের আপ্যায়ন অভ্যর্থনা আড়ম্বরহীন, সহজ ভদ্রতায় সৌজন্যে পূর্ণ। সামান্য ব্যবহারেই বোঝা গেল, সেখানে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই।

শেরিয়া সোফিয়াকে বল্লে,—আমি এঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, পাশের ঘরে এসে তুমি জিনিষগুলো দেখে নাও। পোষাক তো বদলাতে হবে।

সোফিয়া বল্লে,—তোমার বাড়ীতে এখন অতিথি-অভ্যাগত কি রকম, সেই বুঝে আমাদের পরিচয় আর পোষাক ঠিক করো।

শেরিয়া—উপস্থিত কেউ নেই,—শীঘ্র কারও আসবার কথা ও নেই। তবে সে সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নেবো। ওঁরা এখানে থাকতে পারেন। আমার দাস-দাসী কেউ এদেশী নয়। এখানকার লোকজনের সঙ্গে আমরা মিশি খুব কম। ক্লাবে যেটুকু আলাপ,—সবাই জানে, আমরা সরকারী লোক বলে মিশতে চাই না! এ বদনামটি এখন কাজে লাগছে।

সোফিয়া—হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেবের যে ষ্টাইল, আমিই থাকতে যাই।

শেরিয়া—ঘাবড়ানোর ভাণ করো বটে! তা যাক, এখন তোমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলে অতিথিদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শেরিয়া সব ব্যবস্থা করে ওদের বিশ্রাম করতে বললে।

জফি আর সিরিনের জন্য শয্যা প্রস্তুত করে শেরিয়া বল্লে—সোফি এসো, এটুকু রাত আমরা কথা করে কাটাই।

সোফিয়া বল্লে—না শেরি, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। কদিনের ছুটীতে শীগগিরই আবার আসছি তোমাদের কাছে।

সোফিয়া তখন কমরেড্‌দের বিশ্রাম করতে দিয়ে সিরিনের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন ভোরে সোফিকে যেতে হবে এক জরুরী কাজে। রাত তিনটার সময় উঠে পোষাক ঠিক কচ্ছে, জফির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে প্রশ্ন কল্লে—কি, প্রস্তুত হতে হবে নাকি? সিরিন একবার পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা দেখিয়ে বল্লে,—হ্যাঁ, এবার সোফির সহযাত্রী হও তুমি।

সোফিয়া দৃঢ় নিশ্চিত ভাব দেখিয়ে বল্লে,—নিশ্চয়! এমন সময় শেরিয়া চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির। সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে সম্মান দেখালে। সোফিয়া বল্লে,—আচ্ছা শেরিয়া, এ সব ব্যাপার তোমায় এখন কে করতে বল্লে?

শেরিয়া কোন জবাব না দিয়ে চা ঢালতে যাচ্ছিল, সিরিন উঠে এসে বল্লে,—তোমায় একটু সাহায্য করি।

শেরিয়া বল্লে,—আচ্ছা, তুমিই তৈরী করে নাও, আমি যাচ্ছি মোটর-বাইকখানা ঠিক করে বাইরে রেখে আসতে। বলে শেরিয়া চলে গেল।

জফি জিজ্ঞেস করে,—এত রাত্রে মোটর-বাইকে কোথায় যাবে সোফিয়া? কত দূর?

সোফিয়া—দূর বেশ, পঁয়ত্রিশ মাইল। ভোর বেলা সেখানে পৌঁছুনো দরকার।

জফি—তা হলে তো সেই জঙ্গলটার পাশ দিয়ে যেতে হবে, যে পথ দিয়ে এলাম? ওখানে তো বাঘ-ভালুকের আবির্ভাব ঘটে প্রায়ই। কাছের সেই পাহাড়টা থেকে আসবার সময় চালক বল্লেন।

সোফিয়া—না, ঠিক সেই গভীর জঙ্গলটার সামনে দিয়ে না গেলেও জঙ্গল-মাঠ—এ সবের মাঝখান দিয়েই যেতে হবে। বাইকের লাইটটা খুব প্যাওয়ারফুল আছে। কিন্তু বাঘ-ভালুকের ভয় কোথা? তারা সব মিলিটারীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে কে কোথায় পালিয়েছে! তাদের কাজ মিলিটারীরাই করছে এখন।

জফি—তা'হলে বলছো, ওদের ভয়?

সোফিয়া—হ্যাঁ, ওদের ভয় আছে বলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা সব সময় ঠিক রাখতে হয়।

শেরিয়া এসে বল্লে,—তোমার সব প্রস্তুত সোফি, ডেকে আনি ডাক্তারকে চায়ের মজলিসে।

সোফিয়া—রাত একটার সময় ভদ্রলোক ঘুমোতে গেছেন, এখনি জাগাবে?

শেরিয়া—হ্যাঁ। তিনি বলে গেছেন ডাকতে।

সোফিয়ার ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হলে চা খাওয়া শেষ করে সে বিদায় নিলে। ডাক্তার সাহেব এবং শেরিয়া গেলেন বিশ্রাম করতে।

জফি বল্লে—সিরিন, আমি কতটুকু বা তোমাদের দেখেছি আর

কতটুকুই বা জানি, কিন্তু তোমাদের ক্লান্তিহীন কর্ম্মব্যস্ততা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং আদর্শের নিষ্ঠা আমায় মুগ্ধ করেছে, আমায় আশ্চর্য্য করেছে। কত সময় মনে হয় তোমাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রত্যেক ঘটনা জানবার জন্য প্রশ্ন করি! মাঝে মাঝে আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ প্রশ্নও করে বসি, কিন্তু ভাবি যে না, প্রশ্ন করা বুঝি ঠিক হবে না।

সিরিন সোৎসাহে বল্লে,—জফি, আমার খুব ভাল লাগে তোমার ঐ সব প্রশ্ন,—তোমায় আমি বলেছিলাম মানুষের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার সেই কৃত্রিম লৌকিকতা দূর করবো, তোমায় বহু জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা জানিয়ে তোমায় অভিজ্ঞ করবো! আমার সে কামনা সে প্রচেষ্টা কতক এখন সফল হয়েছে। তোমায় এখন সোফির জীবনের কিছু বলবো। সে কাহিনী তুমি সম্পূর্ণ করে নিয়ো তার পর। ওর অন্তরের গভীরতা আর বিপ্লবী দৃঢ়তা ওর বাইরের মূর্ত্তিতে দীপ্তি ফুটিয়ে ওকে অত সুন্দর করেছে,—মানুষকে ও আকৃষ্ট করতে পারে অতি সহজেই।

জফি—আমি যখন শুনি ওর সঙ্গে মিলিটারী অফিসার, ডাক্তার এবং অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীদের ঘনিষ্ঠতার কথা, তখন বেশ বুঝতে পারি ওর ব্যক্তিত্ব কতখানি সক্রিয় হতে পেরেছে ঐ সব কঠিন জায়গায়। সেদিন তুমি যখন ওকে বলেছিলে সেই হৃদয়হীন বর্ব্বরটার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া ঠিক হবে না, সে সময় সোফিয়ার উত্তর আমার চমৎকার লেগেছিল। তাই জানবার আগ্রহ হয়, কে এই হৃদয়হীন?

সিরিন বল্লে,—বলছি তোমায় সে-কথা। সোফিয়াকে আমি প্রথম দেখি লণ্ডনের পথে। ওর চলার ভঙ্গী, ওর কৃত্রিমতাশূন্য সহজ হাঁটা আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তারপর এক দোকানে জিনিষ কিনতে ও যায়, আমিও প্রয়োজন তৈরী করে নিয়ে সে-দোকানে ঢুকি। একজন

ইয়োরোপিয়ান-খদ্দের বিক্রেতার কাছে দাবী তুলে বলেন তাঁর তাড়া আছে, তাঁকে আগে জিনিষ দিতে হবে এবং যেহেতু আমরা দুজন বিদেশী, আমাদের পরে দিলেও চলবে। অর্থাৎ তার চাহিদা আগে, এইটেই ছিল তার মনের কথা। সেই ভদ্রবেশীকে সোফিয়া এমন সভ্যতা শিখিয়ে দিলে যে তার আর সে-দোকানে জিনিষ কেনা হলো না। সেই সূত্রে সোফির সঙ্গে আমি কথা বলি এবং বিদেশে আপন-দেশের মেয়ে দেখে সেই দিনই আমার কাছে চায়ের নিমন্ত্রণ করি। সেও অত্যন্ত সহজ ভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রথম আলাপেই ওকে বেশ আপন করে নিলাম। বিদেশে হঠাৎ পথের পরিচয়ে এমন করে কাছে নিতে মন চাইলো ওর গুণের পরিচয় পেয়ে! অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের-খ্যাতি-নেওয়া মেয়ের মধ্যে যে মানুষের স্বাভাবিক সবগুণ এমন থাকতে পারে, এর আগে তা আর দেখিনি।

বাধা দিয়ে জফি বল্লে,—তোমার এ রকম অদ্ভুত ধারণা কেন হলো? মানুষ উচ্চশিক্ষা নেবার যত বেশী সুযোগ পাবে, ততই তো সমস্ত গুণের অনুশীলন করতে সমর্থ হবে। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় যে উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান, তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

সিরিন—স্বীকার করি, এবং তোমার যে এতে লাগবার কারণ আছে তাও বুঝলাম। কিন্তু জফি, তোমাদের শিক্ষার মূল্য-নির্দ্ধারণের নিক্তি আর বিপ্লবীদের নিক্তি এক নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা আহরণ করে, মনুষ্য-সমাজের মূল মন্ত্র তাতে থাকে না। সে বিদ্যা সমগ্র জগৎকে ধারণা করবার আকাঙ্খা জাগানো নয়, তাই তারা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গর্ব্বটুকুই ধারণ করে মাত্র, অন্তরের প্রকৃত বিকাশ সাধনের শিক্ষা তারা পায় না। ধনতন্ত্র-নীতিতে সব শিক্ষাই উল্টে ধরা আছে, সেজন্য যাদের বিপ্লবী অন্তঃপ্রেরণা অত্যন্ত প্রখর, তারাই পারে ঐ

জালের আবরণ উন্মুক্ত করতে ! তখন ওশিক্ষা সত্যই তাদের সাহায্য করে, শিক্ষার সুফল ফলে, নতুবা শুধু ছাপ নিয়ে অর্থকরী বিদ্যার পরিচয় দেয়, আর সত্যকার মানুষ-সমাজের আগাছা হয়ে বুর্জোয়া-সমাজের তিলক স্বরূপ বাহবা পায়, এই আমার অভিজ্ঞতা।

জফি একটু ক্ষুন্ন হলেও আর তর্ক তুললোনা ; মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো তার সহপাঠিদের কথা।

সিরিন বল্লে,—যাক্ ও কথা, সোফির জীবন-কাহিনী শুনে মিলিয়ে নিও আমার মত এর পর থেকে সোফির সঙ্গে আমার মেলামেশা ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো। ওর এক সহপাঠী বন্ধুকে আমার কাছে এনে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিযে দিলে। ভদ্রলোক সুপুরুষ, তবে তার বাহ্যিক ব্যবহারে আত্ম-প্রচারের ভাব অত্যন্ত প্রকট এবং মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করতে যত রকম জাল্ বোনা সম্ভব' তাতে তিনি বেশ পাকা। আমার মনে হয়েছিল সোফিয়া সে জৌলুসে ঝলসেছে ! আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর সোফি আমায় প্রশ্ন করেছিল, ভদ্রলোককে কেমন লেগেছে আমার ? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, ভাল। আমার ছোট্ট উত্তরে সোফি খুশী হতে পারেনি। সোফির ঐ বন্ধুর অতিরিক্ত ভদ্রতা এবং আদর-আপ্যায়নের ঘটা আমার ভাল লাগেনি। চায়ের নিমন্ত্রণ, সিনেমা, থিয়েটার, পিকনিক—এ সব ভীড়ের বন্ধুত্বে আমার কোন দিনই উৎসাহ ছিল না। ঐ সব ব্যাপারে যতটুকু আনন্দ বা ভাল লাগা মন থেকে আসে, তা আমার পূর্ণ মাত্রায় আছে। কিন্তু কৃত্রিম হৈ-চৈ করে ভীড়ের বন্ধুত্বের সঙ্গ-উপভোগের জন্য যাওয়া, তা আমায় ভাল-লাগে না। ওদের সঙ্গে আমার ঐ সব আমোদে যোগ দেওয়া সম্ভব হতো না, নিমন্ত্রণগুলো এড়িয়ে যেতাম। ওরা দুজনে প্রায়ই আমার কাছে আসতো। ভদ্রলোক লেখাপড়া নিশ্চয়ই বেশ করেছে, কৃতী ছাত্র

আলোচনা করবার কায়দা ভাল জানা ছিল। সে সব তার প্রচার-পত্রের মতই লাগতো আমার কাছে। সোফিকে আমি প্রথম-পরিচয়ে যতখানি টেনে নিয়েছিলাম, তারপর ওর বন্ধুটার স্বভাব বুঝে আমি একটু সরে এলাম। মনে হলো সোফির প্রথম যৌবনের উদ্দাম ভালবাসা ওকে আসল-নকল বুঝতে দেবে না, ওর মনের গতির সঙ্গে ওর বন্ধুর জীবন মেশাতে পারা কঠিন হবে। আমায় একটু নির্লিপ্ত বুঝে সোফি একদিন স্পষ্ট জিজ্ঞেস কল্লে, সিরিন আমায় আর তোমার আগের মতো ভালো লাগে না, না? বল্লাম,—ভাল লাগেনা এটা ঠিক নয়, তবে মনে হয় দুজনের চলা দু'দিকে। তাই মাঝ রাস্তায় এই মিলনটি ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয়। সোফিয়া বলেছিল, তা কেন? আজও তো চলা সুরু হয়নি, কেমন করে তুমি ধরে নিলে আমি উল্টো দিকে যাবো? পথের মোড়ে শুধু এসে এখন দাঁড়িয়েছি। তাকে বলেছিলাম, বেশ তো, তুমি চলতে আরম্ভ করো, আমি তোমার সাথী হবো চলার পথেই।

তারপর বন্ধুর চমকপ্রদ ভালবাসার টানে সে খানিকটা তলিয়ে গেল। ভদ্রলোক খুব ধনীর সন্তান। সেখানে তা প্রচার করতে টাকা খুব খরচ করেন, বন্ধুও জোটে বহু-রকমের। সোফি সে সব পছন্দ না করলেও ভদ্রলোককে ভালবেসেছিল এমন করে যে ও-সবগুলো উপেক্ষা করতো। আমি বুঝেছিলাম সোফি এ-আকর্ষণ সহজে কাটাতে পারবে না। সে আকর্ষণে সে ভালবাসা পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে—শুধু ভালো লাগা এবং আকর্ষণেই পর্য্যবসিত নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেল, আমি লণ্ডন ছেড়ে দেশে এলাম। বেশীদিন এক জায়গায় থাকা আমার অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু লণ্ডন থেকে দু'বছর পরে দেশে ফিরলাম,—তারপর কিছুদিনের মতো নানা স্থান ঘুরে অল্পদিনের জন্ম

শ্রীঘর-বাসও করে এলাম। কোন-কিছু অপরাধ প্রমাণ করতে না পেরে বিচারালয় থেকে নির্দ্দোষ বল্লে। আবার স্বস্থানে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, সোফি আমায় খুঁজতে এসেছিল। আমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে সে দেখা করতে চায়। খবর জেনেই তার কাছে গেলাম। তার চেহারা দেখে অবাক হলাম, এ কি পরিবর্ত্তন! প্রশ্ন করলাম সোফিয়া, তোমার কি খুব অসুখ করেছিল?

বিষাদ-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে বল্‌লে,—তা হলে তো খুব ভাল হতো! কিন্তু—এই পর্য্যন্ত বলে থামলো; তারপর বল্লে—যাক ও কথা, আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম একটু সাহায্যের প্রত্যাশায়। আমায় সাহায্য করবে? বল্লাম,—নিশ্চয়। আমার সাধ্যে হলে সব করতে পারি। সে বল্লে,—তোমার মামাতো ভাই আরসাদকে দিয়ে একটা কাজ করতে পারবে? বল্লাম,—কি কাজ বলো। তার মন খুব উদার। সে শিক্ষিত। তার কাছ থেকে উপকার পাওয়ায় অসুবিধা হবে না। তখন সোফিয়া বল্লে,—জানো সিরিন, আমার সেই বন্ধু জাফর বিদেশে থাকতে কি গভীর ভাবে আমায় ভালবেসেছিল! তারপর পাঠ্য-জীবন শেষ করে আমরা যখন দেশে ফিরলাম, সে আমায় বিয়ে করবে বলে আমার বাবাকে জানালো। অত-বড় ধনীর ছেলে, শিক্ষিত,—বাবার একটুও অমত হলো না,—একান্ত আগ্রহে বাবা সম্মতি জানালেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই জানলো জাফরের সঙ্গে আমার বিয়ে। মান, গৌরব, পদ-মর্য্যাদা সব তার ছিল। সাংসারিক একটা ব্যাপারে বিয়ের একটু দেরী পড়লো। ইতিমধ্যে জাফরের মনে চাঞ্চল্য ঘটলো। ঐ সহরের এক ধনী-কন্যার বাড়ীতে তার যাওয়া-আসা এবং বন্ধুত্বের কথা জানতে পারলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করতো, গোপন করতো। প্রথমে আমি বিশ্বাস করেছিলাম তবুও মন যেন কি বল্‌তো। আমি বলে—

ছিলাম যার বুকে নদীর স্রোত বহিয়েছিলে তার জোয়ার-ভাঁটা নিশ্চয় বুঝবে। মনে মনে ভেবেছিলাম, সোফিয়া বুঝতে না পেরে জাফরের ভালবাসার আলেয়াকে আলো মনে করেছিল। আজও সোফিয়ার বোঝবার মতো মনের অবস্থা ফিরে আসেনি, কারণ ওর তরফ থেকে ভালবাসা খাঁটি! তাতে বিচার বা যুক্তি ঠাঁই পায় না। তাই আসল নকল চেনবার অবসর হয় না। যে-মেয়েটীর সঙ্গে জাফর আবার প্রেমের অভিনয় আরম্ভ করেছে, সে এক বিখ্যাত ধনীর মেয়ে,। মা-বাপের একমাত্র সন্তান, সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। মেয়েটীর খবর নিয়ে সোফি জেনেছিল বহুদিন যাবত অন্য একজনের প্রণয়াসক্ত কিন্তু জাফরের বাহিরের জৌলুস আর এমন কতকগুলো ভড়ং আছে, যাতে সাধারণ মেয়েরা প্রথমটা খুবই আকৃষ্ট হয় ইন্দ্রজালের মতো! দোকানদারী করবার জন্য যত-কিছু প্রয়োজন, তা তার ভাল করেই আছে। অবশ্য পুরুষ-জাতের বেশীর ভাগই তাই! ক'জন মেয়েরই বা বুদ্ধির এতখানি তীক্ষ্ণতা আছে যে ঐ সব ধাপ্পা বুঝতে পারবে? তাই সহজেই পুরুষ তাদের যাদু করতে পারে।

জফি আর নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে পাল্লে না, প্রতিবাদ করে বললে —সিরিন, মেয়েরা অনেক সময়ই পুরুষকে ও-বিষয়ে ঢের বেশী ছাপিয়ে ওঠে! ছলনাময়ী ললনাদের হিপ্নোটাইজ করবার কৌশল জগৎ-বিখ্যাত। তাদের স্বভাব-সিদ্ধ সুনিপুণ ভাব-ভঙ্গি দিয়ে পুরুষের মাথা কত সহজে —ঘুরিয়ে দেয়! কত সুন্দর জীবনকে ব্যর্থ করে মেয়েরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে!

সিরিন—কিন্তু পুরুষদের সংখ্যা এবং কৌশল খুব বেশী, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সে-অস্ত্র প্রয়োগ করে।

জফি—মেয়েরাই বা তা বোঝে না কেন সিরিন? তারা তো তাদের মন দিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারে।

সিরিন—জফি, মন দিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। অনেক মেয়েই সহজ সুন্দর প্রাণ নিয়ে ভালবাসতে যায় এবং বাসেও। তারপর বোঝে, ভুল করেছে। এ ছাড়া, এমন একটা বয়স আছে যে সময় মনের উদ্দাম গতিকে হিসেবের বাঁধ দিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তার জন্য অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সে অভিজ্ঞতা বহুমূল্যে লাভ হয়। কজন পায় তার সুযোগ? যে পেয়েছে, সে আর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে যায় না। মেয়েরা বেশীর ভাগ যদি এতখানি হিসেব করে চলতো জফি, তাহলে কি দুনিয়ায় এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা থাকতো?

জফি বল্লে,—বলো সিরিন, শেষ পর্য্যন্ত কি হলো, আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সবটা শোনবার জন্য।

সিরিন—জাফরের নব-প্রণয়িণী তার আগের প্রেমিককে সবই গোপন করে চলতো, কিন্তু তার মনেও ক্রমে সন্দেহের দোলা জাগলো! সোফি আমায় বল্লে,—তোমার ভাই আরসাদ ঐ মেয়েটিকে ভালবাসে। সে যদি তাকে বুঝিয়ে বলে যে জাফর তাকে ভালো বাসে না, শুধু টাকার লোভে ভালবাসার ভাণ দেখায়, তাহলে সে মেয়েটিকে এ দারুণ মোহ থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু আমার কথা অরসাদ যেন জানতে না পারেন! আমরা দু'জনেই তাঁকে চিনি—অক্সফোর্ডে সহপাঠি আমরা। মনে মনে ভাবলাম, অসম্ভব। আরসাদের মন আমি ভাল করে জানি তার উচ্চশিক্ষিত মন, ভাবের গভীরতা, প্রেমের অপমান সে সহ্য করবে না। এতে একটুও ভাল ফল হবে না। সোফির তখনও মোহের ঘোর কাটেনি। আমায় চিন্তা করতে দেখে বল্লে,—সিরিন, আমি জানি, জাফর আমায় এখনও ভালবাসে। ঐ মেয়েটির ওপর তার ভালবাসার

আকর্ষণ একটুও নেই, শুধু সম্পত্তির লোভে ভালবাসার অভিনয় করছে। ওকে বলেছিলাম,—সোফি, ও দুটোর মধ্যে যারা পাল্লা দিতে চায় বা একটার প্রলোভনে আর একটা যুক্ত করে, তারা কি ভাল বাসতে জানে? ভালবাসা আর সম্পত্তির মোহ দুটো একেবারে উল্টো জিনিষ। এ সব কথা বোঝবার মতো অবস্থা তখন সোফির ছিল না। আমিও আর বেশী বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। দুর্দ্দমনীয় মনোভাবের মোড় ঘোরাবার সময় তখন আসবে। যেদিন জাফরের স্বরূপ প্রকাশ হবে ভাল করে, সেদিন সোফির জীবনে পরিবর্ত্তন হবে, পথের মোড় ঘুরবে। আমি আরসাদের সঙ্গে দেখা করলাম, সব কথাই তাকে বল্লাম। জাফরকে আরসাদ ভাল করেই চিনতো। লণ্ডনে সে মেয়েদের সঙ্গে অমন অনেক অভিনয় করেছে কিন্তু আরসাদ কল্পনা করতে পারেনি তেমন একজন ছেলের মোহে ঐ মেয়েটি নষ্ট হয়ে যাবে! আরসাদ ভীষণ আঘাত পেলে। আমি তা বুঝতে পারলাম। তবে আমার জানানো প্রথম চোট নয়! কারণ সে বলেছিল, ঐ মেয়েটির ভাবান্তর এবং ছলনা তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে! আরসাদ কিছুদিন তার সঙ্গে শুধু মৌখিক ভাবে মেশামেশা করেছে। কতদিন সে আরসাদকে বলেছে, শরীর ভাল নয় তাই বেড়াতে যাবে না, কিংবা অন্য কোন অজুহাতে তার সঙ্গ এড়িয়েছে। সেই সঙ্গে তাকে খুব বেশী করে ভালবাসার কথা জানিয়েছে। এ-সব ব্যবহারে আরসাদের মন খানিকটা শক্ত হয়ে আছে নাহলে এতখানি আঘাত সহ্য করা সম্ভব হতো না। আরসাদ আমায় বল্লে, এমন একটা হৃদয়হীন জালিয়াতের ফাঁদে পড়েচে? বলো সিরিন তোমার বন্ধুকে এই মুহূর্ত্তে সে যেন মুক্তি পায় এত বড় প্রতারণা থেকে! শিক্ষিতা মেয়ে সে—আর যেন অগ্রসর না হয়।

দু'জনের অবস্থাই আমি বুঝলাম। আরসাদও না বুঝে একটা মাটির

পুতুলের কাছে তার চলন্ত জীবন, গভীর প্রাণের সমাধি দিতে চেয়েছিল। সে প্রাণ মুক্তি পেলে ভুলের দণ্ড কিছুদিন ভোগ করবে। আমি ভেবেছিলাম, দু'জনের জীবন-গতিই আঘাত পেয়ে ঘুরে যাবে। এর কিছুদিন পরেই জাফর সেই মেয়েটীকে বিয়ে কল্লে। এদিকে সোফিয়ার বাবা অত্যন্ত গোঁড়া আভিজাত্যাভিমানী, তাঁর মান-মর্য্যাদায় আঘাত লাগলো। বহুদিন ধরে মেয়ে অবাধে ঐ যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। সর্ব্বত্র নিন্দা কুৎসা অপমান, বংশের কলঙ্ক ইত্যাদি।— সোফির বাবা সোফিকে খুব নির্য্যাতন আরম্ভ করলেন। বিমাতা ছিল, সেখানেও কণা মাত্র সহানুভূতি নেই। বাড়ীতে অত্যাচারের তাড়নায় থাকা তার অসম্ভব হল। হৃদয়-ভাঙ্গা আঘাত তার উপর অপমানে, নির্য্যাতনে সোফি একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। কিছুদিন সে আমার কাছে এসে রইল। তার স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা আমি করে দিতে চাইলাম, কিন্তু তখন তার দেহের উপর মনের ক্রিয়া চলেছে ভীষণ ভাবে। কাজ করবার মতো শরীর ছিলনা, আর আমার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তখন তাকে জড়ানো ঠিক হতো না। এ সব কারণে তার অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করলাম। তার এক নিঃসন্তানা মাসীর কাছে সে সময় সে থাকতো। ঐ সময়টা আমার সঙ্গে আবার তার সেই প্রথম পরিচয়ের আকর্ষণ ফিরে আসতে লাগলো। এই সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের মনের কত রকম বিকৃত অবস্থা হতে পারে, তার মূল কারণের সন্ধানী হলো সোফি।

জফি বল্লে,—সেই সুযোগে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার আদর্শ আর প্রভাব বিস্তার করলে নিশ্চয়!

সিরিন এ কথার উত্তর দিলে না। জফি প্রশ্ন করলে—তার পর আরসাদ সাহেবের জীবনের গতি?

সিরিন—সে একেবারে উল্টো পথে ঘুরলো। কিছুদিন অত্যন্ত মন

ভাঙ্গা হয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়িয়ে তার পর আমার সঙ্গে মেশবার খুব আগ্রহ জানালে, কিন্তু সেখানে অন্তরায় ছিল পুলিশের কৃপাদৃষ্টি। আমি তখন সব সময় আত্মগোপন করে আছি। আমার আত্মীয়েরা তখন অনেক দূরের হয়ে গেছেন। আত্মীয়দের বাধা-নিষেধ অতিক্রম করবার মতো মনের জোর আরসাদ পেত না! নাহলে আমায় সে খুব ভালবাসতো, শ্রদ্ধাও যথেষ্ট করতো। তার পর উদভ্রান্ত প্রেমের ব্যর্থতায় আত্মহত্যার মতো সে ঝাঁপ দিলে ঐ নরঘাতী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে—যদিও অন্তরে চিরদিন সে জাতীয়তা-বোধ আর দেশ প্রেমকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল! প্রেমের ব্যর্থতাকে বড় করে দেখে জীবনকে ঐ ভাবে ব্যর্থ করতে সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সোফি কিন্তু গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাবার কথা কোন দিন মনে স্থান দেয়নি। মোহের ঘোরে কদিনের জন্য মাত্র চলার পথ ভুলেছিল। এই কঠিন আঘাতে সে ফিরে এলো যথা-স্থানে। আবার জীবন্ত হলো। তার প্রেমও আজ জীবন্ত, প্রাণ সতেজ সরস। কিছু দিন আলেয়া দেখে ছুটেছিল কিন্তু পাঁকে ডুবে মরেনি। হঠাৎ একদিন ওর কাছে গিয়েছিলাম। দেখি, অন্যমনস্ক ভাবে বসে ও গান গাইছে—"আমার কাজের মাঝে তোমায় ভোলা সহজ হবে প্রিয়।" আমি বল্লাম, তাহলে কাজে এখন হাত দিও না সোফি,—কাজও হবেনা, ভোলাও হবে না। ভোলবার কি আছে? তোমার মনের সত্যকার প্রেম থেকে সেদিন যতটুকু দিয়েছিলে এবং যতটুকু পেয়েছিলে, সে মুহূর্ত্ত তো মিথ্যা ছিল না। আজ তা নেই। থাক, চলন্ত জীবনে অতীত স্মৃতি মাত্র, সে-অতীত যদি মরে গিয়ে থাকে, স্মৃতির ভাণ্ডারে যদি কণামাত্র জীবন্ত মাধুর্য্য থাকে, সেটুকু তোমার গ্লানি হবে কেন সোফি? (dead past but living memory). তোমার এতখানি জীবন্ত মন, শিক্ষিত প্রাণবন্ত জীবনকে আর একজন

ম্লান করে দেবে? আর একজন এ জীবনকে শুকিয়ে জীর্ণ করে দেবে তার নীচতা, তার অমানুষিক প্রতারণা দিয়ে? তোমার প্রেমের এতখানি অমর্য্যাদা ঘটতে দেবে তুমি? এ-কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমার অন্তরে ঐশ্বর্য্য আছে, দৃঢ়তা আছে, সব চাইতে শ্রেষ্ঠ যে সম্পদের তুমি অধিকারী, সে হলো তোমার বিপ্লবী প্রেরণা। আমার এ সব কথা সেদিন সোফির মনে ঝড় তুলেছিল—তখন সে কিছু বলেনি। কিছুদিন পরে তার একটা লেখা আমাদের দলের কাগজে ছাপাতে পাঠালে। সে লেখা এমন জীবন্ত, যুক্তিপূর্ণ যে পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনুষ্য-সমাজের রূপ-বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বকে চমৎকার করে ফোটানো। সে-লেখার পুরাতন সংখ্যা যদি পাই, তোমায় পড়াবো। এর পরেও সেই হৃদয়-হীন লোকটা মাঝে মাঝে সোফির কাছে আসতো। সোফি রুক্ষ হতে পারতো না। তার ব্যবহারে খুব নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পেতো। ওর ওপর সমাজ কতখানি অত্যাচার করেছে এবং কি ভাবে ও মুষড়ে পড়েছিল, তা বলে বোঝানো যায় না।

জফি—যে প্রাণে ঐশ্বর্য্য থাকে, সহস্র আবর্জ্জনায় আর আবেষ্টনে তা ঢাকা পড়ে না, বিভ্রান্ত হয় না। সময় আর সুযোগ এলেই সেই সাময়িক আবর্ত্তন আর আবরণ দূরে ফেলে এগিয়ে চলে। প্রাণের গভীরতাই হলো শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সিরিন—সেই গভীরতার জন্যই মিথ্যাকে চিনতে পেরেছে। দুঃখ ব্যথা যে পেয়েছে, তার মূলেও ছিল ভালবাসার গভীরতা। তা নয় তো হালকা মনের যুবক-যুবতীর প্রেম-ভালবাসা প্রতিনিয়তই ভেসে আসে, ভেসে যায়, কজনের মনেই বা রেখা পাত করে? সাময়িক উপভোগ, ক্ষণিকের বিলাসেই তার সমাপ্তি ঘটে। কত কত জীবনেই তো এমনি দেখলাম। যে বৃদ্ধার আবরণে আমরা কাটিয়ে এলাম, সে বৃদ্ধা হলেন

সোফিয়ার মাসীর শাশুড়ীর বোন,—তাঁর আর কেউ নেই,—সোফির মাসীই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং আপন-জন। সোফি যে শুধু নিজেই এত বড় কর্ম্মী হলো, তা নয়, মাসীকেও চমৎকার কর্ম্মী করে তুললে। সোফিয়া মাসীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। আর বৃদ্ধার যথেষ্ট সম্পত্তি—তার মালিক মাসী। এ-সব সম্পত্তি যখন যে ভাবে পার্টির কাজে দরকার হয়, সোফি ব্যবহার করে।

জফি—ওকে দেখলেই মনে হয় ঝকঝকে হীরে—যোগ্য জহুরীর কাছে ও হীরে মর্য্যাদা পেয়েছে।

সিরিন—তা পেয়েছে জফি,—মানুষের কাছে মানুষ-মনের মর্য্যাদা নিশ্চয় হয়!

শেরিয়া এলো ওদের জাগাতে, এসে দেখে, ওরা গল্প কচ্ছে।

শেরিয়া বল্লে,—অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার স্নান করতে যাও।

সিরিন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, প্রায় দশটা বাজে,—ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। জফিও স্নান করতে গেল।

দুপুরে ডাক্তার সাহেব ফিরলে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন।

ভোজন শেষ করে শেরিয়া বল্লে,—আমরা দুজনেই এখন বাইরে যাবো। তোমাদের ব্যবস্থা ঠিক করে রেখে যাবো, তবু যদি কিছু প্রয়োজন হয়, একটু অসুবিধা হতে পারে।

সিরিন একটু হেসে বল্লে,—আমাদের আবার অসুবিধা? এতখানি যত্ন আর আপ্যায়ন করেও বুঝি তৃপ্তি হচ্ছে না? আচ্ছা, কি রকম ব্যস্ত করবো, দেখো তখন।

শেরিয়া বল্লে,—তাতে আমি খুব খুশী হবো।

সন্ধ্যার পর ওরা দুজনে ফিরলো, সঙ্গে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে। সিরিনকে বল্লে,—এই মেয়েটির কাছে জানাবো, তোমরা আমার বোন আর—

সিরিন বল্লে,—আর থাক, কিন্তু মেয়েটির পরিচয় দাও,—বুঝে সেই ভাবে চলবো।

শেরিয়া বল্লে,—বলবো। আগে ওর বিশ্রামের একটু ব্যবস্থা করে আসি। পথে বড় কষ্ট হয়েছে।

জফি বল্লে,—সিরিন, শেরিয়া বেগম কি সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের সহকর্মী? না? সাহায্যকারিণী?

সিরিন—না, শেরিয়া এখন সম্পূর্ণ ভাবে কাজে নেমেছে, তবে এখনও শাসকদের নজরে পড়েনি। ডাক্তারও তাই,—ওরা শুধু আমাদের কমরেড়-দের মধ্যে পরিচিত। তবে সে-পরিচয়ও সীমাবদ্ধ।

জফি—আমার মনে হয়, ওঁকে আমি কোথাও দেখেছি।

সিরিন—অসম্ভব নয়, ও মিলিটারীতে চাকরী নিয়ে গিয়েছিল। তারপর অসুখের অজুহাতে চাকরীতে জবাব দিয়ে আসে। মিলিটারী নার্স ছিল। সে সময় কোথাও দেখে থাকবে! ও কিন্তু তোমায় চেনে না।

জফি—না, চেনবার মতো দেখা হয় নি। আমাদের মেডিকেল ইউনিটে হয়তো কোন সময় দেখে থাকবে! অসুস্থ সৈন্যদের দেখতে হসপিটালে যেতাম তো সর্ব্বদা।

রাত্রে খাবার শেষে দ্বিতলের বারান্দায় গল্প হচ্ছিল। বাড়ীটা নির্জ্জন, কেউ বড় আসেনা এদের কাছে। ডাক্তার সাহেবের কাছে কোন প্রয়োজনে যদি কেউ আসে, উপরে ওঠে না। লোক-চক্ষুর অন্তরালে কিছুদিন বেশ কাটানো যেতে পারে।

শেরিয়া বল্লে,—মেয়েটার কথা সোফি অনেক আগে জানিয়ে রেখেছিল। সময় হলে ওকে আমাদের কাছে আনাবে এই ঠিক ছিল। চার মাস হলো আমার পরিচিতা সোফির এক-নার্শ বন্ধু সোফির কাছে ওকে পাঠিয়েছেন। ওর সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাতে মনে হয়, এখানে থাকা ও গোপন রাখবে; এবং গোপন রাখা ওর নিজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

সিরিন—বুঝতে পাচ্ছি, ওর সন্তান-সম্ভাবনা এবং শীগ্‌গিরই,—সেই জন্যই এসেছে?

শেরিয়া—হ্যাঁ, দু'মাস সোফি ওকে কোথায় রেখেছিল। এখানে ওর সন্তান হলে তারপর অন্য ব্যবস্থা করবে। মিলিটারীতে নার্স ছিল। কদিন সে চাকুরী গেছে এই সন্তান-সম্ভাবনার অপরাধে।

কদিন কাটলো—সোফির—দেখা নেই,—আজ খবর এলো, কমরেড সঙ্গে নিয়ে সোফি রাত্রে এখানে আসবে। শেরিয়া ব্যবস্থা করে রেখেছে। ডাক্তারের এ সপ্তাহে কারখানার হাসপাতালে নাইট ডিউটি পড়েছে। সিরিন জফিকে বল্লে,—আজ কমরেড্‌ "এস" আর কমরেড্‌ "কে" সোফির সঙ্গে রাত্রে আসবে। এখানে মিটিং হবে। সে মিটিংএ তোমার থাকা চাই এবং আলোচনায় অংশ নিতে হবে।

জফি—আমি কি অংশ নেবো সিরিন? তুমি মনে করো এতখানি দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আমার হয়েছে?

সিরিন,—জফি, এর আগে ওদের সঙ্গে তুমি যে সব আলোচনা করেছো, তাতে তোমার যুক্তি, তোমার মন্তব্যের কতখানি মূল্য বুঝেছি, জানো? তোমার প্রস্তাবমতো আমরা ফ্রন্টের ডিভিসনের মধ্যে কি ভাবে আমাদের ষ্ট্র্যাটাজি ঠিক করবো, সে সম্বন্ধে পূর্ণ সাহায্য পেয়েছি।

তোমার মতো এমন সমর-অভিজ্ঞ সেনাপতির কাছে যা পাবো, তা আমাদের সঙ্ঘকে বিপুল শক্তিশালী করবে। আমাদের সঙ্ঘের কাজের এই বিরাট এবং প্রধান অংশকে আমরা এতদিন পূর্ণাঙ্গ করতে পারিনি। তোমার নেতৃত্বে সেই বিরাট অংশকে পূর্ণাঙ্গ করবো, আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

জফি—এই আত্মগোপন অবস্থায় বসে এত-বড় দায়িত্বের কাজ নেওয়া একজন সামরিক অফিসারের পক্ষে সম্ভব নয়,তা তুমি বোঝো। প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া বা ট্যাকটিক্স্ স্থির করা ভিন্ন সমর-সজ্জা বা ব্যবস্থা কি হতে পারে ?

সিরিন—সে সম্বন্ধে আজ আলোচনা হবে। প্রত্যক্ষে যাঁরা আছেন, কি ভাবে তাঁদের তোমার ডাইরেকশন দেওয়া সম্ভব হয়, সে-ব্যবস্থা আমরা করবো। বিপ্লবী আর্মি তৈরী করতে আমাদের কাজ কতদূর এগিয়েছে, এবং কি ভাবে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, তার বিস্তৃত বিবরণ আজ পড়া হবে। এবং কি ভাবে কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করলে আমরা সম্পূর্ণ একটা যান্ত্রিক-বাহিনী পূর্ণাঙ্গরূপে গঠন করতে পারি, আলোচনার জন্য আজকের এই মিটিং-এর ব্যবস্থা।

জফি—খুব শীগ্গিরই তোমাদের সংগ্রাম আরম্ভ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে না কি যে সেই ভাবের এক প্রস্তুতি হবে এখন ?

সিরিন—সংগ্রাম আরম্ভ করবার মতো অবস্থা যে-সময় বাস্তব মূর্তি নেবে, সে সময় আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করবো। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর সেই বাস্তব অবস্থা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

জফি—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হলে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সে নীতি সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

তোমাদের সঙ্ঘ আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করছে, তোমরাও আন্তর্জ্জাতিক বিভাগের মধ্যে থেকে কাজ কচ্ছো!

সিরিন—সে কাজের সুযোগ আমাদের সম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিক ভাবে আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সহযোগ না হলে এত বড় কাজ সম্ভব হয় না, তুমি তা ভাল করেই জেনেছ। যে ভাবের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সেই ভাবে আমাদের কর্ম্মসূচী স্থির হয়। আজ পর্য্যন্ত যত বই আছে—সাম্যবাদের প্রথম ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত—তার বেশীর ভাগ গ্রন্থই সুদীর্ঘ আলোচনা করে আমরা পড়েছি। এমন অল্প বইই আছে এই নীতিকে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করবার জন্য তোমার আমার এই দেড় বছরে যা পড়া বাদ গেছে,—সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতে অভূতপূর্ব্ব দুর্য্যোগের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছি। তারপর আবার প্রশ্ন করা কেন জফি?

জফি—তোমায় বহুবার বলেছি, প্রশ্ন আমার সব সময় মনে জাগে, এবং তা করবো তোমাদের কাছে। অবশ্য এ-প্রশ্নকে সন্দেহ বলে মনে করবে না তুমি, তা আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু সিরিন, পৃথিবীর গতি আর অবস্থা দেখে প্রশ্ন যে জাগেই!

সিরিন—প্রশ্ন জাগতে পারে কিন্তু এই পৃথিবী-জোড়া অসন্তোষ আর জটিলতার মীমাংসার কি আর কোন পন্থা বা নীতি আছে জফি? তুমি তো ধনতন্ত্র-বাদের অর্থনৈতিক এবং সমাজ-নীতির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছ, দর্শনের কৃতী ছাত্র ছিলে, তাদের শেষ মীমাংসার যে জটিলতা, তা তোমার কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বুর্জ্জোয়া-সমাজের বিকৃত রূপ তোমার কাছে পরিষ্কার। উপর্য্যুপরি বিশ বছরে এই দুই দানবীয় মহাসমরের মূল কারণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। জগৎ আজও চলেছে আত্মহত্যার নীতি নিয়ে, এখনও মানুষ বুঝতে চেষ্টা করছে না যে তার

কর্ত্তব্য কি! অন্ধের মতো সে ধ্বংশের পথে ছুটে চলেছে, তাও বোঝে না।

জফি—আমারও প্রশ্ন সেইখানে—এই যে অল্পদিন আগে ইয়োরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় রণাঙ্গন যেদিন উন্মুক্ত হলো, সেদিন হিটলার এই কথাই বলেছিলেন,—মিত্র-শক্তি আজ যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র উন্মুক্ত করলে, তার বীভৎসতা দান্তের বর্ণিত নরককেও ছেলেখেলায় পরিণত করবে। Approching the European coast, the invaders are experiencing an inferno compared to which, Dante's hell was a mere childish play. এই বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হলো! ইতিহাসের অদ্বিতীয় মৃত্যুলীলা, নর্মাণ্ডির কূল থেকে যতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, সমুদ্রের জলের রং মানুষের রক্তে রাঙ্গা হলো। অকল্পনীয় মারণাস্ত্র "ভি টু" (v. 2.), নূতন ধরণের সাব-মেরিন দ্বারা অতর্কিত ভাবে মানুষ বধ হতে লাগলো। এ সব কারা কচ্ছে সিরিন, হিটলার, গোয়েরিং চার্চ্চিল, রুজভেল্ট, মুশোলিনী তোজো, না, এই জনসাধারণের শক্তি, সামর্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা? বল তো তারা এই অকল্পনীয় নর-হত্যা বুঝে বা প্রত্যক্ষ দেখে আজও কেন ফিরে দাঁড়াচ্ছে না? এক-মুহূর্ত্তের জন্য যদি তারা অনুভব করে, তখনই তারা ফিরে দাঁড়াবে ঐ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে, ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবে ঐ রণ-দানবদের,—সমস্ত ক্ষমতা এবং শক্তি আজ তাদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

কথাগুলো বলবার সময় জফির অন্তর থেকে ফুটে উঠেছিল যে ভাব, তা দেখে সিরিন উত্তর না দিয়ে তন্ময় হয়ে বসে রইল—তার নিজের মনে যে কথা, যে প্রশ্ন অনুক্ষণ জাগরিত, সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনলো যেন! জফি সিরিনকে এতক্ষণ নীরব দেখে প্রশ্ন কল্লে,—কি হলো সিরিন, মন কোথায় দৌড় দিলে?

সিরিন—দৌড় দেয়নি জফি, ভাবছি রাশিয়ার আমলা-তান্ত্রিক শাসকরা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিশ্ব-বিপ্লবের কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা আজ করেছে! প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে লেনিন দূরদৃষ্টির বিশ্লেষণে যে ধ্বনি তুলেছিলেন,—This Imperialist war turn into civil war—এবং তারই ফলে রাশিয়ার সর্ব্বহারা বিপ্লব সফল হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্ব্বহারা-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা ট্রটস্কি সেই নীতি এবং কার্য্যসূচী নিয়ে চলে ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ার আমলাতান্ত্রিকরা তাঁকে হত্যা করে' ইয়োরোপ আর এশিয়ার যে কয়েকটি দেশে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল, তার পথও রোধ করলে! আজ ট্রটস্কি বেঁচে থাকলে তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র ইয়োরোপের নরক-কুণ্ডের মানুষগুলো আলো দেখতে পেতো, মানুষের পর্য্যায়ে তারা ফিরতে পারতো,—বিশ্ব-বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসতো। আজ বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিভাশালী বিপ্লবী কর্ণধার নেই। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতা নেই। আছে মাত্র তাঁর অমর বিপ্লবী নীতির একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও আদর্শবাদীরা, এবং কর্ম্মের ইতিহাস আর পন্থা। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগে বা আদান-প্রদানে বিশেষ কিছু বাস্তব সাহায্য এখনো পাওয়া যায় না।

সিরিনের আলোচনার বেগ কম হয়ে এলো। জফি চাইছিল আজ পরিষ্কার ভাবে প্রশ্ন করে, যুক্তি করে; কিন্তু সিরিনের এই গম্ভীর-ভাবে অসুবিধা ঘটলো। জফি বল্লে,— ওরা আসবার আগে তোমার কোন কাজ সেরে নেবার আছে নাকি সিরিন? সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, তৈরী হয়ে নিই। বলে চলে গেল।

জফি তখন একা পায়চারি কর—ছে বারান্দার কোণে সেই নবাগতা মেয়েটী অত্যন্ত মলিন মুখে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে।

তার সে দৃষ্টিতে এমন শূন্যতা এমন নিঃস্বতা যে জফির অন্তরকে তা স্পর্শ করলে। দিনের আলো তখনও নিভে আসেনি। জফির পদচারণার শব্দেও তার চমক ভাঙ্গলো না। জফি তখন আরও কাছে এগিয়ে গেল, কি বলবে ইতস্তত কচ্ছে,—একবার জুতোর শব্দ করলো। মেয়েটীর তখন চমক ভাঙ্গলো। জফির দিকে সে ফিরে দাঁড়াল। জফি বল্লে,—এসো, এখানে বসবে। একা দাঁড়িয়ে আছ কেন?

কোন কথার জবাব দেবার জন্য মেয়েটি প্রস্তুত ছিল না,—তখনও তার গভীর চিন্তা মনকে ছেয়ে আছে! জফি বুঝতে পারলে। তাকে একটু অন্যমনস্ক করবার জন্য বল্লে,—এই জায়গাটা বেশ সুন্দর, না? যদিও কল-কারখানায় লোকাকীর্ণ হয়েছে তবু বাংলোর পিছনদিকটায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়,—আর ফাঁকাও যথেষ্ট। সামনের নদীটী ছোট হলেও বেশ সুন্দর,—না?

মেয়েটী বুঝতে পারলে, ভদ্রলোক তার মনের মেঘ দেখে ফেলেছে,—তাই তাকে একটু ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কল্লে সহানুভূতির স্পর্শ—কত সহজ ভাবে তার প্রকাশ! অপরিচিত ভদ্রলোক কি স্বচ্ছ ভঙ্গী নিয়ে একজন মেয়ের সঙ্গে এমন করে আলাপ কচ্ছেন! এ সব ভাবতে-ভাবতে সে জবাব দিলে,—হ্যাঁ, জায়গাটা বড় চমৎকার। একদিকে যেমন কোলাহল, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির শান্ত, নির্ম্মল মূর্ত্তি। নির্জ্জনতাই আমার ভালো লাগে, অনেকক্ষণ ধরে তাই দেখছি।

জফি—আমি কি তোমায় ডেকে বিরক্ত করলাম?

মেয়েটী ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—না, না, বিরক্ত নয়। আমার উপকারই করেছেন,—আর বেশীক্ষণ পারতাম না চিন্তা করতে!......বলেই সে একটু চমকে উঠলো!,—ভাবলো, কেন একজন অপরিচিত লোকের সামনে এমন কথা বলে ফেললাম!

জফি এ ভাব বুঝতে পেরে অন্য কথা আরম্ভ কল্লে,—আজকে খবরের কাগজ পড়েছ যুদ্ধের খবর ইত্যাদি—

কিছুক্ষণ পরে সিরিন এসে বসলো। ওদের কথার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলে মেয়েটী শিক্ষিতা, আচার-ব্যবহারও বেশ মার্জ্জিত, কিন্তু তার মনের ওপর যে ঘন কালো আবরণ পড়েছে, তা তার ভাবে ও ব্যবহারে ফুটে উঠ্‌ছে! চাপতে যাবার চেষ্টা অত্যন্ত বেশী থাকায় কষ্ট পাচ্ছে বেশ, তাও বোঝা গেল।

প্রতীক্ষিত সময়ের আগেই সোফিয়া এসে উপস্থিত। এসে বল্লে,—আজ কমরেডরা এখানে উপস্থিত হতে পারবেন না—বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন। চার দিন পরে আসবার ব্যবস্থা হয়েছে। সিরিন বল্লে,—তোমায় আজ এত বেশী উৎফুল্ল দেখছি কেন বলো তো সোফিয়া? এত দিন কোথায় কাটিয়ে এলে?

সোফিয়া—নিজেই ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না! যা হোক, এখন বড় ক্লান্ত।

জফি তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেসটা খুলে সামনে ধরলে। মেয়েটির দিকে চেয়ে সোফি বল্লে,—কেমন আছো এডা? শরীর ভালো?

এডা বল্লে,—ভালই আছি।

সোফিয়া—হুঁ, ভালো থাকতেই হবে, ! শুধু মুখে বলা নয়। এ-কথায় মেয়েটি সহজভাবেই বললে,—চেষ্টা কচ্ছি এবং করবো।

উত্তরে মেয়েটার সম্বন্ধে সিরিনের মনে নানা প্রশ্ন জাগলো। শেরিয়া এসে বল্লে,—সোফি স্নান সেরে নাও। এখন খাওয়া দরকার।

সোফিয়া—দরকারের তো শেষ নেই,—সময়টা সে অনুসারে দীর্ঘ নয়,—এই যা দুঃখ। যাক, সেটা এবার আমরা ঠিক করে ফেলবো,—বলে সোফিয়া হাসলো—রহস্যপূর্ণ হাসি।

খাবার শেষে শেরিয়া বল্লে,—আমার একটু প্রয়োজন আছে, এখন

বাইরে যাবো। স্থানীয় কর্মীদের একটা মিটিং আছে। সেখানে আমাকে কতকগুলো খবর দিতে হবে।

সোফিয়া—ডাক্তারও সাথী হচ্ছেন ?

শেরিয়া—নিশ্চয়। নকল বেশে যেতে হবে, ডাক্তারের এ্যাসিষ্টাণ্ট হয়ে। রাত্রে তোমাদের কোন প্রয়োজন হলে একটু অসুবিধায় পড়বে।

সোফিয়া—প্রয়োজন এত তাড়াতাড়ি হবে, মনে করো ?

শেরিয়া—তা মনে হয় না, তবে কাল এডাকে ভাল করে পরীক্ষা করবো। তোমাদের ঘরের পাশেই ওর শোবার ব্যবস্থা করেছি,—প্রয়োজন হলে তোমরাও দেখতে পারবে।

মেয়েটীকে বিশ্রাম করতে বলে বাইরে থেকে সোফি দ্বার বন্ধ. করে এলো। তিনজনে বসেছে, বোধ হয় সারা রাত্রির মতো ব্যবস্থা করে। ঘরের আলো একেবারে নীল আচ্ছাদনে স্তিমিত করে খাট দু'খানা একত্রে জুড়ে, রাত্রির পোষাকে দেহকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে. আধশোয়া অবস্থায় খাট দুটো জুড়ে—সিগারেটের টিন আর লাইটার সামনে ধরা।

সোফি বল্লে,—আর সব কথা পরে শুনবে, এখন শোনো সিরিন, কি অভাবনীয় ভাবে তোমার ভাই আরসাদের সঙ্গে দেখা হলো।

সিরিন উৎসাহ-ভরে জিজ্ঞেস কল্লে,—আরসাদ ? সে ফ্রণ্ট থেকে ফিরেছে ? ভাল আছে ? অক্ষত আছে ?

সোফিয়া তার ব্যাকুলতা এবং আনন্দের অধীরতা দেখে মুগ্ধ হলো। "সিরিনের মন কি দিয়ে সৃষ্টি" এ-কথা বহুবার বলেও তার আশ মেটে না! আজও ভাষা দিয়ে তা না বলে শুধু চেয়ে রইল সিরিনের পানে,—জফি দু'জনের মনকে বইয়ের মত পড়ে নিলে। সোফিয়া বল্লে,—হ্যাঁ গো, ভালই আছেন, সুস্থ, সতেজ—দেহে মনে দুই। ফ্রণ্টে খুব খ্যাতি

নিয়ে ফিরেছেন! মস্ত-বড় পদ—ব্রিগেডিয়ার। আমার সঙ্গে দেখা এডার ব্যাপারে। যে-নার্শটা ওকে আমার কাছে এনেছিল, তার সঙ্গে তিনি আসেন এডার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ নিতে। তাঁদেরই মেডিক্যাল ইউনিটে এডা কাজ করতো। ওর স্বভাব আর কাজের জন্ম ওদের ইউনিটের কর্ত্তারা ওর ওপর খুশী ছিলেন বলে ওদের মেট্রন যখন অত্যন্ত গোঁড়ামী করে এডাকে চাকরী থেকে বিদায়ের ব্যবস্থা করে, তখন ওদের ক্যাপ্টেন সে খবর ব্রিগেডিয়ারের কাছ পর্য্যন্ত জানান। সে সময় এডার ঐ নার্শবন্ধু এডাকে নিয়ে দুতিনজন অফিসারের কাছে যায় এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলে সুবিচার চায়। তাঁরা বলেন, উপস্থিত চাকরী সম্বন্ধে কিছু করতে পারেন না, কিন্তু এডার কথা জেনে ব্রিগেডিয়র-সাহেবের দরদী প্রাণ গলে গেল। তিনি ঐ নার্শকে বল্লেন, তুমি যদি ওকে কোন ভাল জায়গায় রেখে ওর এই সময়কার ব্যবস্থা করে দিতে পারো, তা'হলে আমি সম্পূর্ণ সাহায্য করবো—এবং ভবিষ্যতে ওর ব্যবস্থা যাতে ভাল হয়, তাও করবো। দেশী মেয়ে এবং কি ভাবের অবিচার ওর উপর সব দিক দিয়ে হয়ে গেল, তা বুঝে ওর উপর তোমার ভাইজানের অত্যন্ত সহানুভূতি হয়। এডার বন্ধু এসে ব্রিগেডিয়র-সাহেবের কথায় আমার কাছে ওকে রেখে গেল। ব্রিগেডিয়র এলেন আমায় অনুরোধ জানতে। আমি এই ছদ্মবেশ নিয়ে যাই। পরোপকারিণী, সুনামক্রেতা বড়লোকের মেয়ে, আমার বিলাসী উদারতার মূল্যও তাঁর কাছে পেলাম, ধন্যবাদ গ্রহণ করে ধন্য হলাম। তাঁর এতদূর সহানুভূতি, দরদ আমায় একটু আশ্চর্য্য করেছিল, তারপর তাঁর সৌজন্যে আর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম।

সিরিন—সৌজন্য তো দেখালেন আধুনিকা দয়াময়ী মহিলার সমাজ-সেবার বিলাস দেখে, দেখে সেই সঙ্গে আবার মন খুলে তোমায় মুগ্ধ করে

সোফি—তোমার মতো অন্তর লুঠ করবার শক্তি কি আমার আছে? ঐ মুগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত!

জফি—ওটা তো প্রথম পর্ব্ব সোফি, লুঠ করার অধ্যায় আগত!

সোফি—নিজেদের আর্শিতে দুনিয়া দেখলে সব সময় মেলে না।

জফি—সব সময় না মিললেও সময়-সময় মেলে।

সিরিন—হয়েছে,—এখন দরকারী প্রশ্নের জবাবগুলো দাও সোফি,—তোমার মন দেখছি আজ কাজের কথা পাড়তে চাইছে না। বলো, তাকে কি রকম দেখলে? ক'দিন তার সঙ্গে দেখা হলো?

সোফি—প্রথম দিন এডার সম্বন্ধে তিনি সব খবর জানতে চাইলেন, কি ভাবে ওর ভাল ব্যবস্থা হবে এ-সব প্রশ্ন আর তথ্য। তারপর বল্লেন, আমি ওর খবরের জন্ম মাঝে মাঝে তোমায় বিরক্ত করবো। খুশী হয়ে সে-বিরক্তিকে আমি স্বাগত করবো বললাম। পরের দিন আমার বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণও করলাম। প্রথম দিনেই এ রকম অবস্থার মেয়েদের কথা নিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার আলোচনা হলো। তিনিও খুব উদার মতের পরিচয় দিলেন। আমার আলোচনার এতখানি সুস্পষ্টতা বোধ হয় ভাল লেগেছে। পরের দিনও চায়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলেন, ক'ঘণ্টা নানা আলোচনায় বেশ কেটে গেল। কোন রকম ব্যক্তিগত প্রশ্নবাদ কিছু হলো না। তিনিও সহজেই আমায় প্রতি-নিমন্ত্রণ জানালেন। হোটেলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে মোটরে অনেক-দূর ঘুরে আসবার পর তিনি বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেলেন। আমি সবিনয়ে বল্লাম, আপনার যদি সময় নষ্ট না হয়, তবে মাঝে মাঝে এলে ধন্ম হবো। তিনি বল্লেন,—বিকেলের দিকে তাঁর সব দিনই ফুরসৎ আছে। পরের দিনই আবার আসবার জন্ম অনুরোধ করলাম।

জফি—ঐ ভাবে সময় কাটাবার জন্য ফুরসৎ করে নিতে বাধা না হওয়াই উচিত। জফিকে উদ্দেশ করে সিরিন বললে, তাহলে কেন ছুটীর দিনেও সঙ্গীর ভীড় নিয়ে নানা ছল করে একলা হতে চাইতে?

উত্তর না দিতে পেরে জফি মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে এদিক-ওদিক করতে লাগলো।

সিরিন বল্লে,—সোফি, আসল জায়গায় একটু সন্ধান কল্লে?

সোফি—এত তাড়াতাড়ি ঐ সুদৃঢ় ধাতুর বর্ম্মাবৃত মিলিটারী অফিসারদের মনের সন্ধান পাওয়া সহজ ভাবো? তবে কথার ফাঁকে ফাঁকে আত্মীয়তা-বোধের আভাস বেশ পাওয়া গেল। আমি লক্ষ্য করেছি সিরিন, ঐ যে সাম্রাজ্য-বাদীর দারুণ প্রভেদ করার নীতি, বিশেষ করে সৈন্যদের মধ্যে—সেটা ওদের মনে বেশ আঘাত দেয়। এডার কথা নিয়ে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন, মেট্রনটি এদেশী মেয়ে নয় বলে ব্যাপার এতখানি জটিল কল্লে, অথচ ওদের নিজেদের মেয়েরা সকলেই এমন সব ব্যাপার সব সময়ে করে; সেগুলো চাপা দিয়ে আবার সব ঠিক করে চালায়! সাধুতা দেখানো শুধু আমাদের বেলায়। এমনি সব ছোট ছোট কথা থেকে উঠে পড়ছিল বড় কথা—তাতে সাম্রাজ্য-বাদীর অত্যাচার সম্বন্ধে বেশ কড়া মন্তব্যই প্রকাশ করছিলেন।

সিরিন—তবে আর কি—এগিয়ে চলো, যত দূর হয়! কিন্তু ওর মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে এমন মনে হয় না। সে সময় আমি কত চেষ্টা করেছি। তবে এ সময় যুদ্ধের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে মনে সাড়া জাগতে পারে। আমি শুনেছিলাম আমার খবরের জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ত হতো এবং সব সময় দুশ্চিন্তা জাগতো মনে। আমার বন্দী-জীবনের খবর অপরের মারফৎ বহু চেষ্টায় নিতো। আমার মনে হয় ওর জীবনের সেই দারুণ আঘাত ওকে যে বিপরীত পথে নিয়ে গেছে, সে পথ থেকে একদিন ও ফিরবেই।

সোফিয়া—তোমায় মেজর "এম"-এর কথা বলেছি—কারণ তাঁর বহু সংবাদ আরসাদের কাছে পেলাম, এবং কি ভাবে আমি তাকে চিনেছিলাম, তাও বলি, যখন ছদ্মবেশে······যাই। সে-সময় সেখানে সবে বোমা বর্ষণ সুরু হয়েছে। প্রতিদিন বিমান-আক্রমণ, আকাশ থেকে দারুণ অগ্নি-বর্ষণ, গ্রামবাসী আতঙ্কে জ্ঞান-শূন্য হযে কে কোথায় ছুটে পালাচ্ছে,—তাদের ওপর পড়ছে বোমা—আগুন লেগে জ্বলতে জ্বলতে ছুটছে আর ধপ করে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। কচি-কচি শিশুদের বুকে চেপে নিয়ে মায়েরা শিশুর প্রাণ বাঁচাবার আশায় মাথা ঝুঁকিয়ে শিশুকে আড়াল কচ্ছে, শিশু মায়ের বুকের মধ্যে পুড়তে লাগলো আগুনে। আগুনে-জ্বলা মানুষ ছুটছে, চারি পাশে অর্দ্ধদগ্ধ মানুষের বিকট চীৎকার! এর আগে কত রকম বর্ব্বরতা, বিকট মৃত্যুর কথা শুনেছি, কেতাবে পড়েছি, আজ এ হত্যালীলা চলেছে সে-সব ছাপিয়ে। মানুষ আর মানুষ নেই, জানোয়ার হয়েছে! এমন নিষ্ঠুরতা কল্পনা করতে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ অতি-সহজেই এ সব দানবীয় কাজ করে চলেছে। সেখান থেকে ছদ্মবেশে জঙ্গলের পথ ধরে আসবার সময় মেজর "এম"-এর সঙ্গে দেখা। সে সময় তাঁর মনের অবস্থা বোধ হয় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, জঙ্গলের মধ্যে তাঁরও আত্মগোপন প্রয়োজন হয়েছিল। সময় এবং মনের আবেগে অনেক কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি আমাদের দেশীয় অফিসার—ভাবের আবেগে অনেক তিরস্কার তাঁকে করলাম। সে তিরস্কার তিনি নীরবে শুনলেন। দু'দিন একত্র কাটিয়ে যখন নিজের নিজের জায়গায় ফিরছি তখন তিনি বলেছিলেন--অত্যাচারের যন্ত্রণায় তোমার বুকের জ্বালা নিয়ে যে তিরস্কার করলে নারী, তার উত্তর সময়ে পাবে,—সুযোগ এলে জীবন্ত মানুষগুলোকে ঘুমোতে দেখবে না।" তাঁর নাম-ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। এখন জানতে পেরেছি আমাদের

শত্রুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে সেখানকার জাতীয় মুক্তি-বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছেন,—তাঁর অধীনে বিশ হাজার জাতীয় সৈন্য মুক্তি-বাহিনীর শিক্ষা নিচ্ছে। কোন মুহূর্ত্তে কার সুপ্ত বেদনা জাগরিত হয়, কে বলতে পারে! জাতীয় সৈন্যদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ বিদ্যমান। তারা সবাই যে পেটের দায়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তা নয়। তাদের অনভিজ্ঞতা, আর বহুদিনের কুসংস্কারে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মের গঞ্জিকা-সেবনে "যুদ্ধে মরণে স্বর্গারোহণ করবে," "যুদ্ধ করা পৌরুষ" ইত্যাদি ধাপ্পাতে ভুলেও যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে যে সব অফিসার সংগ্রহ হয়, তাদের অন্নাভাব বা দৈন্য না থাকলেও তাদের পদ-মর্য্যাদার আকাঙ্খা, মোহ, বিলাস-প্রিয়তা, রোমান্সের তাড়না যথেষ্ট থাকে, তাই যুদ্ধে যায়। বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মান-মর্য্যাদা জাঁক-জমক তাঁদের ঈর্ষ্যা-বৃত্তিকেই শুধু বাড়িয়ে দেয়। এমন শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না, যার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্য-মর্য্যাদার অভিলাষী তারা হতে পারে। বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর অনুকৃত কৌতুকরূপে তারা নিজেদের স্তর ও শ্রেণী-পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, অর্থনৈতিক বা সামাজিক নিয়ম ও বিশ্লেষণে শ্রেণীর অস্তিত্ব তারা বোঝে না, তাই কাল্পনিক পেটী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মর্য্যাদা-লোভে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজ দেশের সর্ব্বনাশ করতে যোগদান করেছে। নিজ দেশের জনগণকে সীমাহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করবার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে তারা অংশ গ্রহণ করেছে। সে ক'জন এদিকে সচেতন হয়ে যোগ দিয়েছেন, তাদের সত্বর পাঠানো হয়েছে কারাগারে। জাতীয়তাবাদী নেতা যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংগ্রাম ঘোষণা করে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে এই যুদ্ধের সময় কাবু করতে চেয়েছিলেন, দেশের বৃহত্তম রাজ-নৈতিক দলের কর্ত্তারা তাঁর বিরোধিতা করে। সাম্রাজ্যবাদী তাঁকে কারারুদ্ধ করলে, কিন্তু সেই কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করে

ছদ্মবেশে তিনি পালিয়ে গেলেন বিদেশে। রাশিয়া থেকে সাহায্য পাবার আশা বৃথা হলো। তথাকথিত সাম্য-রাষ্ট্রের নেতা ষ্টালিন রাশিয়া ভিন্ন আর কিছুই জানেন না! তাঁর সমূহ-বিপদে অন্য দেশকে সাহায্য করতে পারেন না! সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী-বন্ধন অক্ষুণ্ণ, সেই বৃটেনের শোষণ-ভূমি উপনিবেশকে সাহায্য করলে বৃটেনের সাম্রাজ্য-স্বার্থ বিপন্ন হবে, রুশ-রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে! এ সব যুক্তি প্রকাশ্যেই দিয়ে চলেন তাঁরা এবং সেই কারণেই বহুদিনের পঙ্গু জংধরা ক্লীব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে ষ্টালিন ভেঙে দিলেন। এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদী নেতা আমাদের সাম্রাজ্যবাদীশত্রুর শত্রুর দেশে গিয়ে জাতীয় মুক্তির জন্য সাহায্য গ্রহণ করতে চাইলেন। কত-দূর সাহায্য পাওয়া সম্ভব এবং তার বিনিময়ে তারা কি মূল্য চাইবে, সে সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মত জানা গেল।

জকি—সিরিন সাম্যবাদীরা কেমন করে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সর্ত করে মুক্তি সংগ্রাম করবে? এক সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ করে' আর-এক সাম্রাজ্যবাদীর শাসন তোমরা মানবে?

সিরিন—আর-এক সাম্রাজ্যবাদীর শাসন মামার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জানতে পারি সেই সর্ত্তের বিষয়। সে সর্ত্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে সম্পূর্ণ ভাবেই থাকবে। সামরিক প্রয়োজনে তাদের কতটুকু নামতে হবে তার জন্য সর্ত্ত ও বাণিজ্য-চুক্তি ইত্যাদি, এ-বিষয়ে আমাদের কূটনীতি লিপিবদ্ধ আছে, তোমায় সমস্ত দেখাবো। তবে জাতীয় মুক্তি-বাহিনী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে যে-আলোচনা হয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই আমাদের মত তুমি স্পষ্ট বুঝেছো।

জকি—হ্যাঁ, সেখানে আমার আর কোন সংশয় বা প্রশ্ন নেই, তবে কার্য্যতঃ সফল করা অত্যন্ত কঠিন,—কারণ মিলিটারী সুপ্রীম-কমাণ্ড

যেখানে থাকবে, তার মধ্যে অন্য দলের ক্ষমতা-বৃদ্ধি অত্যন্ত কঠিন। তোমাদের জাতীয়তাবাদী নেতা বিদেশীর সাহায্যে ঐ বাহিনী গঠন করেছেন, এবং সে বাহিনীর তিনি সর্ব্বময় নেতা—সুপ্রীম-কমাণ্ডার অফ্ লিবারেশন্ আর্মি।

সিরিন—সে কথা আমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করে আমাদের কর্ম্মপন্থা ও কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করেছি। আমাদের বিপ্লবী নীতির মধ্যে যে রাজনৈতিক কূট পন্থা অনুসরণ করতে হয় (Revolutionary diplomacy) তা তো তুমি ভালভাবেই জানো। উপস্থিত আমাদের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ সাধন করবার জন্য দেশীয় বামপন্থী জাতীয়তা-বাদীদের যে সংগ্রাম সুরু হবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে, সেই সংগ্রামে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা সংগ্রাম করবো। জাতীয়তা-বাদীদের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি এবং সংগ্রাম যাতে চরম সংগ্রামে, জনগণের সংগ্রামে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্য ও পন্থা থাকবে আমাদের। সামরিক ক্ষমতা যদি জাতীয়তাবাদীদের হাতে ক্ষণকালের জন্য যায় এবং তারা জনগণকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র স্থাপন করতে চায়, তাহলে জনগণের বিক্ষোভ থেকে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে, সেই বিপ্লবেই তাদের উচ্ছেদ ঘটবে—আমাদের এই নীতি ও পন্থা অনুসারে কাজ করে যাবো।

জফি—জাতীয় বাহিনী ও সর্ব্বহারা বাহিনীর অস্তিত্ব বিভিন্ন রেখে সংগ্রাম চালনা করতে হলে তোমাদের সামরিক কর্তৃত্ব থাকবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয় সচেতন থাকবে?

সোফিয়া—শুধু সচেতন নয়, সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা ও আয়োজন এবং শক্তি সঞ্চয়ও করতে হবে।

জফি—জাতীয় মুক্তি-বাহিনীতে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা এই সময় থেকেই কি তোমাদের আদর্শ ও পন্থা অবগত আছেন?

সিরিন—সকলেই কি আর অবগত হয়েছেন? এমন অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের ঘোরতর বিরোধিতা করবেন এবং এখন থেকেই তাঁরা সচেতন। যুদ্ধের বীভৎসতা এবং বিশ্বের পরিস্থিতি—জাতীয়তা-বাদের চরম পরিণতি যেদিন তাদের সামনে প্রকট করে দেখা দেবে, সেদিন তাদের মধ্য থেকেও অনেককে পেতে পারবো, এ নিশ্চয়।

জফি—তোমার দুটো কথা থেকে আমার প্রত্যক্ষ দুটো ঘটনা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সোফি—বলো জফি—আমরা তোমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জানবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

জফি—সোফি যে বল্লে মেজর-সাহেবের প্রতিক্রিয়ার কথা, ঐ ধরণের একটা ঘটনা বলবো। আমাদের মনকে কঠোর করবার, শুষ্ক করবার জন্য যে-শিক্ষা প্রতিনিয়ত দেওয়া হয় এবং আমাদের যে-গণ্ডীর মধ্যে রাখা হয়, তাতে শিক্ষাটা আয়ত্ত হয়ে যায় বটে, কিন্তু আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ভাব-প্রবণতা (finer sentiment) একেবারে ধ্বংশ হয়ে যায় না; সময় সময় আশ্চর্য্য ভাবে তার বিকাশ হয়। মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধে যখন আমরা ছিলাম, সে সময় একটা রণক্ষেত্রে ভীষণ বোমা-বর্ষণ হচ্ছিল। আমরা চলেছি মরুভূমির মধ্য দিয়ে আর একটা রণক্ষেত্রে, মাঝ-পথে এই বোমা বর্ষণ। একটু ঘুরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছুবো, মরু-পথ দিয়ে মার্চ্চ করে চলেছি। বোমা-বর্ষিত গ্রামের নর-নারী উন্মাদের মতো ছুটে আসছে—কোথায় যাবে, জানে না। গ্রাম ছারখার, সহর নিশ্চিহ্ন মরুতেও যুদ্ধ,—জলে ঝাঁপ দেবে কি আগুনে পুড়ে মরবে, তাও জানে না, ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কত লোকের গায়ে আগুন জলছে। একটী মহিলা পড়ে গেলেন আছাড় খেয়ে, বুক থেকে তাঁর শিশুকন্যাটি ছিটকে পড়লো ক'হাত দূরে। মা মরে

গেছে, শিশু পড়ে আছে। আমরা এসে পৌঁছুলাম সেই জায়গায়। ওদের সাহায্য করবো সে উপায় নেই। আমার এক বন্ধু শিশু-কন্যাটিকে বুকে তুলে নিলে। শিশু তখন চীৎকার করে কাঁদছে, আঘাত বিশেষ কিছু লাগেনি। অনেক দূরে চলেছি, আমাদের সঙ্গে খাবার নেই, জলও অত্যন্ত কম। মরুভূমির দারুণ গরমে শিশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আমাদের চলার শেষ নেই, গন্তব্যে পৌঁছুতে অনেক দেরী। সন্ধ্যা হলো, রাত্রি-বেলা শিশু অত্যন্ত কান্না আরম্ভ করলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমাদেরও দেহ অবসন্ন, কিন্তু সে অবসন্নতা দূর করতে বিশ্রাম চাইলে মৃত্যু! কোথাও একটু জল পাই না যে শিশুর মুখে ক'ফোঁটা মুখে দিতে পারি। ভোরবেলা সে ছটফট করতে লাগলো। একবার আমার কোলে, একবার বন্ধুর কোলে! আবার রোদ উঠলো—আরও তৃষ্ণা। শিশুর মুখ দিয়ে তখন রক্ত উঠছে, ক্ষুধার তৃষ্ণায় নীল বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ওঃ, কি ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা, তবু শিশু মরছে না, চোখ দুটো ফেটে বেরিয়ে আসছে! সোফি সে-দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারবো না! আমার বন্ধু বল্লে,—জফি, ওকে গুলি করো। যুক্তি দিয়ে বুঝে আমি রিভলভার তুললাম, পারলাম না গুলি করতে। আমার বন্ধু বল্লে,—ওর মৃত্যু-যন্ত্রণা যে আর দেখতে পারা যায় না। এতটুকু শিশু—কতক্ষণ এই ভাবে ছটফট করবে! পারবে না তুমি জফি? আমি স্তব্ধ। তখন সে কি করলে, জানো সিরিন? বুকে-তুলে নেওয়া শিশুর বুকে গুলি করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটালে। তারপর নিজ-হাতে তার চোখটি-নিজের গুলিতে নষ্ট করে ফেল্লে, ফেলে বল্লে,— এই অজুহাতে এ-নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবো। অঙ্গহীন বলে যুদ্ধ থেকে রেহাই হয়তো মিলবে! এত বড় অত্যাচার মানুষ করে চলেছে, আর মানুষ তা -সহ্যও করছে এখনও! তার এই প্রতিক্রিয়া তাকে নিষ্ক্রিয় করে

গেছে, কিন্তু প্রতিকার করতে চাইবার মতো চিন্তাধারা বা আদর্শ যদি পেতো, তা'হলে ঐ ওলট-পালট-করা মনের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারতো, যেমন তোমার মেজর সাহেব লাগিয়েছেন।

সিরিন বিস্ময়ে দেখছিল জফির মুখের ভাব, সে ঘটনা ঘটবার সময় তার যে ভাব, তা সম্পূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছিল এই মুহূর্ত্তেও! সিরিন বল্লে,—জফি ঐ বিকট রণক্ষেত্রে এই ধরণের বীভৎসতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে. সেটা সত্য, এবং সেখানকার বীভৎসতা দেখেও যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে আর ফেরবার পথ থাকে না, এমন কি মরণেরও পাশা পোর্ট মেলে না। তাই এক অবর্ণনীয় অবস্থায় দিন গুণতে হয় ওদের। কিন্তু ওরা তো সংগ্রাম-কারিণী শক্তির অনুশীলন করেছে, ওরা কেন এক-মুহূর্ত্তের জন্ত উল্টে যন্ত্র চালায় না, এই ভেবে আমি অস্থির হই! আশ্চর্য্য, এই কথাগুলো যাকে বুঝিয়ে বলো সেই বেশ বোঝে—কিন্তু কাজের বেলায়—

সোফিয়া—ভগবান, ধর্ম্ম, আর অদৃষ্ট, এই তিন মহানিশার মোহে মানুষ মানুষের পর্য্যায়ে উঠতে পারে না!

সিরিন—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র মৃত্যু—এই বিকট মূর্ত্তি নিয়ে মানুষের পাশবিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাচ্ছে। সমাজের আর একটা দিক যা দেখছি, তা থেকে আমার আদর্শবাদ আর নীতি আরো স্পষ্ট করে আমি উপলব্ধি করেছি। বিভিন্ন শ্রমিক কেন্দ্রে শ্রমিক-সংগঠন করবার সময় তাদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থেকে চোখে যে নির্ম্মম, অসহনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি,—তার কিছুটা তোমায় বলি। বুকের-রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের যে মূল্য পায়, তাতে কি ভাবে জীবন ধারণ করে, তাতো জানোই। তেমনি সহস্র সহস্র লোক কয়লার খনিতে কাজ কচ্ছে, খনির কাজে কি কষ্ট তা তোমায় বলেছি।

খনির শ্রমিক-কেন্দ্রে যখন যেতাম, প্রায়ই নামতাম খনির ভিতরে। একবার তিন মাস ছিলাম একটী কেন্দ্রে। সেখানকার এক খনিতে চার মাস ধরে গ্যাস উঠছে বলে ওদের মাইন-এক্সপার্ট জানিয়ে গেছে—শীঘ্রই ঐ খনি বন্ধ করে দেওয়া উচিত, নাহলে বহু লোকের প্রাণ-হানি হবে। এ সংবাদ জানবার পরেও খনির মালিক বল্লে,—এখন খনি থেকে যথেষ্ট কয়লা উঠ্‌ছে, এ-সময় খনি বন্ধ করলে অনেক টাকা লোকসান। দু'হাজার শ্রমিকের জীবন বিপন্ন, সে আর এমন কি! কিন্তু তাদের রক্তে ধনীর বিলাসের ব্যবস্থা প্রচুর করে নেওয়া প্রয়োজন। একদিন সেই গ্যাস দারুণ জ্বলে উঠলো! আটশো খনি-শ্রমিক, আর ম্যানেজার মাটীর নীচে মরে রইল! যারা মরেছে, তাদের আত্মীয়রা খোঁজ করতে এলো। বিশ-পঞ্চাশ টাকা তাদের দিয়ে বল্লে,—তোমাদের খোরাকী নাও। কাগজে খবর বার করলে,—পঞ্চাশ জন মরেছে, বাকী আমরা উদ্ধার করেছি। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী, এবং সমস্ত তথ্য জানতাম, প্রকাশ করবার জন্য সংবাদ-পত্রের আশ্রয় চাইলাম, সত্য খপর তারা ছাপবে না! লোক-হিতার্থে আছে গভর্ণমেণ্ট। সে-গভর্ণমেণ্ট তা ছাপতে দেবেনা—কারণ গভর্ণমেণ্ট এই শোষণ-কারীদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত।

চাষীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, হাজার হাজার লোকের খাদ্যাভাবে, ব্যাধির আক্রমণে অকাল-মৃত্যু। মাথা গুঁজে থাকবার কুঁড়েটুকুতে সহস্র ছিদ্র, পরণে কারো বস্ত্র নেই। অর্দ্ধাহার, অনাহার—সেই অবস্থায় জমিদারের জুলুম, চৌকিদারের জুলুম, সরকারের জুলুম। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া থেকে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার চলে পশুর মতন—খাজনা না দিতে পারার অপরাধে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেদিন তারা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করে খাজনা দিতে অপারগ বলে জানালে, সেদিন চললো নির্ম্মম ভাবে বিচারের দণ্ড—

সঙ্গে সঙ্গে গুলি। রক্তস্রোত বহিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করে তখনকার মতো শেষ হলো সে পালা।

এই সেদিন ধন-কুবেরদের স্বর্গ আমেরিকায় চীনা শ্রমিকরা মজুরী বাড়াবার দাবী করে—সে দাবী মেটাতে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেবার ছল করে জাহাজ ভর্ত্তি করে. তার পর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফেলে দিলে পঞ্চাশ হাজার চীনা-শ্রমিককে! বেশী মজুরী চেয়েছিল বলে চিরদিনের মজুরী পেয়ে গেল মহাসাগরের বুকে ডুবে মরে! কি বিকট মৃত্যুলীলা,—জন্মাবার কোন মানেই নেই যেন এদের! এই ভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করতেই পৃথিবীর অগণিত জনগণের জন্ম!

অফি—······ ফ্রণ্ট থেকে ফেরবার পথে একটা ঘটনা,— ধর্ম্মের নেশায় মনের অদ্ভুত অবস্থার সে করুণ ছবি আমার মনে বড় গভীর রেখায় আঁকা আছে। হঠাৎ গভীর রাত্রে বিমান-আক্রমণ, আমাদের জিনিষ-পত্র প্রস্তুত—রওনা হবো ঠিক সেই সময়! বোমা-বর্ষণ থামবার পর সেই রাত্রেই আমাদের যেতে হলো। চলেছি কোন রকমে জীবন রক্ষা করে। পথের সঙ্কট অবস্থা। সর্ব্বত্র বাড়ী-ঘর যান বাহনের ধ্বংশস্তূপের ওপর দিয়ে চলেছি। অগণিত মৃত দেহ—অর্দ্ধদগ্ধ আহত সৈনিক, নগর-বাসীর করুণ চীৎকার, কোথাও বা জল-জল করে আর্ত্তনাদ, কোথাও বা বাঁচাও বলে করুণ কাকুতি! অন্ধ বধিরের মতো দৃকপাতহীন দ্রুত চলতে হচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে হবে, আমরা যোদ্ধা, আমাদের জীবন মূল্যবান, কারণ মানুষকে হত্যা করতে হবে, মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংশ করতে হবে এই মূল্যবান জীবন দিয়ে। তাই কারও প্রাণের কথা ভাববার প্রয়োজন নেই, কোনদিকে তাকাবারও অবসর নেই! এই অবর্ণনীয় শ্মশান-ভূমি আর ধ্বংশ-স্তূপের মধ্যে দেখি, এক যুবতী হাতে একটি বাতি নিয়ে উন্মাদের মতো কি খুঁজছে! আমাদের পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আমি

দ্রুত মন্থর করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে আমায় প্রশ্ন কল্লে,—এখানে পাবো তাকে? আমি বল্লাম,—এখানে এক মুহূর্ত থেকোনা, ভয়ানক বিপদ! এখনি এ স্থান ত্যাগ করো। সে বল্লে,—আমি আমার প্রিয়তমকে খুঁজতে এসেছি! সে সৈনিক। এই ছাউনিতে ছিল। এখানে বোমা পড়েছে জানতে পেরে আমি ছুটে এসেছি। বলো, সে কোথায় আছে? তুমিও তো সৈনিক, নিশ্চয় বলতে পারবে। আমি বল্লাম,—এখানে তো তাকে পাবে না। যদি পাও তা'হলে—। সে বল্লে,—জানি, যদি পাই, তাহলে জীবিত পাবোনা! কিন্তু তার দেহ—সেই দেহ নিয়ে গিয়ে আমি কবর দেবো। না হলে তার আত্মার মুক্তি হবে না,—খোদা তাকে নিয়েছেন, কিন্তু দেহের সৎকার না করলে খোদা বিরূপ হবেন। কি দৃঢ় বিশ্বাস! এই দারুণ শোকের সান্ত্বনা বুঝি আছে একটু এ বিশ্বাসে! তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম, তোমার সান্ত্বনা আছে—বল্লাম, যুদ্ধে মরলে তার আত্মা খোদার কাছেই যায়। কোন সৈনিকের দেহের সৎকারের প্রয়োজন হয় না। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো, খোদা তাকে তুলে নিয়েছেন। সে প্রশ্ন কল্লে—সত্যি বলছো? আমি একেবারে পাকা খবর হিসাবেই তাকে বল্লাম,—হ্যাঁ, সে খোদার কাছে গেছে। আমার সঙ্গীরা বল্লে,—সর্ব্বনাশ,—আর সময় নষ্ট করা নয়, এক-মুহূর্ত দাঁড়ানো নয়, চলো। আমি মেয়েটাকে বল্লাম—তুমি ফিরে চলো—তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাবো। এখানে থাকা নিরাপদ নয়। সে বল্লে,—কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই, একমাত্র স্থান আমার দয়িতের কাছে। সেইখানেই আমি নিরাপদ। আমি সেখানে যাচ্ছি—তোমরা যাও! বলে উন্মাদের মতো ছুটে চলে গেল সেই প্রজ্বলন-স্তূপের মধ্যে। কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী দৃশ্যই না দেখেছি, বোকি! পাষাণ? না, মানুষ? মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছি নিজের অন্তরকে।

একটা নিশ্বাস ফেলে সোফির দিকে আগ্রহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সিরিন বল্লে,—আচ্ছা সোফি, আরশাদকে কি আমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে?

সোফি—আজই সে-কথা কেমন করে বলি? তবে এই ক'দিনে যা বুঝেছি তাতে মনে হয়, যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে ওর মনে বেশ প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। সেটা সাময়িক হতে পারে, কিন্তু এ সময় ওর সঙ্গে থাকা এবং আলোচনা করা খুব বেশী প্রয়োজন। আমি ওর কাছে কতক-গুলো ইস্তাহার পাঠিয়ে দিয়েছি। জাতীয় সৈন্যদের জন্য ও নম্বরের ইস্তাহার বেরিয়েছিল, তাই।

সিরিন—সে পড়েছে বলে জানতে পেরেছ?

সোফিয়া—পড়েছে তা নিশ্চয়ই জেনেছি এবং পড়বার পরে বেশ কিছুক্ষণ মুখ গম্ভীর করে বসেছিল, তাও শুনেছি।

জফি—সোফিয়া, তোমরা কি-ভাবে অফিসারদের কাছে ঐ সব ইস্তাহার পৌঁছে দাও? সর্ব্বত্র তো তোমাদের লোক থাকা সম্ভব নয়!

সোফি—আমাদের কর্ম্মীরা সামরিক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। মিলিটারীদের মধ্যে আমাদের "চক্র" (cell) সৃষ্টি হয়েছে। মেডিকেল বিভাগ, নার্শ-বিভাগ, এ, আর পি, পাবলিক-রিলেসন, টেলিফোন, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি সমস্ত বিভাগে অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে তারা চাকরি নিয়ে ঢুকেছে। আর্ম্মি-লেবারের মধ্যে বহু কর্ম্মী আছেন। ফাইটিং ফোর্সে ও অনেকে আছেন। অবশ্য তাঁদের দ্বারা ইস্তাহার ইত্যাদি দেওয়ার সুযোগ হয় না, কারণ অত্যন্ত সাবধানে তাঁদের ছদ্মবেশ রক্ষা করে চলতে হয়। বেশীর ভাগ সময় রেষ্টুরেণ্ট বা সিনেমা-হল, খেলার মাঠ ইত্যাদিতে বিতরণ হয়। এছাড়া আজ-কাল গ্রামে-সহরে পথে-ঘাটে কোথাও তো আর মিলিটারীর অগম্য স্থান নেই। পথের গরীব ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের

হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কি কাগজ, কিছুই, যারা বোঝে না, ছদ্মবেশে তাদের হাতে ইস্তাহার আর সেই সঙ্গে টাকা দিলে তারা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাদের ধরে প্রশ্ন কল্লেও ভয় থাকে না। আমাদের কজন কমরেড্ চা খেতে রেষ্টুরেণ্টে যায় মিলিটারী অফিসারদের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে। যে-সময় মিলিটারীদের কাছে ইস্তাহার পৌঁছোয়, সে-সময় ওরাও চা খাবার ছলে রেঁস্তরায় ঢোকে—অফিসারদের ভাব বুঝতে। কতটুকু ফল কখন হবে বলা যায় না, সময় এলে সে পরিচয় ভাল পাওয়া যাবে। ভালো কথা সিরিন, তোমার যে আর দুটো আন্তর্জাতিক আবেদন লেখবার কথা ছিল, তা শেষ হয়েছে?

সিরিন—অল্প বাকি আছে,—কাল শেষ করবো—তাতে অফিসের মন্তব্য আছে অনেকখানি।

সোফিয়া—তবে আনো। সেটা এখন পড়া যাক্। তারপর মিটিং-এ আলোচনা করে ছাপানো এবং বিলির ব্যবস্থা হবে।

সিরিন কাগজের তাড়া এনে সোফির হাতে দিয়ে বল্লে—তুমি পড়ো সোফি, তাহলে আমার কাণে লাগবে—শোধরাবার কিছু থাকলে শোধরাবো—যোগ করবার কিছু থাকলে যোগ করবো।

সোফি—জেলের মধ্যে কে তোমার কাণে লাগাতো সিরিন? তখন তো দিস্তে ভরে পাঠাতে, বাইরে প্রুফ্ দেখে দিলেই চলে যেত। তার চেয়ে তুমিই পড়ো, আমরা দু'জনে কল্পনা করে নেবো বিরাট সমর-ক্ষেত্রের একটা উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগময়ী ভাষায়, প্রাণের উৎসারিত বিপ্লবী প্রেরণায় তুমি যেন বক্তৃতা দিচ্ছ!

সিরিন—থাক! হয়েছে! এখানে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার নেই, কাজেই তোমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখন পড়ো এগুলো।

সোফিয়া পড়তে আরম্ভ করলে—

বিশ্বের সর্ব্ব সমর-ক্ষেত্রের যোদ্ধা ও

সৈনিকদের প্রতি নিবেদন—

"The soldier is the man in whose hands power rests." Trotsky

"সৈন্যরাই সমস্ত শক্তির আধার"—গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সমর-বিশারদ ট্রটস্কি এই কথা বলেছিলেন।

তখনকার চাইতে ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এ কথাকে আরও বাস্তব আরও উপযুক্ত ও কার্য্যকরী করেছে, অভূত-পূর্ব্ব যন্ত্র-যুদ্ধের ফলে। সৈন্যরা সৈন্যাধ্যক্ষেরা, তোমরা আজ বেশ বুঝতে পারছো তোমাদের ক্ষমতা আজ কত দুর্দ্ধর্ষ, সমস্ত দেশ ও জাতির শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তোমাদের মধ্যে, এবং সে শক্তি অজেয়। যে মানব-ধ্বংশী মেশিন-গান ও ডাইভ্ (Dive Bomber) বমার মুহূর্ত্তে শত শত মানুষকে ভস্ম-স্তূপে পরিণত করে দেয়, সেই যন্ত্রটা চালাতে একজন বা দুজন মাত্র মানুষের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। যন্ত্র-দানব ট্যাঙ্ক থেকে কামান ছুঁড়ে হাজার হাজার মানুষ মারতে পাঁচ-সাত জন লোকই যথেষ্ট—কিন্তু ঐ যন্ত্র-চালকদের, মধ্যে কেউই উচ্চ-পদস্থ ক্ষমতার অধিকারী শাসক নয়; যে শাসক-শ্রেণীর স্বার্থ—চিরদিনের মতো উপরের স্তরে বসে থেকে অসংখ্য জনগণের রক্ত শোষণ করা, তিলে-তিলে তাদের হত্যা করে কয়েক-জনের অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকার ও যথেচ্ছ ভোগ-বিলাস করার নীতিকে কায়েম করা, তোমাদের এই যোদ্ধা সৈন্যদের প্রত্যেককে হিংস্র পশুর মতো ব্যবহার করা! উপনিবেশ এবং বাজার দখল নিয়ে বিভিন্ন ধনতন্ত্র-বাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করবে,—যুদ্ধ করবে মুষ্টিমেয় কয়েক-জন উন্মত্ত ভোগলিপ্সু, মদগর্ব্বী,—আর দুনিয়ার

অগণিত জনগণ প্রতি বিশ বৎসর পর-পর এমনি পিঁপড়ের মতো মরবে!

ওগো সাহসী, ওগো যোদ্ধা সৈনিক অফিসার,—তোমরা গত মহাযুদ্ধের নজীর দেখে আজ চক্ষুষ্মান হও, ফিরে তাকাও তোমাদের অবস্থার দিকে। যাদের জন্য তোমরা যুদ্ধ করছো, তারা তোমাদের মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে কোনদিন তুলবে না, তুলতে পারে না! পৃথিবীতে তারা শান্তি আনবেনা! কারণ এই ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-নীতির প্রতিষ্ঠা হলো শোষণ ও কঠোর শাসনের উপর ভিত্তি করে। তাই যে কোন পক্ষই জয়ী হোক না কেন তারা সেই শোষণ-নীতির উপর ভিত্তি করেই জয় আনবে, তাতে দেশ ও জাতির নির্য্যাতিত শ্রেণীর ভাগ্যের ও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হবে না। যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই আর এক মহাযুদ্ধের সূচনা হবে—যতদিন পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, ব্যক্তি-স্বার্থবাদ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকবে, ততদিন এই বর্ব্বর হত্যালীলা বন্ধ হবে না।

ওগো মরণ-পথের যাত্রী যোদ্ধার দল, তোমরাও নির্য্যাতিত ও পীড়িত। তোমরা মানুষের মতো বেঁচে থাকবার জন্য সংগ্রাম করো—তোমাদের মধ্যে যে অজেয় সংগ্রাম-কারিণী শক্তি রয়েছে, সে শক্তি ধ্বংশের জন্য নয়। জীবনের নিয়ম—বেঁচে থাকবার জন্য সংগ্রাম করা (struggle for existence) এবং সে-সংগ্রামে সৃষ্টি হবে মানবীয় সংস্কারে পূর্ণ জীবন্ত মনুষ্য-সমাজ।

তোমাদের মধ্যে অসংখ্য পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও অশান্তির অনল ধূমায়িত, সে অনল প্রজ্জলিত করবে তোমরা। বহুযুগের এই অত্যাচারের জড়কে নির্ম্মূল করে, ধ্বংশ করে, সমগ্র জগতে শান্তি-স্বপ্নময় আদর্শ-মানব-সমাজ গড়ে তোলো। সে সমাজে কেউ কারো হত্যাকারী হবে না—একজন আর একজনকে শোষণ করে পুষ্ট হবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্র-বাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে সেই মানুষ-সমাজ! সেই আদর্শ

সমাজের স্পষ্ট চিত্রের বাস্তব রূপ নেবে সাম্যবাদী বিশ্ব-রাষ্ট্র—এই কথা তোমরা স্পষ্ট করে বুঝে নিয়ে সংগ্রাম করো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

রাজনীতিবিদ, মহৎ বিপ্লবী-সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক ট্রটস্কি বলেছেন (Politics is the brain and military is the driving machine) "রাজনীতি হলো মস্তিষ্ক এবং মিলিটারী হলো চালাবার যন্ত্র।" সেই যন্ত্রের ক্ষমতা আজ বিজ্ঞানের বলে অজেয় হয়েছে—জল-স্থল-ব্যোম আজ যন্ত্রের করায়ত্ত। কিন্তু রাজনীতি-বিদরা যে-মস্তিষ্কের প্রয়োগে ঐ মিলিটারী-রূপ যন্ত্র চালনা কচ্ছেন, সে মস্তিষ্ক সর্ব-মানবের স্বার্থে নিয়োজিত নয়, সে মস্তিষ্কের ক্রিয়া শুধু শোষণে পুষ্ট।

ওগো মিলিটারী মেশিন-বীরের দল, ওগো ভাঙার পথের যাত্রী, তোমরা একবার চেয়ে দেখ তোমাদের দিকে। জীবনের নিয়ম হলো সৃষ্টি করা—জাগতিক নিয়মে পুরাতনকে ভেঙে নূতনের সৃষ্টি প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। তোমরা শুধু ধ্বংশ-পথের যাত্রী হয়ে ধ্বংশ হয়ে যেয়োনা! তোমরা জাতি এবং দেশের ভবিষ্যৎ, মানব-সমাজের আধফোটা ফুল,—তোমরা অকালে ঝরে যেও না। তোমাদের জীবন্ত প্রাণকে প্রস্ফুটিত করে সৌরভ ছড়াও! ঐ পূতি-গন্ধময় দানবতাপূর্ণ মস্তিষ্ক-রূপ রাজনীতিকে ধ্বংশ করে মুছে দাও মানব ইতিহাসের কলঙ্ক!

ওগো মিলিটারী মেশিন, অজেয় ক্ষমতাশালী সৈনিকের দল, দুনিয়াকে ওলট-পালট করার শক্তি রাখো তোমরা। মহৎ লেনিন বলেছেন——The machine sometimes gets out of control. The machine does not work exactly and often not at all, as the man at the wheel expects. "যন্ত্র মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়—তখন চালকের প্রত্যাশানুযায়ী যন্ত্র কাজ করতে পারে না"। ঐ দুর্নীতি-পরায়ণ রাজনীতিবিদদের যত দানবীয় নীতি আজ তোমাদের

কাছে প্রতি রণক্ষেত্রে প্রকট। তোমরা তাদের চালাবার যন্ত্র, তোমরা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছ তোমাদের অপরাজেয় যন্ত্র-শক্তি নিয়ে—তোমরা কিছুমাত্র ভয় পেও না—তোমরা ভেবোনা পিছন ফিরলেই তো উচ্চপদস্থ অফিসাররা গুলি করে মারবে! সেই উচ্চপদস্থ অফিসার সংখ্যায় ক'জন মাত্র? তারা কজন মেশিন চালিয়ে তোমাদের হত্যা করতে পারবে? মাঝখানে সমদুর্ভোগী যে সব মধ্য-অফিসার আছেন, তাঁরা তোমাদের দিকে ফিরে আসবেন। যে-সব অল্প-সংখ্যক উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আভিজাত্য, পদ-মর্য্যাদার লোভ কোনদিনই যাবে না, তাই তাঁদের সমূলে উচ্ছেদ করে তোমরা ক্ষমতা নেবে। তোমাদের সঙ্গে দেশ ও জাতির সমস্ত জনশক্তি ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঐ সব শোষক ও শাসক-শ্রেণীর শোষণ-নীতির ফলেই আজ এই পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধ, এবং সে যুদ্ধের ফলে পীড়িতদের উপর পীড়ন সহস্র-গুণ বেড়ে গেছে। সমগ্র নির্য্যাতিত জনগণের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তোমাদের মধ্যে। উৎপন্নকারী কৃষক, সে আজ যা উৎপন্ন কচ্ছে, তা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে অজস্র ভাবে মানুষ মরছে, দেশ ও জাতির শক্তি দুর্ব্বল হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে। পৃথিবীর যত বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ মিল এবং কারখানায় যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, তা এই সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের ধ্বংশ-যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়! সে ধ্বংশ বহু যুগের বহু মানবের সাধনায় সৃষ্ট শিল্প, সৌন্দর্য্য, সংস্কৃতি এবং মানুষকেও ধ্বংশ করে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-কারীদের বহু নির্য্যাতনের উপর কঠোরতা আরও বাড়িয়ে তুলছে। তাদের বলা হচ্ছে "যুদ্ধের কাজ" "দেশরক্ষার কাজ" এই সব ভাঁওতার কথা। ঐ সব শোষিত শ্রেণী সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত তোমাদের সঙ্গে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর মৃত্যু, তার সঙ্গেও

জড়িয়ে আছে তারা এবং তাদের মৃত্যু। এ আজ থিওরীর কথা নয়, নীতি-বাক্য নয়, অত্যন্ত বাস্তব ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ সত্য,—তোমরাও প্রতি মুহূর্ত্তে চোখের সামনে তা দেখছো। তাই আজ ভাষার প্রয়োজন নেই, বক্তৃতার প্রয়োজন নেই—তোমাদের তীব্র অনুভূতি আজ তোমাদের সচেতন করবে। মাঝখানের অফিসাররা এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য, তোমরা ফিরে দাঁড়াবে, উল্টো বন্দুক চালাবে, উল্টে যন্ত্র ব্যবহার করবে ঐ কসাই-খানার সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে। মৃত্যুকে সামনে রেখে আজ যেমন কমাণ্ডারের ভয়ে ঐ দানবীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছো, সেদিন তেমনি পৃথিবী থেকে চিরতরে এই অস্বাভাবিক দানবীয় মৃত্যুকে সরিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়াবে। জগৎজোড়া নরহত্যা প্রতি বিশ বছর অন্তর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ, উন্মাদ, সর্ব্বস্বান্ত করছে, সেই দানবীয় যুদ্ধের চির-অবসান তোমরাই করতে পারবে।

ওগো সৈনিক, ওগো যোদ্ধা, আজ শুধু কেতাবে ও কাহিনীতে এ-কথা নেই। গত ১৯১৭ সালে পৃথিবীর বুকে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী সংগ্রামের জয়ে এবং সাম্য-রাষ্ট্রের ভিত-গাঁথার দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ বাস্তবে জগতের ছ-ভাগের এক-ভাগ ভূ-সীমানার অধিকারী রাশিয়ার তা প্রমাণিত হয়েছিল।

তোমরা কি জানো সৈনিক—তোমরা কি জানো অফিসার, সেদিনের সেই অভাবনীয় বিপ্লবী যুদ্ধে কাদের অবসান, কাদের শক্তির উৎকর্ষ ছিল? তোমাদেরই মতো সৈনিক এবং মধ্য-অফিসারদের সংগ্রাম-শক্তি এবং কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংহতির দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ জার-তন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছিল। সেদিন সেখানের নির্য্যাতিত সৈন্য ও মধ্য-অফিসাররা বুঝতে পেরেছিল, দেশের নিপীড়িত কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে যে শক্তি, তাকে শাসক-শ্রেণী পরাজিত করতে পারবে না। শাসন-তন্ত্রের যত-কিছু শক্তি

তা সমস্তই এই নির্য্যাতিত সর্ব্বহারা জনশক্তির মধ্যেই। শাসকরা আছে কেবল মাত্র কথার ধাঁওতা দিয়ে জনগণকে পশুবৃত্তিতে নামা! যারা দেশ বা জাতির প্রাণ-শক্তি, তাদের মাত্র মারণ-যন্ত্র রূপে ব্যবহার করে এরা বসে থাকে আরাম-আমোদের সিংহাসনে। ভূমি-খণ্ড নিয়ে ঐ সব লুণ্ঠনকারী দস্যুরা যখন পর-রাজ্য আক্রমণ করে, তখন ঐ সব সৈন্যদের ফাঁকা উত্তেজনার বুলি দিয়ে ছেড়ে দেয় হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্রের মতো—তারা তখন তাদেরই সম-অবস্থার ভাইদের বুকে নির্ম্মম ভাবে গুলি চালায়, বেয়নেট চার্জ করে, মেশিন-গান ছোড়ে, তারপর তাদের উপর সেই চিরাচরিত প্রথার শোষণ-নীতি চলতে থাকে। সেই অতলান্ত মহাসাগরের নিম্নতা ও গৌরীশঙ্করের উচ্চ শৃঙ্গের অসমতার ভেদ মানুষে মানুষে প্রকট হয়ে থাকবে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে আজ প্রমাণিত হয়েছে মানব-সমাজের এ দুর্নীতি তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে জগতের নির্য্যাতিত অত্যাচারিত কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী এবং যুদ্ধরত সম-অবস্থার সৈনিক ও মধ্য-অফিসারদের বিপ্লবী সংগ্রামে। যোদ্ধারা সৈন্যরা সমাজের বিরাট অংশ,—এই সমাজেরই প্রতীক তারা। সমাজ-দর্শনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ট্রট্স্কি বলেছিলেন—"An army is always a copy of the society it serves with this difference that it gives social relation in a concentrated character carrying both their positive and negative features to an extreme." "সৈন্যশ্রেণী সব সময়েই তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। শুধু এইটুকু পার্থক্য যে সেনা-বিভাগে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি চরম পরিণতি লাভ করে।

তাই বলি ওগো জাতির কেন্দ্রীভূত মূলশক্তি, দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চলার দল—বলোতো আজ যাকে তোমরা শত্রু বলে নির্ম্মম ভাবে হত্যা

করে চলেছ, তারা কোন দিন কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করেছে?' তারা তোমাদেরই ভাই, তারা যে এই মহামানব-গোষ্ঠীরই একজন, একথা কেন ভুলে যাও? কেন তোমরা ভোলো তোমাদের পথভ্রষ্টকারী ধাপ্পাবাজ নরভুকদের কথার মাদকতায়? আজ হিটলার, মুসোলিনী, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্টের জয় হলে কি জার্ম্মেণী, ইটালী জাপান ইংলণ্ড আমেরিকার শোষিত শ্রেণীর মুক্তি হবে? তারা কি মানুষের মতো বেঁচে থাকবার এতটুকু সুখ-সুবিধা ও অধিকার পাবে? একশ্রেণীর উপর আর একশ্রেণীর শোষণ, নির্য্যাতন, আধিপত্য ঘুচে যাবে? না, তা যাবে না। তা যেতে পারে না। তাদের নীতিতে সেটা ঠিক বিপরীত। রুজভেল্ট আজ বড় গলায় বলছে, সে সমগ্র জগতের গণতন্ত্র চায় এবং সেই সঙ্গেই বলছে "জগতের জনগণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করাই হলো আমার নীতি ও উদ্দেশ্য"। সোনার পাথরের বাটীর মতো কথার ফাঁক আজ সবাই বুঝতে পাচ্ছে! চার্চ্চিল বলছে, সে জগতের সমস্ত লোকের শান্তি চায় আবার সে নাকি গণতন্ত্রীও! কিন্তু তার অবিচলিত নীতি সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টাক্ষরে ধ্বনিত হচ্ছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লাল-বাতি জ্বালাতে আমি ব্রিটীশের প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসিনি"। I have not become the king's first minister to preside over the liquidation of the British Empire.

এই তো শান্তি চাওয়ার আকাশ-কুসুম, এ-কথা আজ কেন বুঝতে পাচ্ছো না? গত মহাযুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই যে আর এক মহাযুদ্ধের বীজ বপন হয়েছিল, এবার আর তা হতে দিও না তোমরা। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে জগতে সত্যকার মানব-সমাজ ও সর্ব্ব-মানবের শান্তি তোমরা প্রতিষ্ঠা করো। তোমরাই তা পার্ব্বে। সে শক্তি তোমাদের আছে। বিশ্বের সর্ব্ব-রণাঙ্গনে তোমাদের সর্ব্বাধিকার, তোমাদের

অসীম ক্ষমতা, অজেয় শক্তি—এই কথাটি তোমরা বোঝো, উপলব্ধি করো।

পৃথিবীর সর্ব্ব-রণাঙ্গনের যোদ্ধা সৈনিকদল,—একবার ফিরে দাঁড়াও ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে। পৃথিবীকে যারা কসাইখানায় পরিণত করেছে, যারা সুন্দর ধরণীকে নরককুণ্ডে পর্য্যবসিত করেছে, তাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে, চিরতরে বিলুপ্ত করে সাম্যবাদী মনুষ্য-সমাজ বিশ্বব্যাপী করো। তোমরা জীবন্ত, তোমরা সুন্দর, তোমরা যুবক—তোমাদের শক্তিরকার তেজোদীপ্ত সংগ্রাম-কারিণী শক্তিকে মানবীয় সংস্কার দ্বারা চালিত করে, মানব-কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করে মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। তোমরাই পারবে সেই প্রকৃত মানব-সমাজ গড়ে তুলতে, যা বহু যুগের দার্শনিকদের বহু সাধনার ফল, যা বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব গবেষণায় আলোকিত এবং যা সহস্র সহস্র বিপ্লবী যোদ্ধার জীবন-দানের সফল পরিণতি!

বিশ্বযুদ্ধের বিকট ভয়াবহ বীভৎসতার প্রতিক্রিয়ার বাস্তব অবস্থা আজ সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে। বিশ্ব-বিপ্লবের অগ্রদূতেরা একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, তোমরা তাদের সঙ্গে এক হও। সমগ্র রণাঙ্গনের যোদ্ধা সৈনিক এক হও।

তোমরা যে-কোন ফ্রন্টে প্রথম বিদ্রোহ করবে, তার প্রারম্ভে সেইখানে আসবে অতিমাত্রায় দমন-নীতি ও অত্যাচার। কিন্তু তাতে ভয় পেও না, দমে যেও না। যে অত্যাচার যুগ যুগ ধরে সহ্য করছো, আরও করবে, তাকে উচ্ছেদ করবার জন্য এ-সব সহ্য করবে মানুষের মতো। বিদ্যুতের গতির মতো তোমাদের সেই বিদ্রোহের কথা জগৎময় ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের প্রত্যেক ফ্রন্টের ভাইরা, তোমাদের কমরেডরা তোমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ সুরু করবে—বিশ্ববিপ্লবী সর্ব্বহারা সাম্যবাদী-দল তোমাদের

বিশ্ব-বিপ্লবের নীতি, পদ্ধতি, কর্ম্মপন্থা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করবে, বিশ্ব-বিপ্লব আরম্ভ হবে, বিস্তৃত হবে। তোমরা কোন একটা দেশ বা কোন একটা জাতির মুক্তির জন্য সে বিদ্রোহ করবে না,—তোমরা জ্বালাবে বিপ্লবের আগুন, সে বিপ্লবের বহ্নি সারা বিশ্বে প্রসারিত হবে। সে বহ্নিকে নিবোতে পারে, বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি কোন শাসক-শ্রেণীর নেই—তারা তৃণ-খণ্ডের মতো ভস্মীভূত হবে। বিপ্লবের অগ্নিশিখায় ভস্ম হয়ে যাবে তাদের বহুযুগের দানব-বৃত্তি, দস্যু-বৃত্তি ও দুর্নীতি। **বিশ্বের নির্য্যাতিত পীড়িত-শ্রেণী এক হও,** বিশ্ব-বিপ্লব তোমাদের জন্য বাস্তব প্রস্তুতি সহ সাগ্রহে প্রতীক্ষা কচ্ছে!

জফি এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। ইস্তাহার পড়া শেষ হয়ে গেছে, তখনও সে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। বিপ্লবী অন্তরের দৃঢ়তা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যখন প্রকাশ হয়, তখন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ভাবে অন্তরকে দেখতে পায় মানুষ—বুঝতে পারে আসল কথা, সত্য কথা, সহজ সত্য ওদের জটিলতা-হীন সহজ ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। জফিকে এভাবে চিন্তা করতে দেখে সিরিন বল্লে,—জফি, তুমি কি বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের অগ্রসর হবার আজ্ঞা দিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবছো বিপরীত কথা বলবে? না, বিপরীত আজ্ঞা দেবে?

জফি একটু মিষ্টি হেসে উত্তর দিলে—আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি তোমাদের জীবনকে সরস ও জীবন্ত করে চালিত করবার স্বচ্ছ ধারা। কত বড় বিপদের মাঝেও দেখেছি, আবার গভীর আলোচনার মাঝেও দেখেছি এবং যখন কণামাত্র নৈরাশ্যের ছায়া দূর থেকে নজরে আসতে দেখেছি, তখনও কত দৃঢ়তা ও সাহস এবং সে সময়ও তোমাদের কত ধৈর্য্য! আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, যে-দেশে এমন মানুষ আছে,

সেখানে—

বাধা দিয়ে সিরিন বলে,—তোমার প্রশ্ন করবার সময় এখনও আসেনি জফি।

জফি—সোফিয়া, এই ধরণের ইস্তাহার পড়ে ওদের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়? ওরা কি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে?

সোফিয়া—যাঁরা ওদের মধ্যে আছেন, তাঁদের কাছে শুনি, আমাদের ইস্তাহার পড়বার পর ওদের ক্ষণিকের জন্য সাড়া জাগে, কিন্তু প্রকাশ করবার সুযোগ হয় না। ওরা অত্যন্ত ভয় পায়, একজন আর একজনকে বিশ্বাস করে না, আলোচনা করতে ভরসা পায় না। কিন্তু ওদের মনে ঘা লাগে। কয়েক জায়গায় আমাদের কমরেডরা যে 'নিউক্লিয়াস' প্রস্তুত করেছেন, সেখানে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। আমার নিজের যতটুকু দেখা ও বোঝা, তা'হলো—একজন কফিখানার কফি-খরিদ্দারের যতটুকু জানা সম্ভব, তাই। রেঁস্তরায় বসে অফিসাররা যখন খোস মেজাজে খানা-পিনা করেন, পাশে দরিদ্র বালকরা দাঁড়িয়ে থাকে পথের ধারে—খাওয়া শেষ করে অফিসাররা বাইরে এলে ছেলেগুলি পয়সা ভিক্ষা চায়, কেউ খোস-মেজাজে কিছু দিয়ে যান, কেউ বা দূর করে দেন। তারা সেই সময় ইস্তেহারগুলো ছড়িয়ে দেয় ওদের কাছে। কেউ বা এদিক-ওদিক চেয়ে পড়তে আরম্ভ করে, কেউ বা পকেটে নিয়ে চলে যায়, কখনও বা দেখি আবার ফিরে আসে অন্য-কিছু খাবার অজুহাতে এবং পকেট থেকে বার করে পড়তে থাকে। সময়-সময় মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। অনেক সময় এগুলো নিরক্ষর লোকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারা অফিসারদের কাছে পড়াতে যায়। কিন্তু শুধু ইস্তাহার পড়িয়ে ওদের মনে সাড়া জাগানো যাবে, তা নয়! ইস্তাহারে বুঝিয়ে দিয়ে নিরত ওদের মধ্যে কাজ করতে হবে। আমরা ওদের মধ্যে কাজ আরম্ভ

করেছি প্রায় সব জায়গায়। কিন্তু বুঝতেই তো পারো কত বড় বিপদ ও সঙ্কটের মধ্যে "সেল্" (Cell) প্রস্তুত করতে হয়। যে মুহূর্ত্তে ওদের সন্দেহ হবে, কোর্ট-মার্শাল অনিবার্য্য। নার্শের কাজ নিয়ে গিয়ে যারা কত সন্তর্পণে কাজ কচ্ছে, তাদেরও ওপর নজর এড়ায় নি। ধরা পড়ে কয়েকজন নার্শের কোর্ট মার্শাল সেখানে হয়ে গেছে। ফাইটিং ফোর্স-এ, আর্টিলারী ইউনিটে আমাদের কাজ বেশী। কয়েকজন কমরেডের প্রাণদণ্ডও হয়েছে সেখানে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে সীমান্তে গেছে, দেশীয় সৈন্ত ও মধ্য-অফিসার, যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের মধ্যেও আমাদের কমরেডরা আছেন এবং শত্রুর-শত্রুর কাছে বন্দী হয়ে তাঁরা মুক্তি-ফৌজে যোগ দিয়েছেন। বহুস্থানে আত্ম-সমর্পণের সংকল্প নিয়ে জাতীয় সৈন্যরা ফ্রণ্টে গেছে যুদ্ধ করতে। তাদের সংবাদ ও যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। তারা সেখানে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেছে। দেশকে, সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা তাদের দৃঢ়। জাতীয় মুক্তি-বাহিনী এমন কোন সর্ত্ত করেনি যে আর এক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর সাহায্য নেবেন—যার দরুণ জাতীয় স্বাধীনতা কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

জফি—ওরা কি তেমন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে মনে করো—যার ফলে এই বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ হতে পারে? ওরা এমন এক যন্ত্রের মধ্যে আটকে আছে, যাতে সব কিন্তু বুঝতে পারলেও ওদের উপায়ান্তর নেই। যে সময় ওদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়, সামনে মৃত্যুর করাল ছায়া যেদিন ওদের ব্যথাতুর ও বেপরোয়া করে দেয়—সে সময় নাচ গান মদ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। আবার তারা কৃত্রিম উত্তেজনায় মেতে ওঠে, যুদ্ধের মাদকতা ও রোমাঞ্চও খানিকটা এসে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদীর বেতন-ভোগী হয়ে যে সব জাতীয় সৈন্ত যুদ্ধ কচ্ছে,

তাদের তো আর আদর্শ বলতে কিছু নেই, পর-শাসন-পীড়িত হতাশ যুবকদের উদ্দাম মনের খানিকটা চরিতার্থতা হয় এই পর্য্যন্ত, এ ছাড়া আর বড় আশা করা যায় না। ওরা যে উপায়হীন।

সিরিন—জফি তুমি আজও ঐ কথা বলবে? সব বুঝেও বলবে, উপায়-হীন? ওরা ক্ষণেকের মধ্যে ছুনিয়ার রূপ ঘুরিয়ে দিতে পারে, বিশ্ব থেকে এই অমানুষিক অত্যাচারকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে—কেন তা ওরা বুঝবে না? ইস্তাহারে কেতাবে বক্তৃতায় কি প্রয়োজন ওদের? চোখের সামনে বিকট মৃত্যু ওদের জন্ম প্রতি মুহূর্তে ছু'হাত বাড়িয়ে আছে। যদি না মরে, তবে হয় পঙ্গু না হয় বিকলাঙ্গ অথবা উন্মাদ—এই তাদের জীবনের সার্থকতা! তবুও বুঝবেনা ওরা? আচ্ছা বলো তো জফি, একজন মানুষ সজ্ঞানে আর-একজন মানুষের পেটে বেয়নেট বসিয়ে দিলে তারপর সজোরে সেটা ঘুরিয়ে তাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বেয়নেট বার করে চলে এলো—এ কি? এ কি সভ্য মানুষ কল্পনাতেও আনতে পারে? বর্ব্বর যুগেও এমন বীভৎসতা হয়েছে বলে জানা নেই! অজ্ঞ মানুষ, জংলী মানুষের মনে এর চাইতে ঢের বেশী স্বত-স্ফুর্ত্ত বৃত্তির প্রকাশ ছিল, তারাও সম-অবস্থাপন্ন মানুষের প্রতি এমন বর্ব্বর আচরণ করতোনা। আর আজ শিক্ষার গর্ব্বে গগন ফাটিয়ে যে সব মানুষ বলছে, আমরা জগতের সভ্য মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, শিক্ষিত বিদ্বান, তারা করে চলেছে পশু অপেক্ষাও জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ! কিসের জন্ম কচ্ছে? কার জন্ম কচ্ছে? শুধু এইটুকু কেন ওরা বুঝবে না? কণামাত্র প্রাণের অনুভূতি ও সহজ বুদ্ধিতে নিলেই তো বুঝতে পারে।

জফি—সেই সহজ বুদ্ধি ও প্রাণের অতটুকু অনুভূতি বা হৃদয়বৃত্তি ক'জনের আছে সিরিন?

সিরিন—নিশ্চয় আছে জফি। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে

পারছি, এবারকার যুদ্ধে তারা বুঝবেই। এমন বিরাট ও জগৎ-জোড়া যুদ্ধ ইতিহাসে অদ্বিতীয় এবং কল্পনার অতীত, নির্ম্মম বিকট ধ্বংশ-লীলা তারা আর হতে দেবেনা। আমাদের প্রধান কাজ হবে প্রথমে কোনও একটা রণক্ষেত্রে বিদ্রোহ করা, এবং সে বিদ্রোহ ব্যাপক হয়ে বিপ্লবে পর্য্যবসিত হবে। বিশ্বের প্রত্যেক রণক্ষেত্রে তার পরিব্যাপ্তি হবে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সেই বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠবে, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে নিরন্তর বিপ্লব সুরু হবে। বিশ্বের সর্ব্বহারা শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি—সংগ্রামকারী যোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রে সংগ্রাম করবে, ক্ষমতা তারাই নেবে।

জফি—সিরিন, তোমাদের মতো ক'জন বিপ্লবী আদর্শের নিষ্ঠায় অচল থেকে তাদের সেই (Dynamic) ডিনামিক গতিশীলকে কর্ম্মের মধ্যে চালিত করেছেন বলে? বিরাট জনগণ আজ ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন—অন্যের চালনায় অস্তিত্বহীন।

সিরিন—আমরা মোটেই বিশ্বাস করিনা যে কেবল মাত্র মানসিক চিন্তার দ্বারাই বিপ্লব সম্ভব হবে, (subjective condition) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বাস্তব অবস্থাকে (objective condition) বিপ্লব-মুখী করবে, বৃহত্তর সমাজে ডিনামিক এনে দেবে—আমার মনে হয়, সে-দিন আগত।

সোফিয়া ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লে,—সিরিন জানো কটা বাজলো? আমায় চান করে একবার বাইরে যেতে হবে।

সিরিন—তাই তো, প্রায় চারটে বাজে, কাল তো তোমার যাওয়া হবেনা সোফি। শেরিয়া যে দুপুরে কমরেড এস-এর সঙ্গে সময় ঠিক করেছে—সেটা হলো ক্যাম্পের।

সোফিয়া—তাহ'লে তো থাকতে হবেই, তবে লোক পাঠিয়ে খবর দিই এখনি।

ভোরের দিকে ওরা একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, উঠতে বেলা হয়ে গেল। শেরিয়া নিজে এসে ঘুম ভাঙালে। সবাই তখন তাড়াতাড়ি উঠে এসে বসলো চায়ের টেবিলে। এখানে সবাই নিশাচর! ঘুমের ঘোর যেন তখনো কাটেনি। এডা এদের সকলকে চা পরিবেশন কল্লে।

শেরিয়া বল্লে—এডা তুমি সব সময়ই কিছু একটা কাজ করবার জন্য ব্যস্ত। এটা তোমার সঙ্কোচের লক্ষণ মনে হয়। এ রকম করো না তুমি। সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। এডা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তা বুঝে শেরিয়া আপন-করা ভাব নিয়ে বল্লে,—না এডা তুমি আমাদের যত্ন করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থেকো। আপন-জনের যত্ন পেতে আমরা সব সময় আগ্রহে প্রতীক্ষা করি। জানো সিরিন, আজ এডা বলেছে আমাদের জন্য দিনের বেলার খাবার নিজে তৈরী করবে।

সিরিন আর জকি খুব খুশী হয়ে বল্লে,—তবে আমরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে প্রস্তুত হয়ে নিই। ডাক্তার, তোমার তো আজ দিনের বেলা ছুটী,—না?

ডাক্তার—হ্যাঁ, এ সপ্তাহটা আমি নিশাচর।

দুপুরে এডার হাতের রান্না খেয়ে সকলে ওর প্রশংসা করলে খুব। এডা সারাদিনই একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। আজ দুপুরে ক'টা সূচের কাজ করেছে। টেবিল-ক্লথে বালিসের ওয়াড়ে চমৎকার করে ফুল তুলতে বসেছে। দেখে সিরিন বল্লে,—দুপুরে একটু বিশ্রাম করবে না?

এডা বিনম্র ভাবে বল্লে,—বিশ্রাম তো সব সময় করি। দুপুরে বসে একটু সেলাই কচ্ছি মাত্র।

একখানা সুন্দর টেবিল-ক্লথ তুলে নিয়ে সিরিন বল্লে,—ভারী সুন্দর সূচের কাজ হয়েছে এখানাতে।

এডা বল্লে,—এখানা ব্রিগেডিয়ার-সাহেবকে পাঠাবো।

সিরিন বল্লে,—আর ঐ সুন্দর বালিসের ওয়াড় দুটো?

এডা—এয়ার-ফোর্সের ক্যাপ্টেন মেগুেলিনার জন্য। তিনি একজন গ্রীক মহিলা। ব্রিটিশ ইউনিটে কাজ করেন, আমাদের হসপিটালে তাঁর কয়েক জন রোগী ছিল, প্রায়ই তাদের দেখতে আসতেন। সোফিয়া বেগমের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন, মেশেও আসতেন। আমার বন্ধু এঞ্জেলা ওর কাছে সব প্রথম আমার কথা জানায়। তারপর উনিই আমার সঙ্গে করে সোফিয়া বেগমের কাছে নিয়ে যান।

সিরিন এ পর্য্যন্ত এডার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনেনি, কেবল জেনেছে সামাজিক অপরাধে সে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু এবং ইউনিটের মেট্রনের অবিচার ও কৃত্রিম নৈতিকতার অত্যাচারে আশ্রয়হীন সহায়হীন হয়ে এই অবস্থায় বিতাড়িত। আর তার কথার ভাবে মনে হয়, সে যা করেছে বা যে ভাবে চলেছে, তার জন্য নিজেকে সহজ করে রেখেছে। অসঙ্গত কাজ কিছু করেছে বলে মোটেই মনে করে না, এবং সমাজের অবিচার তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করেছে, দমিয়ে দেয়নি। সিরিনের আগ্রহ হলো এডার সমস্ত ঘটনা জানবার। জন্য কিন্তু ভাবলে, থাক, আরও কদিন যাক—আজই প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। আমাদের আপন-করা মধুর ব্যবহারে ও নিজেই সব বলতে চাইবে।

দুপুরে সোফিয়ার কমরেডরা এলো মিটিং করতে। এই মিটিং-এ সিরিনেদের অংশ নেই, এবং তারা এদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

রাত্রে আবার সোফি আজকের মিটিং-এর ঘটনা বিস্তৃত ভাবে সিরিনদের কাছে বলতে বসেছে। সোফিয়া বল্লে,—আমাদের বহু কমরেড—যাঁরা সংগঠনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিলেন

গ্রেপ্তার হয়েছেন। যুদ্ধের কারণে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা চরমে উঠছে, তাদের মাগগী-ভাতা ও অন্যান্য দাবী নিয়ে যে-সব কমরেড ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতেন, তাঁরা ধর্ম্মঘট করানোর অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনকারীদেরও যথাসাধ্য সন্ধান করে গ্রেফতার করেছে। আর্ম্মির মধ্যকার কয়েক-জনের কোর্ট-মার্শাল হয়েছে এবং কয়েক জন সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে ক্যাম্পে আটক আছেন। পূর্ব্ব-সীমান্তের তিন হাজার জাতীয় সৈন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিছু নৌ-সৈন্য ক'খানা নৌপোত-সহ আত্মসমর্পণ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এরা সকলেই বিদেশীদের কাছে আত্ম-সমর্পণের অনতি-বিলম্বেই জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করেছে।

সিরিন—আমাদের দলের কিছু কি ঐ তিন হাজারের মধ্যে ছিল বলে জেনেছ?

সোফিয়া বল্লে,—কিছু তো নিশ্চয়ই ছিল, তবে সংখ্যা আজ বলতে পাচ্ছি না। সমস্ত বৃত্তান্ত নিয়ে ফ্রন্ট্ থেকে শীগগিরই লোক আসবে। নৌ-বহরেও কিছু নৌশ্রমিক আছে, যোদ্ধা নেই। ট্রান্সমিটারে যে সব খবর আসে, তাতে আমাদের জানবার মতো খবর যথেষ্ট থাকে। এখনও ঐ দিকটায় পুলিশের বেশী অনিষ্ট করবার সুযোগ হয়নি। সিরিন, পালাবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রান্সমিটারের সন্ধানে একটা বড় রকমের গ্রেফতার হয়েছিল। তোমার পালানোর সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর আমাদের দলের খোঁজ যেখানে পেয়েছে, সেখানে তছনছ করে সন্ধান করেছে। দু'চার জনকে গ্রেফ্তারও করেছে। কিন্তু বেচারারা নিরপরাধ। তোমার কোন সংবাদই তারা জানতো না। তাদের অপরাধ, তোমার সেই আগেকার লেখা কখানা বই তাদের পাঠচক্রে ছিল।

সিরিন—এ-পর্য্যন্ত তো দুঃসংবাদ দিলে অনেক, এখন কিছু ভাল সংবাদ দাও।

সোফিয়া—ভাল সংবাদ অনেক আছে,—সীমান্তে সৈন্যদের মধ্যে আমাদের কাজ ভাল ভাবে হচ্ছে, এবং আর একটা আশাপ্রদ সংবাদ—রেলওয়ে, ডক্, তেল-খনি এবং বড় বড় তিনটি লোহার কারখানাতে, যেগুলিতে আজ শুধু যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হচ্ছে,—সেই সবগুলিতে আমাদের ইউনিয়ন শক্তিশালী। সাম্রাজ্যবাদী এবং ষ্টালিন-পন্থী সাম্যবাদীদের প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও আমাদের দল সংগঠন করতে সমর্থ হয়েছে। যুবকদের মধ্যে যে সব সংগঠন, তা একেবারে নির্জীব।

সিরিন—আমাদের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সহায়তা কচ্ছে ঐ সব ষ্টালিন-পন্থী তথাকথিত সাম্যবাদী। জনগণ সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, জাতীয় মুক্তি-ফৌজদেরও সহজেই বুঝতে পারে এবং সর্ব্বনাশের পথ থেকে বাঁচে। কিন্তু ঐ যে সর্ব্বনেশে সাম্যবাদের বুলি কপচে সাম্রাজ্যবাদী আর সুবিধাবাদীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার ফন্দি এঁটে ষ্টালিনের ধামা-ধরারা ক্ষতি করে চলেছে, তাতে অনিষ্ট হচ্ছে সব চাইতে বেশী।

সোফিয়া—কিন্তু মজা কি জানো সিরিন, পেটী-বুর্জ্জোয়া ঘরের ছেলে-মেয়েরা কিন্তু ওদের ডেমাগগিতে খুব মশগুল। দলও বাড়িয়েছে, কলমী-শাকের দলের মতো। দেশের বড় লোকের ফ্যাশনেবল্ ঘরের ছাত্র ছাত্রী ও যুবকরা পলকা ভাব চরিতার্থ করে ওদের দলের ডগমা নিয়ে বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, কখনও কখনও হলের মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়ে ওদের সাম্যবাদকে জিইয়ে রেখেছে। ওদের দ্বারা যে ক্ষতি হচ্ছে, তা পূরণ করতে জনগণকে অনেকখানি মূল্য দিতে হবে।

জকি বল্লে,—সোফিয়া, সেদিন তুমি রাগ করেছিলে আমি বলেছিলাম

আমি এক-পক্ষে ভাল মনে করি—কারণটা সেদিন পরিষ্কার করে বলতে চাইনি তোমার রাগ হবে বলে। আজ তোমাদের আলোচনায় মনে পড়ে গেল আবার—আমি হিটলারকে সোজা বলি ঐ কারণে, যে সে যা চায় তা স্পষ্ট করে, চায়; তার কাজে সবাই তাকে দৈত্য বলে বুঝতে পারে। সে ইয়োরোপ তথা বিশ্বের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হতে চায়, বিশ্বের শান্তি আনবো, বা গণতন্ত্রের বড় কথা বলে না, বলে new order. ঐ ধরণের শত্রুকে সংগ্রামে আঘাত করবার যথেষ্ট সুযোগ, কিন্তু ঐ যে দু'মুখো সাপ, অদ্বিতীয় ভণ্ড চার্চ্চিল রুজভেল্ট—ওদের মতো গণশত্রু এবং দুজনের দুই-ভাবের অটুট সাম্রাজ্যলিপ্সা সত্ত্বেও মুখে যে শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণের কথা বলে, ওদের মতো জল্লাদ দুনিয়ায় কটা আছে? হিটলার ওদের মতো প্রতারক বা ভণ্ড নয়।

সিরিন— এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বলবার কিছু নেই, হিটলারের বলের দম্ভে মানুষের সংজ্ঞা ফিরে আসবে সহজে।

সোফিয়া—সিরিন, আমি ভাবি, কি করে সম্ভব হলো?

সিরিন—কি সম্ভব হলো?

সোফিয়া—বলতে আমার একটু বাধছে—জফির উচ্চশিক্ষিত অন্তর এবং লণ্ডনের সাম্যবাদে আড্ডায় যোগ দেওয়া শিক্ষা—

সিরিন—লণ্ডনের বড়লোকের ছেলেমেয়েরা সাম্যবাদের আড্ডায় তর্ক আলোচনা বেশ ভালই জমায় সোফি। আমি ওদের সে আড্ডায় গেছি। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তর্ক করতে হয়। জফির অবশ্য পড়াশুনা ছিল ভালই। উল্টো পথে যাবে বলে তো আর পড়েনি, আধুনিকতায় অগ্রণী দর্শনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আয়ত্ত করতে পারায় শিক্ষাভিমান ওকে সাম্যবাদী দর্শনে শিক্ষিত করে ছিল, কিন্তু মন ও হৃদয়-বৃত্তি একটা ধোঁয়াবাদের আকর্ষণে যুক্ত ছিল, তাই ঘুরে উল্টো পথে চলতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু অন্তরের লুকানো স্তরে চাপা-পড়া বিপ্লবী চেতনা ছিল, যদিও dynamic কাজ করেছে বিপরীত!

সোফিয়া—ঐ যে আমাদের থিওরী, বাস্তব অবস্থায় পড়ে বিপ্লবী হতে পারে। কিন্তু সিরিন কতই তো দেখছি বাস্তব অবস্থা যখন চরমে উঠে সংঘাত কচ্ছে, তখনও মানুষ চলেছে শেষ হয়ে যেতে, লুপ্ত হয়ে যেতে। বিদ্রোহ বা বিপ্লব তাদের তো সজাগ কচ্ছে না!

সিরিন—এটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের একান্ত সহায়ক, সে অবস্থায় কি শুধু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব? তা হলে তো নেতা বা কর্ম্মপন্থার নির্ভুল সৃষ্টির জন্ত এত কাণ্ড করতে হতো না। এ-কথা ভাল করেই বোঝো এবং অকাট্য যুক্তি দিয়ে অন্যদের বোঝাও, তবুও মাঝে মাঝে প্রশ্ন এসে মনে ভীড় করে।

সোফি—ঠিক তাই। আচ্ছা সিরিন, আরসাদের সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

সিরিন—ওর অনেক গুণ আছে যা অনন্যসাধারণ, কিন্তু সময় সময় ও বড্ড বেশী ভাব-প্রবণ হয়ে পড়ে, কাজেই ওর জ্ঞান, শিক্ষা, উদারতা, যুক্তি সমানভাবে কাজ করতে পারে না। বিপ্লবী মনোভাবও আছে। ছাত্রজীবনেও অনেক কিছুই করেছে—অবশ্য জাতীয়তা-বাদের আদর্শ নিয়ে।

সোফিয়া—আমার মনে হয় সিরিন, তুমি ওর প্রতি কম মনোযোগ দিয়েছিলে। নাহলে হয়তো—

সিরিন—সোফি, তখন ওর মনকে ঘোরাবার মতো মাদকতা একমাত্র যুদ্ধ বা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওর সে আঘাত আমি বুঝেছিলাম—ওর গাম্ভীর্য্যকেও সীমাছাড়া করেছিল।—এই পর্য্যন্ত বলে স্তব্ধ।

সিরিন বললে,—তোমার চেষ্টা সফল হতে পারে, ভাব তো জমিয়েছ বেশ!

সোফিয়া—হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে ভাব জমাবার একটুও অসুবিধা নেই সিরিন, ওদের এ-সময়ের মানসিক অবস্থা তো বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে ভাব-প্রবণতায় পূর্ণ, কিন্তু তাতে কি আসল জায়গায় পৌঁছুতে পারা সম্ভব হবে? চেষ্টা আমি আপ্রাণ করবো, অত-বড় অফিসার একজন,—কি বলো, জফি?

জফি—তোমাদের মত শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, প্রাণময়ী সুন্দরীদের প্রতিভায় ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে একটুও অসুবিধা হবেনা সোফি।

সিরিন—থাক্ জফি, তোমার স্তুতি। সোফির গর্ব্ব একেবারে উপছে পড়লো চোখ-মুখ দিয়ে!

সোফি—সিরিন, তোমার হিংসে করবার একটুও কারণ নেই তাতে, স্তুতির সবটাই বোধ হয় পৌঁছুলো—

সিরিন—সোফি, আজ আমায় একটু ঘুমোতে হবে,—কাল দিনের বেলায় অনেক কাজ রয়েছে। কাল রাত্রে মিটিংএর প্রস্তুতি—

সোফিয়া—তবে তুমি ঘুমোও, আমরা অকেজো দু'জনে গল্প করি। তোমার অসুবিধা হবেনা, আলোটা প্রায় আধনেভা, সম্পূর্ণ ভাবেই নিভিয়ে দিচ্ছি।

সিরিন ঘুমোতে গেল। জোড়া খাট দু'খানা সরিয়ে নিয়ে ওরা দুজনে আরম্ভ করলে মার্কস্-বাদের অর্থনৈতিক আলোচনা।

জফির সঙ্গে আলোচনা করতে সোফিয়ার অত্যন্ত আগ্রহ। সিরিনকে কতদিন বলেছে, তোমার ওপর হিংসে হয়—কাজের ভিড়ে এক-বছর বেশীক্ষণ বসে আলোচনা করবার অবসর হয়না—কমরেডদের সঙ্গে কাজ আর পদ্ধতি সংগঠন-ব্যবস্থা—এই সব আলোচনাতেই কাটছে।

সোফি বল্লে,—জফি, তুমি সত্যি খুব চমৎকার সাথী এবং সময় পেয়েছ এই মহৎ আদর্শ আর দর্শনের আলোচনা করবার—এর পরে তুমি আদর্শ

কর্ম্মী ও শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে কাজ করতে পারবে। আমি সিরিনের কাছে শুনি, 'দিনের মধ্যে তিন-চার ঘণ্টা মাত্র তোমরা অন্য কাজে লাগিয়ে সর্ব্বদা লেখপড়া নিয়ে আছো। সমর-বিজ্ঞানের যে সমস্ত বই তোমাদের দুজনকে দিয়ে যাই তা তোমরা যে ভাবে পড়ছো এবং তুমি সিরিনের সমর-শিক্ষার মাষ্টারী করো, আমারও প্রয়োজন কিছুদিন তোমার কাছে সামরিক শিক্ষা নেওয়া। সে-অবসর আমি অল্পদিনের জন্য হলেও করে নেব।

জফি—আমার খুব ভাল লাগবে সোফি, তোমাকে শেখাতে—সিরিনের সঙ্গে যে ভাবে পড়ি এবং শেখাবার সময় ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধি আগ্রহ বুঝে আমার উৎসাহ সহস্র গুণে বেড়ে যায়। তুমি সময় করে নাও, আমার একান্ত আগ্রহ, তোমায় শেখাবো।

পরদিন সন্ধ্যার পর তিনজন কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এসেছেন, একসঙ্গে আহার শেষ করে আলোচনা সুরু হয়েছে। জফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে সোফিয়া—ইনি আমাদের কমরেড—এইটুকু পরিচয়ের শুধু প্রয়োজন দেখা গেল।

সিরিনের লিখিত বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থা-লিপি পড়া হল—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিস্তৃত-ভাবে বিশ্লেষণ করে নিজ-দেশের কার্য্যক্রম কি ভাবে বিপ্লবের ধারায় পরিচালিত করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও সতর্কতার সঙ্গে লেখা—আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবস্থাকে বিচার করেছেন তাঁদের ধনতন্ত্রবাদী স্বার্থে, যে-স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় ও আশ্রয়ে নির্ভর করে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক-বাক্যে সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধের বিরোধিতা

কচ্ছে। কিন্তু তাদের কর্ম্মপন্থা ও বিপ্লবী ধারা সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিপ্লব-মুখী নয়। বহু দল মনে করে, দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত সংগ্রাম ভিন্ন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সম্ভব নয় এবং সেই সব দল প্রতীক্ষা করে বসে আছে জাতীয়তা-বাদী নেতাদের সংগ্রাম-ঘোষণার জন্য। জাতীয়তা-বাদীদের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত দল—দক্ষিণ পন্থী এবং বাম পন্থী জাতীয়তা-বাদী। দক্ষিণ-পন্থী নেতারা দেশীয় ধনতন্ত্র-বাদীদের মুখ-পাত্র থাকায়, ধনিক-স্বার্থ বিপন্ন করে সম্পূর্ণ ভাবে সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদ চায় না। সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে আপোষ-রক্ষার মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান। এই উপনিবেশের ধনতন্ত্র-বাদীরা সাম্রাজ্য-বাদীর অর্থে পুষ্ট, সাম্রাজ্য-বাদীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদে দেশীয় ধনতন্ত্র-বাদীদের এবং দেশীয় রাজা ও জমিদারদের সর্ব্বনাশ-আশঙ্কায় তারা প্রাণপণে চরম-সংগ্রামে বাধা দেবার জন্য দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা দৃঢ় করতে সর্ব্ব-রকমে সাহায্য কচ্ছে এবং নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য নিরক্ষর জনগণকে বহুবিধ প্রতিক্রিয়া-পূর্ণ কর্ম্মপন্থা ও ধ্বনি দ্বারা সহজ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে সামান্য একটু চোখ-রাঙ্গানি দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদীর কাছে সুবিধা আদায় করে আপন ধনতন্ত্র-স্বার্থ রক্ষা করবার ব্যবস্থা কচ্ছে। বাম-পন্থী জাতীয়তা-বাদীরা রাজনৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার কোন সুযোগ পাননা। তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করবার নীতি এবং বৈপ্লবিক চেতনা আংশিক ভাবে আছে। দেশীয় ধনতন্ত্রবাদীরা এই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না; মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবি পেটী-বুর্জোয়া দল এই বাম-পন্থী দলের সদস্য ও সভ্য। এদের নেতারা সামরিক বল ও দেশের জনগণের সাহায্যের প্রয়াসে প্রস্তুতি। এঁরা সম্পূর্ণ ভাবে সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা, অধিকার করবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী হবে তাদের সংগ্রামের

সাহায্যকারী রাষ্ট্র-ক্ষমতা-অধিকার সামরিক ক্ষমতায় আসবে এবং তার পর ঐ ধনিক-শ্রেণী তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। মুসোলিনীর প্রথম ক্ষমতা পাবার পরের অবস্থা এরা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রথম-ভাগে আশা করেন। আয়ারের ডি ভ্যালেরার সংগ্রাম এদের মনে সাড়া জাগায়। দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে এরা বিদেশীর সাহায্য নেবেন, মনস্থ করেন; এবং এই যুদ্ধের সময় শত্রুর-শত্রু হিসাবে তাঁরা অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদীর সাহায্যে সর্ত্ত বা চুক্তি করা রাজনৈতিক বিধি-বহির্ভূত মনে করেন না। যুদ্ধের প্রয়োজনে শত্রুকে সামরিক ঘাঁটী সাময়িক ভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে এবং সাময়িক ভাবে বাণিজ্য-চুক্তি বদ্ধ-হয়ে দেশের ও জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক ক্ষমতা অর্জ্জন করতে এদের রাজনৈতিক কূট-সম্পর্ক এঁরা মানেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পন্থী ও বাম-পন্থীদের রাজনৈতিক মতানৈক্য প্রকট হয় এবং দুটি দল সম্পূর্ণ-রূপে বিভক্ত হয়ে যায়। বাম-পন্থী জাতীয়তা-বাদী নেতা সাম্রাজ্য-বাদীর বেড়াজাল থেকে ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করে রাশিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন—সেখানে ব্যর্থ হন। ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-বাদীর সঙ্গে বিরোধ করতে রাশিয়া সম্মত হয় না। শত্রুর-শত্রু আর এক সাম্রাজ্যবাদীর সাহায্যে তিনি দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সামরিক সাহায্য গ্রহণ করেন। নিজ-দেশীয় সাম্রাজ্য-বাদীর তরফে যে সব জাতীয় সৈন্য ও মধ্য-অফিসাররা যুদ্ধ করছিল, তারা যেদিন ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-বাদীর হাত থেকে অন্য সাম্রাজ্য-বাদীর অধিকৃত এলাকায় বন্দী হয়,—বাম-পন্থা জাতীয়তা-বাদী নেতা তখন তাঁদের নিয়ে জাতীয় মুক্তি-ফৌজ-বাহিনী গঠন করেন। তাঁর সর্ব্বাধিনায়কত্বে সে বাহিনী গঠিত হয়। আজও তিনি সম্পূর্ণ আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছেন—সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্কট-কালে ঐ সৈন্য-বাহিনী এবং

সমরাস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্য-বাদীকে উচ্ছেদ করতে ঠিক সময়ে আসবেন। সাম্রাজ্য-বাদীর এত বড় কঠিন প্রাচীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ভেদ করে তাঁর বিদেশ-গমনে বাম-পন্থী জাতীয়তাবাদীদের উপর যথেষ্ট কড়া আইন, কারাগার প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থা হয়। যেখানেই তারা সংগ্রাম বা আন্দোলন করবার চেষ্টা করেছে, দমন-নীতির দ্বারা তা বন্ধ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে রেডিও-যোগে এবং নানাভাবে বাম-পন্থী নেতা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে তাঁর মত পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর সহকর্মীদের কর্ম্মপন্থা জানাচ্ছেন। কিন্তু দেশের অবস্থা আজ অবর্ণনীয়, কোথাও কোন সাড়া নেই, সাম্রাজ্য-বাদীর স্বৈরাচার ও দুর্নীতিতে জনগণ ত্রাসিত ও শঙ্কিত; বিপ্লবী কর্ম্মপন্থা নিয়ে যারা কাজ কচ্ছে, তারাই আজ দমন-নীতির কবলে।

কমরেড "এস"—কমরেড, জনগণের অবস্থা ও মনোভাব সম্বন্ধে তুমি যে সব তথ্য সংগ্রহ করে ইস্তাহার পাঠিয়েছ, তাতে বিশেষ ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বাম-পন্থী জাতীয়তা-বাদী নেতাকে আমরা যে সংগ্রামের পথে সমর্থন করে আসছি এবং মুক্তি-ফৌজের সাহায্যের জন্য যে নীতি অনুসরণ করেছি, তাতে মত-বিরোধ প্রকট হয়েছে। আমাদের দলের মধ্যে যে সব আলোচনা ও মতানৈক্য ঐ বিষয়ে হয়েছে, তা তুমি সবই জানো—এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ও পরিষ্কার ভাবে ইস্তাহার দেওয়া প্রয়োজন।

সিরিন—আমার লেখার মধ্যে আমি যথাসাধ্য পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। সেই অংশ একটু পড়ে শোনাবো। উপরোক্ত বিশ্লেষণ আমি সংক্ষেপে পড়লাম। তোমরা আলোচনা করলে যথারীতি সংশোধন বা সংযোগ করবো। আজ রাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ পড়বার সময় হবেনা তবে আলোচনা করবার মতো অংশগুলো আমি পড়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, আমাদের দলের নীতি একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার—সাম্রাজ্য-বাদীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনে দেশের যে সব রাজনৈতিক বিপ্লবী দল সংগ্রাম করবে, তাদের সঙ্গে আমরা দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য বিরোধী সংগ্রাম করবো। We will fight side by side stride together. আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সংগ্রামের ধারা সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের দলের নীতি-অনুসারে থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে আমরা মিলিত হবো। যে সব সংগ্রামকারী দলের সঙ্গে নীতির মিল নেই, সে মিলন সুবিধাবাদীর বশ্যতা-স্বীকার নয়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সময় আর এক শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিজেরা উলুখড়ের মতো আত্মাহুতি দিতে যাবোনা। তারা যে সময় দেশের কৃষক, শ্রমিক, পথবিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত, কপর্দ্দকহীন যুবকদের সংগ্রামে আহুতি দেবার জন্য বড় বড় কথা বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিয়ে সংগ্রাম করবে, আমরা সেই কথাকে কাজে লাগাবার জন্য জনগণকে সচেতন করে সংগ্রামে যোগ দিতে বলবো। বলা নয় শুধু, আমরা আমাদের সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত পেটীবুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংগ্রামকারী রূপে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে পাঠাবো। জাতীয় মুক্তি-ফৌজের মধ্যে আমাদের দলের যাঁরা আছেন, তাঁরা আদর্শবাদে সম্পূর্ণ দৃঢ়, শ্রেণী-স্বার্থের সচেতনতা তাঁদের যথেষ্ট। ইস্তাহার স্বাক্ষর লিপি, প্রতিজ্ঞা-লিপিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তাঁদের অবস্থা এবং ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তব রূপ ধরে দেওয়া আছে। কমরেড্, সময় খুব সঙ্কট—সাধারণ বুদ্ধির লোক চোখের সামনে দেখতে পাবে জাতীয়তা-বাদের পরিণাম কি! এবং জাতীয়তাবাদ-প্রতিষ্ঠা মানেই আর এক বিকট যুদ্ধের ভিত গাঁথা,—সেদিন তারা জাতীয়তা-বাদের রোমান্সে বিভ্রান্ত হবেনা—(as fuel) জ্বালানী

কাঠ বা পিলসুজ হয়ে আলো বহন করে চিরদিন অন্ধকারে থাকবার জন্য এমন করে মরতে যাবো না।

কমরেড "এস্"—মুক্তি-ফৌজের সঙ্গে আমাদের যোগদানটা আর একটু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তারা এখনও জানে, একমাত্র দেশকে স্বাধীন করাই তাদের আদর্শ; সে স্বাধীনতার রূপ হলো সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদ এবং জাতীয়তা-বাদীর নেতৃত্ব।

সিরিন—জাতীয়তা-বাদীর নেতৃত্ব বলতে তারা অতি সহজেই বুঝতে পারবে কোন শ্রেণীর নেতৃত্ব হলে জাতির সমস্ত জনগণ মুক্তি পাবে। আজকের দিনে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের যে কোন মানেই হয়না তা বেশ পরিষ্কার। সে-কথা ধনতন্ত্র-বাদীরাও বিশ্বাস করে, বোঝে, এবং লিপিবদ্ধ করে, কাজেই তা বুঝতে অসুবিধা হবেনা। চায়নার কমিউনিষ্ট পার্টি যেমন জাতীয়তাবাদী নেতা চ্যাং-কাইসেকের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার চরম প্রতিফল পেলে, সে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ চোখের সামনে, কাজেই আমাদের দলের সৈন্যরা বা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়তা-বাদীর নেতৃত্ব স্বীকার করবে না। মুক্তি-ফৌজের মধ্যে গিয়ে সংগ্রাম করবার সামরিক পদ্ধতি বা সামরিক আজ্ঞা রণক্ষেত্রে মানতে হলেও তাদের নীতি বা আদর্শের দলীয়-নেতৃত্ব তারা মানবে না। অবশ্য সামরিক সর্ব্বাধিনায়কত্বের ক্ষমতা অসীম, কিন্তু তার রাজনৈতিক দিকটা পরিষ্কার হবে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সময়, এবং সে সময় দেশের পীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত জনগণের শক্তিতে সংগ্রামে জয়ী হয়ে যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আসবে, অধিকার পাবে, সে সময় নির্য্যাতিত শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র গঠন না হলে দু'দিনের মধ্যে তাসের ঘরের মতো তা ভেঙ্গে পড়ে যাবে। আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের দৃঢ়তা, আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণ ভাবে শক্তিশালী এবং বৃহত্তর করা। রাশিয়ার মিলিটারী কমিটিতে (Military Revolutionary

Commitee) বলসেভিক সৈন্যরা, মধ-অফিসাররা যে ভাবে কাজ করেছিল, যে ভাবে বল্‌সেভিকরা বিশেষ সামরিক কমিটি গঠন করেছিল (Special military organisation), তার চাইতে আরও সচেতন হয়ে সামরিক সংগঠন করতে হবে। আজকের এই অভাবনীয় যন্ত্র-সমর-চালনা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৌশল বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করে অতিশয় সাবধানে কাজ করতে হবে,—বিপদ যথেষ্ট, প্রতি পদে অসংখ্য বাধা, তা জেনেই চলতে হবে।

কমরেড "এস্"—আন্তর্জাতিক সংযোগ বাস্তব ক্ষেত্রে পাওয়ার সুবিধা উপস্থিত বিশেষ নেই তবে আন্তর্জাতিক ক্রিয়ার সঙ্গে বৈপ্লবিক যোগ-সূত্র করার সুযোগ আছে। সাম্যবাদী বিপ্লবী সঙ্ঘের কাছ থেকে মেটিরিয়াল সাহায্য পাওয়া যাবে না, তবে নৈতিক সাহায্য আমরা এখন যথেষ্ট পাচ্ছি।

সিরিন—আমাদের নিজের দেশের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দলের সাহায্য পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন—কিন্তু তোমাদের কাছে যা জানতে পাচ্ছি, তাতে হতাশা জাগে খুব। পলিটিকাল মর‍্যাল আর রিভলিউসনারি সিন্‌সিয়ারিটি যদি না থাকে, তবে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও সম্ভব নয়। তোমরা আবার সে চেষ্টা করো। প্রতিদিনই রাজনীতির অবস্থা জটিলতর হচ্ছে, প্রত্যেকের সাহায্য প্রত্যেকের প্রয়োজন। এটা যদি কলমের আঁচড় ছাড়িয়ে কাজে পরিণত হয়, তবেই ফল হবে শুভ।

কমরেড্ "এস"—হ্যাঁ, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কৃতকার্য্য হওয়ার আশা কম,—আজও যে রকম মনোমালিন্য এবং ক্ষমতা পাবার লোভ যে রকম দেখছি—

সিরিন—যাক্, তোমাদের সময় বা শক্তির অপব্যবহার না করে যদি

সম্ভব হয়, চেষ্টা করো। আমার মনে হয়, তোমরা আরও ব্যাপক ভাবে সামরিক-সংগঠনে শক্তি এবং সময় দিলে ভালো হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির যে তিনজন সদস্যের ওপর ও-কাজের ভার আছে, তারা তেমন সময় পাচ্ছে না।

কমরেড্‌ "এস্‌"—ঐ দিকের একটা বড় ভার তো তোমার ওপর। লেখার কাজ কাউকেই করতে হয় না, আমরা শুধু সংবাদ আর তথ্য পাঠিযে নিশ্চিন্ত। প্রচারের কাজ লেখা-পড়ার মধ্যে সবটাই তো তোমার আছে—আমরা প্রুফ দেখে ছাপিয়ে দি মাত্র। জেলে বসেও প্ল্যান প্রোগ্রাম তুমিই চালিযেছ, এখন তো কথাই নেই। অদৃশ্য দেবীর আকাশ-বাণীর মতো আমরা মতামত পাচ্ছি। সদস্য বাড়ানোর কথা উঠতেই পারে না বরং কবে যে কে অদৃশ্য হবেন পুলিশের কৃপায়, সেই কথাই ভাবতে হয়। বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে গেলে সব চাইতে মুস্কিল হয়। ক'দিন আগে যে বিদেশী কমরেড্‌রা এসেছেন, তাঁদের কাছে যাবো স্থির করেছি, তাঁরা আবার সবাই এক জাযগায় নেই। ছদ্মবেশে যাবার সুযোগ করতে কেটে গেল আজ দশদিন। একজন স্পেনীশ্‌ কমরেড এখানে কাজ কর্চ্ছেন, জানো তো?

সিন্নিন—হ্যাঁ, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। যদি সম্ভব হয়, সোফি তাকে আনবে বলেছে আমার কাছে। কজন ইংরেজ, ইতালিযান এবং গ্রীকও এসেছেন শুনলাম। ওঁদের সঙ্গে চিঠির মারফৎ আমি পরিচিত, তবে এখন দেখা করতে চাই না। সামরিক-সংগঠনের অসুবিধা যতই হোক, সেদিকে আমাদের নজর বেশী দিতেই হবে। বিভিন্ন স্থানের ইউনিয়ন-গঠনের জন্য একটা প্রোগ্রাম দিলাম—তোমরা পরামর্শ করে যথারীতি ব্যবস্থা করো। দলের মধ্যে যে কয়েক-জনের মতানৈক্য হয়েছে, তাঁদের এখন যুক্তি দ্বারা বোঝানো সম্ভব না হলে

একটু নির্লিপ্ত থেকো। সময় এলে বাস্তব অবস্থার মধ্যে তাঁরা বুঝতে পারবেন।

কমরেড্ "এস্"—নীতিগত পার্থক্য কোথাও নেই, খুঁটিনাটী দু-চারটে লাইন নিয়ে কজন মাত্র দ্বিধা কচ্ছেন। তবে কাজ তাঁরা দলের সমর্থিত পন্থাতেই করে যাচ্ছেন, নিষ্ঠারও অভাব নেই।

সিরিন—সেজন্য আমি চিন্তিত নই। এখন যে অবস্থার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, সেই জন্যই কার্য্য-স্বচীর বেলায় ঐ সব অহেতুক প্রশ্ন ওঠে। বিপ্লব আরম্ভ হলে কাজ করা বা ঠিক পথ ধরে চলা কঠিন নয় কিন্তু এই রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিপ্লবী কাজ করা আর বিপ্লবকে গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এ কথা বুঝতে অনেকেরই ভুল হয়। মনে হয়, বুঝি কর্ম্ম-স্বচীতে ভুল আছে। সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য যে প্রোগ্রাম তৈরী হয়েছে, সে প্রোগ্রাম মেনে যথেষ্ট শক্তি এবং উদ্যম নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। এখন যে ভাবে কাজ চলেছে, তাতে সম্ভব হবে না। দ্রুত এগিয়ে যাওয়া দরকার,—সেজন্য কিভাবে কাজ করতে হবে, তার সবিশেষ নির্দ্দেশ রইলো।

এ সব আলোচনায় রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো, সোফিয়া বল্লে,—কমরেডদের চা খাইয়ে এখনই বিদায় দিতে হবে, সূর্য্যের আলোয় ওঁদের বার করা চল্‌বে না সিরিন।

চা খাওয়া শেষ করে কমরেড্‌রা বিদায় নিলে।

সোফিয়া বল্লে,—আজ ভোরে আমিও কদিনের মতো বিদায় নেব।

জফি প্রশ্ন কল্লে,—কতদিন পরে আবার দর্শন মিলবে জানতে পারি?

সোফিয়া—তা তো আমারও জানা নেই জফি।

—জফি রকমফের পোষাকে তোমার আসা-যাওয়া বেশ ইণ্টারেষ্টিং।

সোফি বল্লে,— পোষাক-বদল, ছদ্মবেশ—এ যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে!

জফি—যারা দুনিয়ার অস্বাভাবিক অবস্থা তো আজ সাধারণের কাছে স্বাভাবিক এবং সহজ হয়ে এসেছে, পোষাকটাও তেমনি!

কদিন কেটে গেছে। এডা শুয়ে আছে বিছানায়। সিরিন এডার সদ্যজাত বলিষ্ঠ শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে তার শয্যার পাশে। শিশুর মুখের পানে অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভাবছে—অতীত জীবনের কত কথা এসে মনে জমা হয়েছে, কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি। এমন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন যেন কোন্ স্বপ্নে ডুবে-যাওয়া ভাব!

ঘরের দরজার কাছে এসে জফি দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এ দৃশ্য দেখ্‌ছে—এডা ঘুমিয়ে আছে। ঘরে এসে সিরিনের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে জফির মন চাইলো না। এমন মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি এর আগে জফি দেখে নি,—সিরিনের মাতৃত্ব-ফোটানো মূর্ত্তি জফিকে মুগ্ধ করলে। র‍্যাফেলের অঙ্কিত ম্যাডোনার ছবির সঙ্গে মেলাতে চাইলো মন। এ তো বাইরের রূপ নয়, সিরিনের মাতৃত্বের বিকাশ সহজ হয়ে ফুটেছে এবং স্বতস্ফূর্ত্ত হয়েছে। সিরিনের অতীত কিছুই জানে না জফি, আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সিরিনের মাতৃত্ব—অতীত দিনের সিরিনের নিজস্ব রূপ। মনে হলো এখনি শোনে সিরিনের অতীত,—এখন আর কোন বাধা নেই! কেনই বা জানবে না অমন বিচিত্র অভিনব জীবনের কথা? কিন্তু না, সে বেদনাময় স্মৃতি যদি সিরিনকে ব্যথাতুর করে? থাক অতীত! যেদিন আপনা হতে প্রকাশ হবে, সেই দিনই জানবো।

শিশু ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠলো - সিরিনের চমক ভাঙলো—গভীর শান্ত প্রদীপ্ত মুক্তার মতো দুই চোখে জলের ফোঁটা।

জফি অস্থির হয়ে উঠলো, কি এমন গভীর ব্যথা! ধীরে ধীরে এসে সিরিনের মুখখানি বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে—জফির অন্তরের স্পন্দন তার সমস্ত দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। শিশু একবার কেঁদে কোলের নাড়া পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এডা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জফি সিরিনের মুখ খানি তুলে নিয়ে প্রাণের একান্ত আবেগে চুম্বন করলে, বল্লে,—সিরিন, তোমার এ অভিনব মূর্ত্তি তো আমি আগে দেখিনি! তোমার এই মায়ের রূপ ভুবন ভুলিয়ে দিয়েছে। কোন্ ব্যথার স্মৃতি তোমায় এত-খানি আকুল করেছে সিরিন? এত গভীর ব্যথা তোমার বুকে—আমি এত কাছে এসেও তা বুঝতে পারিনি!

জফি সহজ থাকতে পাচ্ছেনা। সিরিন তার অধীরতা বুঝতে পারলে অন্তর দিয়ে, মাথাটা জফির বুকের ওপর নুইয়ে দিয়ে বল্লে—কেন বলিনি জফি? তাকে তো আজ দেখতে পাবোনা,—এখন এই আত্মগোপনের অবস্থায় তাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়,—কী অসহ্য যাতনা পেয়েছি, যখন সে পারিজাতের মতো ফুটে উঠেছিল আমার বুকে! সেদিন নির্ম্মম হাতে তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

সিরিন আর বলতে পারে না, বুক-ফাটা ব্যথায় কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। জফি স্থির হয়ে বসে আছে, কি সান্ত্বনা দেবে, কি করবে, বুঝতে পাচ্ছে না। সময় কেটে চলেছে। এমন ভাবে অশ্রু-ঝরানো বুক-ফাটা বেদনা জফি কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। আশ্চর্য্য নারী সিরিন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—দু'জনের এই ভাবে কতক্ষণ কাটলো। এডার ঘুম ভেঙ্গেছে—সিরিনের দিকে চেয়ে দেখলে, জফিও প্রস্তর-মূর্ত্তির

মতো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে সিরিনের মুখ দেখা যাচ্ছে না। এডা বল্লে,—একটু জল খাবো।

শিশুকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সিরিন ফিডিং-কাপে করে জল খাওয়ালো। জফিকে বল্লে;—বসো তুমি ওর কাছে, আমি ওর জন্ত দুধ গরম করে আনি।

জফি তখনও চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন।

একটু পরে সিরিন দুধ গরম করে এনে এডাকে খাওয়ালে। জফিকে এতখানি বিমলিন এবং চিন্তার ভারে কাতর দেখে সিরিন ভাবলে, আমাকেই দিতে হবে সান্ত্বনা! ও জানেনা কিছুই—কিন্তু অন্তরে গভীর ব্যথা পেয়েছে আমার বেদনার আঘাতে। কোনদিন ও প্রশ্ন করেনি আমার অতীত জীবন,—কতদিন আবেগ-উচ্ছ্বাসে যখন বলেছি—জফি, জীবনে ভালবাসার এমন অতলান্ত-সাগরের সন্ধান কখনও পাই নি,—ভালবাসা দিযেছি যেখানে, সেখানে পেয়েছি ব্যর্থতা, পেয়েছি ছলনা! সে সময় তো কোনদিন প্রশ্ন করেনি! আমার অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চায়নি! মনে পড়লো অনভিজ্ঞ সরল মনের স্বতস্ফূর্ত বৃত্তি থেকে প্রথম-যৌবনের উদ্দাম মনে যে সাড়া জেগেছিল, সে কি ভালবাসা? না, শুধু চোখের তৃপ্তি? আবেগের মাদকতা? অনভিজ্ঞ মনে ভালবাসা সম্ভব নয়.—মাটির প্রতিমা জলে ধুয়ে যায়, ঝড়ে পড়ে যায়। আজ জীবনের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে সে অভিজ্ঞতা হয়েছে! মানব-মনের প্রকৃত শিক্ষা ও গভীরতার মধ্যে যে বৃত্তি সংযত প্রাণের সম্পদ, সেই সম্পদ, সেই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশে ভালবাসার সত্য রূপ ফুটতে পারে! জফির পূর্ণ যৌবনের পরিণত গভীর ভালবাসা পেয়ে সে বুঝেছে, ভালোবাসা কি! অতীতে যা ছিল, তা শুধু উচ্ছ্বাস মাত্র!

এমনি কত কি ভাবছে—তার মুখে ফুটে উঠছে এ-সব চিন্তার ছায়া। জফিও চিন্তার কোন্ রাজ্যে চলে গেছে! দক্ষিণের জানলা খোলা। হাওয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। আলো জ্বালাতে হলো শিশুর পরিচর্য্যার জন্য। জফি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছে, জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে ধরণীর বুক—পাহাড়ের চূড়া।

রাত্রে আহারাদির পর সিরিন বল্লে,—এডা, আমার ঘরের পর্দ্দাটা সরিয়ে রাখলাম, হাতের কাছে কলিং-বেল রইল, যদি প্রয়োজন হয় আমায় ডাকবে,—আজ আমার একটু কাজ আছে, তাই ওঘরে রইলাম।

এডার পাশেই সিরিনের শয্যা পাতা, শিশু ঘুমোলো সেই বিছানায়।

সিরিন নিজের ঘরে এসে জফিকে দেখতে পেল না—ঘরের পিছন-দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখে, সিগারেট ধরিয়ে অসীমের পানে চেয়ে জফি দাঁড়িয়ে কি ভাবছে! পিছন থেকে গিয়ে সিরিন তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলে।

এডা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। শিশু প্রতিদিনই জীবন্ত গতির সঙ্গে স্বভাবের নিয়মে বেড়ে উঠ্‌ছে। এডা কৌচটায় বসে শিশুকে কোলে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে দক্ষিণের জানলার পানে চেয়ে আছে, মাঝে মাঝে শিশুর পানে চেয়ে দেখছে আর চোখ তার ভরে আসছে জলে। ঘরের চারদিকে চেয়ে চোখের জল মুচছে। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিরিন দেখতে পেলে, এডার এই অব্যক্ত বেদনার ভাব তার মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। জফিও সেইভাবে চেয়ে আছে এডার দিকে।

সিরিন বল্লে,—সেদিন রাত্রে এডা এত কেঁদেছে যে সকালে ওর চোখ দু'টো ফুলে গিয়েছিল। শেরিয়া আমায় ক'বার বলেছে ওকে জিজ্ঞেস

করতে, কেন ওর মন সর্ব্বদা এমন ব্যথাতুর? আমি কিন্তু আজও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

জফি বল্লে,—সিরিন, তোমার অন্তর-ভরা ভালবাসা আর দরদ এডাকে মুগ্ধ করেছে,—সেদিন তোমার কথা এমন করে আমায় বলছিল যে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেছিল। ও বল্লে, এমন মানুষ পৃথিবীতে থাকতে পারে, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি! এঁরা নিঃস্বার্থে এমন ভাবে মানুষের জন্য অন্তর ঢেলে দেন, অথচ কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কে আমি, তাও জানেন না—তবু আমার এত-বড় বিপদে এতখানি—আরও কত-কি। তুমি ওর মনের কথা জানতে চেষ্টা করো সিরিন, তাতে ও স্বস্তি পাবে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও খুব বেশী দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। এখন তুমি যাও ওর কাছে, এই রকম মনের অবস্থায় সব কথা হয়তো বলতে পারবে। সব জানবার পর তোমার সুবিধা হবে ওর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করাতে।

সিরিন আস্তে আস্তে পিছন দিক থেকে গিয়ে এডার মাথা আদর করে বুকে টেনে নিয়ে বল্লে,—এডা এ-সময় এত বেশী চিন্তা করলে এবং কাঁদলে শরীর খারাপ হবে, শিশুরও শরীর খারাপ হতে পারে। কেন তুমি এত উতলা হও? এমন সুন্দর শিশু তোমার বুক ভরে থাকবে,—

এডার বহু চেষ্টায় রুদ্ধ-করা অসহ্য ব্যথা বুক ফেটে বেরিয়ে এলো চোখের জলে। সমস্ত শরীর তার কাঁপছে,—সিরিনের হাতখানা বুকের চেপে ধরে গুমরে কেঁদে উঠলো। সিরিন তাকে আদরে শান্ত করবার চেষ্টা করলে, বল্লে,—শরীর এখনও দুর্ব্বল এডা, তুমি এমন করোনা। তোমার চিন্তা করবার একটুও কারণ নেই। তোমার ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা হয়ে আছে।

সে আরও অধীর ও অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। জফি এ-সময় ঘরে এসে

শিশুকে এডার কোল থেকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে, একটা পাখা নিয়ে এডাকে বাতাস করতে লাগলো। সিরিন বল্লে,—জলে একটু ইউডিকোলন মিশিয়ে আনো জফি, আর সেই সঙ্গে একটু গরম দুধ এনো।

সিরিন এডাকে নিজের বুকের ওপর আধশোয়া ভাবে নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগলো। জফি গরম দুধ ও ইউডিকোলন এনে সেখানে রেখে এডাকে খাটে শুইয়ে দিলে; তারপর মাথায় ইউডিকোলন দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। সিরিন কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, শেরিয়া ব্যস্ত হয়ে খবর জানতে এলো। সিরিন বল্লে,—বিশেষ কিছু নয়, দুর্ব্বল শরীর—তার উপর মানসিক উত্তেজনা। পাল্‌স্‌ এখন ভালোই।

পরদিন এডা বেশ সুস্থ হয়েছে তবে অত্যন্ত ম্লান। জফি এসে শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছে। সিরিন বল্লে,—জফি অতটুকু বাচ্চাকে কোলে নেওয়া বড় মুস্কিল, তুমি বিব্রত হয়ে পড়ছো দেখছি। কচি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তোমার সেই খেলা করার দিনগুলো আমার মনে পড়ছে। সত্যি এডা, কি সুন্দর হয়েছে তোমার খোকা।

এডা তেমনি বিষণ্ণ ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সিরিনের দিকে চেয়ে বল্লে,—সে সত্যই সুপুরুষ ছিল। তারপর আরও কিছু বলতে চাইছিল,—কিন্তু কথা যেন বেধে গেল! তা দেখে জফি বল্লে,—আমি বাইরে যাবো এডা?

এডা ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—কেন যাবে? আমি যা বলতে চাই, তা অসঙ্কোচে তোমাদের বলতে পারবো। এতদিন চেষ্টা করেছি বলতে,—কিন্তু সুযোগ হয়নি।

দরদী কণ্ঠে সিরিন বল্লে,—বলতে যদি বেশী কষ্ট হয়, থাক এডা—শরীর আবার খারাপ হতে পারে!

সহজ ভাবেই এডা বল্লে,—না, তা হবেনা। সারা রাত ভেবে মনকে শক্ত করেছি। তোমাদের কথায় আমি সান্ত্বনা পেয়েছি,—এই তিন মাসে তোমাদের যেভাবে চিনেছি, তাতে আমার নির্ভরতার সীমা নেই।

এডা বলতে লাগলো,—বাবা-মার আমি খুব আদরের ছিলাম,—কিন্তু সে আদর ভালবাসা তাঁদের গোঁড়া-সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি—আমার উপর তাঁরা নিষ্ঠুর হলেন, অবিচার কল্লেন। বাবা মিলিটারীতে একজন পদস্থ অফিসার, আমাকে নার্শিং শিখতে দিয়েছিলেন সখের জন্য। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে যুদ্ধের কাজে মেয়েকে দিলে গভর্ণমেণ্টের কাছে মান-মর্য্যাদা বাড়বে, এই ভেবে আমায় মিলিটারী-নার্শের কাজ নিতে বলেন। আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবার অবাধ্য হবার উপায় নেই। বাবার ইচ্ছায় মিলিটারীতে কাজ নিলাম। মন কিন্তু সব সময় বিরূপ হয়ে থাকতো। কোনদিন স্বাধীন ইচ্ছায় বা মতে চলবার কল্পনা আমি করতে পারিনি। অত্যন্ত পুরাতন-পন্থী গোঁড়া ছিলেন আমার বাবা, মা। বাড়ীর আর সকলেও সেই রকম। আমার মনও কতক সেই ভাবে তৈরী হয়েছিল। মিলিটারীতে এসে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে আমার মন আরও গোঁড়া হয়ে উঠলো,। মেয়েদের যথেচ্ছ মেলামেশা, মন বলে কিছু নেই, শুধু সাময়িক হৈ-চৈ, ফুর্ত্তির জন্য কি না তারা করে! মিলিটারী লোক-গুলোর জীবন এবং ব্যবহার আমায় অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। কাজ ছাড়বার জন্য অস্থির হয়ে মাকে জানাতাম। মা রাজী হতেন না বাবার ভয়ে! সহকর্ম্মী নার্শদের সঙ্গে আমার একটুও মিলতো না। কোনও মিলিটারী অফিসার বা অন্যান্যদের সঙ্গও আমার মোটে ভাল লাগতো না। আমি একেবারে দলছাড়া ছিলাম। মেট্রনও ছিল আমার ওপর

বিদ্রূপ। সকলেই আমাকে পিউরিটান বলে বিদ্রূপ করতো। আমি কোন দিনই নাচে বা পার্টীতে যেতে চাইতাম না। বাধ্য হয়ে কোনদিন পার্টিতে যেতে হলে আর সকলের কাছ থেকে তফাতে থাকতাম। কত অফিসার অসুস্থ হয়ে হস্‌পিটালে এসেছেন, আমার সেবা পেয়ে খুশী হয়েছেন। সারবার পর আমায় কত অনুরোধ করেছেন বেড়াতে কিংবা সিনেমায় বা পার্টিতে যাবার জন্য, আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। এ-সব কারণে মেশের কেউ আমাকে পছন্দ করতো না। কিন্তু ঐ গ্রীক মহিলার সহানুভূতি কেন যে আমাব ওপর হয়েছিল, জানি না। মাঝে মাঝে আমায় কত কথা বলতেন, কত উপদেশ দিতেন, ভাল ভাল বই পড়তে দিতেন। বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগতো, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেও ভাল লাগতো। তারপর আমাদের হসপিটালে একজন বিদেশী অফিসার আহত হয়ে আসেন। আমি খুব যত্নে তাঁর শুশ্রূষা করলাম। ভাল হয়ে তিনি আমায় বল্লেন, আমাকে তাঁর বড় ভাল লেগেছে, আমার সঙ্গ তিনি চান। এমন কথা আরও কতজন বলেছে—সকলকেই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, এঁকেও করলাম। এর পরে তিনি মাঝে মাঝে হস্‌পিটালে আসতেন, মেশের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁকে মিশতে দেখিনি কোন দিন। তাঁর প্রকৃতি একটু আলাদা রকমের ছিল। ঐ গ্রীক-মহিলার সঙ্গে কদিন আলাপ করতে দেখেছি। একদিন দেখলাম তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ—গম্ভীর হয়ে গ্রীক-মহিলার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন। গ্রীক-মহিলা আমায় বল্লেন, আজ একসঙ্গে ওঁর দুই ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ এসেছে। একজন ছিল পাইলট—জার্ম্মানীতে বোমা-বর্ষণ করতে গিয়ে মারা গেছে। আর একজন আর্টিলারীতে অফিসার ছিল। বেচারা বড্ড বেশী আঘাত পেয়েছে,—তবে ওদের জীবনই তো এই!—সেদিন আমার মনে কেমন মমতা জাগলো। কদিন পরে আবার এলেন। গ্রীক-মহিলার

সঙ্গে দেখা করে যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বল্লেন, আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা-ভরে দু'একটি কথার জবাব দিলাম মাত্র। আবার একদিন যখন গ্রীক-মহিলার খোঁজে এলেন, তখন ডিউটিতে ছিলাম আমি একা। আমায় বল্লেন,—আমার শমন এসেছে ফ্রণ্টে-যাবার জন্য। যাবার আগে আমার শেষ মিনতি একবার তোমায় জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে চলো একটি বার বেড়িয়ে আসবে। তোমাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। তাই একটি বার তোমার সঙ্গ চাচ্ছি,—এতখানি নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি। আমার এই ফ্রণ্টে যাওয়ার অর্থ অন্তিম-যাত্রা,—যেমন আমার দুই ভাই গেছেন! সেই মুহূর্ত্তে তাঁর মুখ মনোভাব আমায় ক্রি যে করে দিলে, তোমাদের বোঝাতে পারবো না। আমার এতদিনের কঠিন মন কি হয়ে গেল! নিজেকে আমি ভুলে গেলাম। আমার সেই গোঁড়া-সংস্কার কোথায় চাপা পড়ে গেল। তাঁকে বল্লাম,—চলো কোথায় যাবে,—আমি মেট্রনের কাছে ছুটি নিয়ে আসছি। শুনে সে একটু আশ্চর্য্য হল। তারপর একসঙ্গে গেলাম সিনেমা দেখতে, তারপর খানিক বেড়িয়ে এলাম। সেদিন আমার মনে কোন বাঁধ ছিলনা। কেবল তাঁর সেই মিনতি-ভরা চাউনি আমার বুকের মধ্যে এক অসহ্য বেদনা জাগাচ্ছিল। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো তাঁর আলিঙ্গনে এবং ভাব-উচ্ছ্বাসকে বুক ভরে নিয়েছি।—তোমাদের আমি বোঝাতে পারবো না আমার মনোভাব—আমার কাছেই তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রাত্রে ফিরতে দেরী হলে শাস্তি—সে কথাও মনে ছিল না। আমি সেদিন তাঁকে আমার সব দিয়েছিলাম। তারপর সাত দিন মাত্র তিনি ছিলেন। প্রতিদিনই তাঁকে সঙ্গ দিয়েছি—যা তাঁর ভাল লেগেছে, ভালো লাগায় জন্য দেহ-মন দিয়ে তা স্বীকার করেছি, গ্রহণ করেছি, দিয়েওছি প্রাণ ভরে আমি! তিনি চলে গেলেন ফ্রণ্টে,—সেই বিদায়-ক্ষণ আমার

জীবনকে কি করে দিয়ে গেল! দশ দিনের মধ্যে জানতে পারলাম তাঁর আর দুই ভাইয়ের মতো তিনিও ফ্রণ্টে প্রাণ দেছেন! যাবার দিন আমার একখানা ফটো চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাকেও দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ছবি। আজ জীবন্তে সে-ছবি আমি পেয়েছি।

এডা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার চোখ ফেটে জল আসছে—কিন্তু ঝরে পড়ছে না,—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, বুক চেপে ধরছে, তবু সে বলবেই! সিরিন আদর করে বল্লে,—আর থাক এডা।

এডা বললে,—না, শোনো আমার কথা—আমার বাপ-মা, আত্মীয়দের কথা—সমাজের সুবিচারের কথা।

জফি স্থির হয়ে বসে শুনছিল,—এ-সময় একবার উঠে গিয়ে এক গ্লাস সরবত এনে এডার হাতে দিলে। এডা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জফির পানে চাইলে, চেয়ে মনে-মনে বল্লে—কী সম-ব্যথা, কত মমতা তোমাদের! চোখের ভাষায় জানালো জফি আর সিরিনকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা! তার পর বলতে লাগলো,—কয়েক-মাসের মধ্যেই মেট্রনের বুঝতে বাকী রইল না। তিনি ভয়ানক মরালিষ্ট। আমায় বল্লেন,—তোমার স্থান নেই এখানে এই চাকরীতে, অফিসারদের জানাতেই হবে। যে কর্ণেল ছিলেন আমাদের ও, সি—মেট্রনের তিনি পরম বন্ধু। আমার সম্বন্ধে সব কথাই তাঁর কাছে আগেই বলা হয়ে গেছে আমার চেতনা তীব্র হয়ে উঠলো। গ্রীক-মহিলাকে সব বল্লাম। তিনি আমার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরিচিত অফিসারদের বলে বহু চেষ্টাতেও আমার চাকরী-রক্ষা সম্ভব হলো না। তিনি বলেছিলেন, আমার সমস্ত ভার নেবেন এবং চাকরী যাতে নষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থাও করবেন। কিন্তু তা হলো না। তখন তিনি নিজে গেলেন আমাদের ব্রিগেডিয়ারের কাছে।

ব্রিগেডিয়ার সমস্ত ঘটনা শুনে যথেষ্ট সহানুভূতি জানালেন। উপদেশ দিলেন একবার বাবা-মার কাছে যাবার জন্য। কোন্ সূত্রে তাঁর সঙ্গে গ্রীক মহিলার বন্ধু-ভাবে পরিচয় ছিল, নতুবা অফিসারদের কাছে এ-সব জানানো বিপদের কথা, তার ওপর বড় অফিসার। আমি খুব জানতাম আমার বাবা-মা আমায় স্থান দেবেন না,—আত্মহত্যা ভিন্ন আর কোন সুব্যবস্থার কথা তাঁদের কাছে শুনবো না! গ্রীক-মহিলা বল্লেন, তিনি আমার সঙ্গে গিয়ে সব বলবেন। আমি বল্লাম, তার প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই যাবো। তিনি খুব আশা করেছিলেন, কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতার পাল্লাটাই বাবা-মার সব-চেয়ে বেশী ঝুঁকবে কিন্তু তা যে অসম্ভব, আমি তা জানতাম। গ্রীক-মহিলা একদিন লুকিয়ে আমায় ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন, সমস্ত কথা বলে পরামর্শ নেবার জন্য। তাঁর কি উদার অন্তঃকরণ,—তিনি আমায় দু'চারটি কথা বল্লেন। তা থেকেই তাঁর স্বচ্ছ অন্তরের মহত্ত্ব আমি অনুভব করতে পারলাম। তাঁর উপদেশে গেলাম মার কাছে। সমস্ত ঘটনা এবং মনের সহজ গতির কথা অকপটে বল্লাম। শুনে মা আগুন হয়ে উঠলেন! কলঙ্ক এবং মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কায় তিনি ধৈর্য্য হারালেন। বাবার কাছে বলবার কথা তুলতেই দিলেন না। মায়ের ব্যবহারে আমার মনের যা কিছু সঙ্কোচ, ভয়, জড়তা—সব কেটে গেল! আমি নিজে বাবার কাছে গিয়ে স্পষ্টভাবে আমার মনের কথা এবং আমায় অবস্থার কথা বল্লাম! অন্যায় আমার কণামাত্র নেই,—অনুতাপ বা অনুশোচনা আমায় স্পর্শ করেনি! মরণ-পথের যাত্রীর স্বচ্ছ অকপট-মনোভাব থেকে যে প্রাণের স্পর্শ আমায় দিয়ে গেছে, সে প্রাণের দান আমার কাছে সম্মান পেয়েছে! প্রাণের বস্তু বলে আমি তা গ্রহণ করেছি। এর জন্য যত বড় দাম দিতে হয় আমি দেবো। সত্যকে যারা কালি মাথায়, সমাজে তারা সাদরে

স্থান পাচ্ছে—ভ্রূণ-হত্যা করিয়ে সে-মর্য্যাদা বজায় রাখে। আমার মেট্রন উপদেশ দিয়েছিল এই প্রাণের দানকে বিনাশ করতে,—ভ্রূণ হত্যা করতে—হাজার হাজার লোক নিত্য-দিন এ-কাজ করছে—এবং তার পর সমাজের চূড়ামণি হয়েও আছে তারা। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি এবং সমাজে তাদের স্থান আছে—যথেষ্ট মর্য্যাদা তারা পায়। পর্দ্দার আড়ালে নরহত্যা কেমন করে যে সমাজের বিচার-পতিরা ঢাকা দেয়, তাও দেখেছি। এ-সব যুক্তি আমার অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি বলে বাবা-মার কাছে বুঝিয়ে দিলাম। বাবার মিলিটারী-মহলে মুখ দেখানো অসম্ভব হবে বলে আমায় গালাগালি কল্লেন। তখন আমি মিলিটারী অফিসারদের বহু বহু কীর্ত্তির কথা যা জেনেছি প্রত্যক্ষ দিবা-লোকে—স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারি,—এ সমস্তই বল্লাম। তাতে তিনি অত্যন্ত রেগে উঠলেন, বল্লেন,—তোমার মৃত্যুই আমার কাছে একমাত্র কাম্য। তুমি আমার বংশ, মান-মর্য্যাদা কলঙ্কিত করেছো। আমি উত্তর দিলাম, যদি তোমার কোন সাহায্য না নিই তাহলে আর তোমার কোন উপদেশ বা উপায় জানাবার প্রয়োজন হবে না। আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি সত্যকে মসীলিপ্ত করতে পারিনি, প্রাণের মর্য্যাদা দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছি, এ যদি অপরাধ হয়, তবে আমি মা-বাবা আত্মীয় সমাজ কিছুই চাই না, কারো কাছ থেকে কণামাত্র সাহায্য চাই না, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো। বাবা-মার দেওয়া যা-কিছু অলঙ্কার বা দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, সমস্ত তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আমার উপার্জ্জিত অর্থ যা সঞ্চিত ছিল, এবং আমার দিদিমার মৃত্যুকালে দিয়ে-যাওয়া যে উপহারগুলি ছিল, তাই নিয়ে চলে এলাম। গ্রীক-মহিলা আমার ঠিকানা দিয়েছিলেন। সেই ঠিকানায় বেগম সোফিয়ার কাছে তাঁরা আমায় পৌঁছে দেন। তারপর আমার মনের দারুণ অবস্থা

এবং অসহায়তার জন্য তিনি এবং তোমরা যা করেছ এবং কচ্ছো, তা আমার কাছে মনে হয়, স্বপ্ন! কিংবা এই জঘন্য মানুষ-সমাজের বাইরে কোনো এক স্বর্গ আছে, তোমরা সেই স্বর্গের মানুষ! বেগম সোফিয়া আমায় অনেক বই পড়িয়েছেন। তাঁর এক বন্ধু আমায় অনেক শিক্ষা দিয়েছেন—আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন এবং আমার জ্ঞানে অভিজ্ঞতার যা পূর্ব্বে কোন দিন স্থান পায়নি, কেউ কোনদিন এমন শিক্ষা দেয় নি বা সমাজের রূপ ও বিকৃত দিক যে কি, তা বলে নি! গ্রীক-মহিলা আমায় নানাভাবে যা বলতে চাইতেন, তা বুঝতে পারবার মতো মন তখন ছিল না। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমি অসহায়, এই সব চিন্তা আমায় অস্থির করতো! কিন্তু আজ আমার এতখানি নির্ভরতা এসেছে যে ঐ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। তবে সমস্ত জীবনের ঘটনা মাঝে মাঝে কি যে করে দেয় আমায়, তা বর্ণনার অতীত। সিরিন এবং জফি ধীর ও দরদ-ভরা অভিব্যক্তি দিয়ে বল্লে,—এডা তোমার এ নির্ভরতায় কোনদিন আঘাত লাগবে না। শিশুকে তুমি মানুষ করো এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হও। এই বিকৃত সমাজের কলঙ্ক থেকে নিজে মুক্ত হও এবং অন্যকে মুক্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হও, জীবনের স্বাদ পাবে। দেখি এডা সেই ভদ্রলোকের ফটোখানি।

সিরিন বুঝলে, অন্তর মুক্ত করে সেই ক্ষণেকের অতিথির স্মৃতি-কথা বলবার পর এডা অনেকখানি শান্তি পেয়েছে।

এডা উঠে গিয়ে অত্যন্ত যত্নে-রাখা ফটোখানি বার করে নিয়ে এলো, জফি এবং সিরিন সাগ্রহে দেখতে লাগলো। হঠাৎ এদের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শিশু কেঁদে উঠলো। সিরিন বল্লে,—এডা, ওর খাবার সময় হয়েছে, ওকে খাওয়াও। আমরা ঘুরে আসছি।

বেশ ক'দিন কাটিয়ে সোফিয়া ফিরেছে। বিরামহীন শ্রমে তার চেহারায় বেশ ছাপ পড়েছে, কিন্তু তার মাঝে সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির রশ্মিও দেখা যাচ্ছে—এটা সিরিনের নজর এড়ালো না। এডা এবং তার শিশুকে নিয়ে কিছুক্ষণ কাটাবার পর সোফিয়া বল্লে,—সিরিন বুঝতে পারছো না বুঝি, আমি কত ক্লান্ত! এতক্ষণ এসেছি, চা কিংবা কফি খাওয়াবার কথা মনে পড়লো না? সিরিন বল্লে,—তোমার সামনেই সব প্রস্তুত। তুমি যে ভরপুর হয়ে আছো, তাই দেখতে পাচ্ছোনা! এ কথায় সোফিয়া কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সিরিনের দিকে চাইলে।

চা খেতে বসেছে সোফিয়া, তাকে চিন্তিত এবং অন্তমনস্ক মনে হলো। জফি বল্লে,—সোফি, তোমার উৎফুল্লতার মধ্যেও দুশ্চিন্তার ছায়া দেখছি কেন?

সোফি—বলছি সব, সিরিন। এ কদিনে তোমার ভাই-জানের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। আমার মনে হয়, তুমি ওর সম্বন্ধে একটু উদাসীন ছিলে, নাহলে অনেক আগেই ওর জীবনের মোড় ঘুরতে পারতো।

সিরিন—না সোফি, সময় এবং বাস্তব অবস্থা বোধ হয় ওর মনে ঘা দিয়েছে। অবশ্য জানিনা তুমি কতদূর এগিয়েছ, তবে আমি তো বলেছি, ওর শিক্ষিত মন, উদার অন্তর এবং গাম্ভীর্য্যের অভাব কোন দিনই ছিল না। পলকা-মনের যুবকদের মতো ভীড়ের মাঝে এগিয়ে চলবার ছেলে সে নয়। যাক সে কথা! এখন তুমি কতখানি কৃতকার্য্য হতে পারলে, তাই বলো।

জফি—আমি সে-কথা বলতে পারি—তোমাদের সব এ্যাটেম্প্‌টই তো সাকসেশফুল।

হেসে সোফিয়া বল্লে,—হ্যাঁ, ঐ ধরণের স্তুতি শুনতে খুব ভাল লাগে, আত্ম-প্রসাদও পাওয়া যায়। কিন্তু কাজে কতটুকু করতে পারি বা পারবো, সেইটেই আসল। আরসাদ নিজের কথা দিয়ে যে সব আলোচনা করতে চায় তার মধ্যে এসে পড়ে সমাজ-ব্যবস্থার কথা, রাজনীতির আলোচনা। এডাকে নিয়েই প্রথমে উঠেছিল সাধারণ আলোচনা এবং সে-আলোচনায় আমার ছদ্মবেশ খুলে পড়ে। প্রথম দিনেই তার মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে আমি একজন শিক্ষিতা সমাজ-সেবী, দয়াবতী, সময় কাটাবার জন্য এবং নাম-কেনার মোহ নিয়ে সমাজ-সেবার যে দোকান খুলেছি, সেটা আমার সম্পূর্ণ উপরের আবরণ, এর মধ্যে রাজনীতির কোন অভিসন্ধি আছে! কিন্তু সে সন্দেহ হবার পরেও ও ভয় পায় নি,—আমার সঙ্গে মেশবার আগ্রহ বরং বেড়েই গেল। অথচ ওদের কী ভীষণ কড়া নিষেধ-আজ্ঞা, রাজনীতির গন্ধ পেলেই একশো হাত দূরে সরে যায়!

জফি—আগুনে পুড়ে মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও তো পতঙ্গ—

সোফি—তুমি থামো জফি, না হলে আমি আর কিছুই বলবোনা।

জফি অত্যন্ত ভয় পাবার ভাণ করে মাথার ঢেউ-খেলানো চুলগুলোর ওপর বাঁ-হাতখানা বুলিয়ে দিয়ে বল্লে,—আচ্ছা, আমার ভুল হয়ে গেছে,—তুমি বলো সোফি। আমার জানবার বড় আগ্রহ, তোমরা কতদূর অগ্রসর হলে।

সোফিয়া—যখন বুঝলাম আমার ছদ্মবেশ বুঝতে পেরেও আমার সঙ্গে মেশায় আতঙ্ক না হয়ে আগ্রহ বেড়েছে, তখন আমার পরিচয় তাকে দিলাম। তার সঙ্গে গোপনে মেলা-মেশা করবার ব্যবস্থা করলাম। সে একটুও ভয় পেলে না, এবং এই দুমাসের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সে এক-মাসের ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু

সাতদিন মাত্র বাড়ীতে ছিল। ফিরে এসে সহরের শেষ দিকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল। সেখানে আমি ছদ্মবেশে রোজ যেতাম। আমি না গেলে সে আমার কাছে আসতো। আরসাদের রাজনীতি সম্পর্কে মত সুস্পষ্ট। সেটা জাতীয়তা-বাদের আদর্শে এবং সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ শেষ হলে জাতীয় স্বাধীনতা-অর্জনে দেশ সমর্থ হবে এই রকম গোলমেলে-ধারণাও আছে। যতদূর সম্ভব আমি তার সঙ্গে তর্ক-আলোচনা করেছি। প্রকৃত স্বাধীনতার রূপ আরসাদের পরিষ্কার না থাকলেও প্রাথমিক আলোচনায় সে আমার মত সমর্থন করেছে। সাম্যবাদের নাম শুনলেই ওরা কেমন আঁৎকে ওঠে,—সাম্যবাদ-আদর্শ মহান তা স্বীকার করেও কার্য্যক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা অল্প, এই ওদের ধারণা। সে যুক্তির মূল হলো রাশিয়ার উপস্থিত দৃষ্টান্ত। ওরা পদে পদে দেখাবে রাশিয়ার উপস্থিত নীতি এবং সেখানকার উপস্থিত সাম্যবাদী-রাষ্ট্রের বিকৃত রূপ কতখানি হাস্যকর! যুক্তিতে এটা ওরা প্রতিপন্ন করতে চায়। রাশিয়ার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিপ্লব ইতিহাস ওর বেশ ভাল করে পড়া আছে।

সিরিন—আরসাদ দর্শন আর রাজনীতির কৃতী ছাত্র ছিল। ছাত্র জীবনে কৃতিত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় ভালভাবেই দিযেচে,— তোমাদের পাঠ্য-জীবনের ওপর যে সব আলোক-সম্পাত হয়েছে, তারও ঠিক সেই রকম। তোমার দু-বছর-আগে মাত্র সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে।

সোফিয়া—হ্যাঁ, এ সব গল্প সে করেছে। একটা কথা সে বারে-বারে বলেছে, এ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মধ্যে তার কোন রকম উদ্দেশ্য বা মতের সম্পর্ক নেই,—ওলট-পালট মানসিক অবস্থার বৈগুণ্যে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছে, এখন আর ফেরবার পথ নেই,—

কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, কেমন করে মুক্তি পাবে। আরও কত কি বলে। তার মন একটুও শান্ত নয়। একদিন বলেছিল, জানো আমার এক বোন আছে—সে সাম্যবাদী—তার জীবনকে সে এক অপূর্ব্ব আদর্শ-নিষ্ঠায় ফুটিয়েছে? তার আদর্শ-বাদ ও মত-বাদের সঙ্গে আমার মিল নেই—কিন্তু আমি তার আদর্শ, তার কাজ, তার জীবনের প্রত্যেকটি সুন্দর পরিণতিকে অন্তর ভরে শ্রদ্ধা করি! বলতে বলতে আরসাদের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠেছিল, মুখে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখেছি। তাকে বল্লাম—তার সঙ্গে যে আমার আলাপ করিয়ে দেবে, সে কোথায়? তখন সে এমন বেদনা-ভরা নিশ্বাস ফেলেছিল যে আর প্রশ্ন করতে পারিনি। সেদিন তোমার ওপর তার গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় অভিব্যক্তি আমায় মুগ্ধ করেছিল। সে এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে সে-দিনটা আর কোন আলোচনা সম্ভব হলো না।

জফি—আর মনে মনে সিরিনকে অভিশম্পাত—

বাধা দিয়ে সিরিন বললে,—কাজের কথা বলো। সীমান্তে আমাদের সাফল্য কতখানি লাভ করতে পারলে?

সোফি—দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে প্রায় সর্ব্বত্র আমাদের দলের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। প্রায় প্রত্যেক ইউনিটে আমাদের দলের লোকেরা নানাভাবের কাজ নিয়ে আছে। ফাইটিং-ফোর্সেও সাধ্যমত কমিশন-অফিসার পাঠাতে আমরা চেষ্টা করছি—তাদের নীতি ও কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিয়ে। তারা ফ্রন্টে যাবার সময় কি করবে, তা জানানো হয়েছে। বেশীর ভাগ অফিসার ও সৈন্যরাই ফ্রন্টে যেতে অস্বীকার করে। বন্দী হবার পন্থা নিতে চায় তারা। অবশ্য যতদিন না যুদ্ধের অবস্থা চরমে ওঠে, ততদিন ওরা সাধ্যমত শান্তির আড্ডায় (peace station) থাকবে। (Station officer) ষ্টেশন-অফিসারের কাজে আমাদের কমরেডরা

অনেকে আছেন এবং বিপদে পড়েন নি বলে জানা গেছে। তারা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে আত্মগোপন করে আছে। এদিকে শ্রমিক-কেন্দ্রেও আমাদের কাজ ভাল ভাবে চলেছে। সমর-শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের বহু কমরেড আছেন—তাঁরা বিস্তৃত ভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। তোমায় তো লিষ্ট পাঠিয়েছি—কোন্ কোন্ ইউনিটে কত সংখ্যা আছে। এ সব তো ভাল ভাবেই চলেছে, কিন্তু আমাদের দলের উপর অত্যন্ত কড়া নজর থাকায় সম্প্রতি যে গ্রেফ্‌তার হলো, তাতে কাজের বেশ ক্ষতি হয়েছে। এখানে শ্রমিক-কেন্দ্রে বেশ অসন্তোষ সুরু হয়েছে। লোহার কারখানায় আর তেলের খনিতে যথেষ্ট পরিমাণ ইস্তাহার বিলি হওয়ায় পুলিসের সতর্কতা বেড়েছে। থানা-তল্লাস হয়েছে গত রাত্রে, এ সংবাদ বেশ গোপন আছে। শেরিয়ার কমরেডরা এ-ঘটনা আজ জানতে পেরেছেন এবং আমার কাছে আজই সে সংবাদ গিয়েছিল। তোমাদের আর এখানে থাকা সমীচীন হবে না। আমি অন্যত্র ব্যবস্থা কচ্ছি। আজ রাত্রেই কমরেডদের সব ঠিক করতে বলে এসেছি। কারণ শেরিয়া প্রত্যক্ষে কাজে নেমেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে তার বাড়ী সার্চ হতে পারে। আজ গভীর রাত্রে তোমাদের নিয়ে যাবো কয়লার খনির এক শ্রমিকের বাড়ী। সে স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। তবে অল্পদিন মাত্র থাকা সম্ভব হবে পর্দ্দানশীন জানানা হয়ে। তার পর যত শীঘ্র পারি আর একটা নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা কচ্ছি।

সিরিন—এতক্ষণ এ সংবাদ দাওনি কেন? প্রস্তুত হতে হবে তো! আচ্ছা সোফি, এডাকে কি রকম মনে হয়? ওকে কাজে নিতে পারা যাবে বলে আমার ধারণা। আমি অবশ্য কিছু বলতে সাহস করিনি, তবে তার কথায় মনে হয় তোমার তরফ থেকে ওকে তোমার কিছু মন্ত্র দেওয়া হয়ে গেছে।

সোফিয়া—হ্যাঁ, ওকে নিশ্চয়ই পাবো। কিছুদিন শিশুকে নিয়ে পরোক্ষে কাজ করুক, তারপর শিশুর ভাল ব্যবস্থা কল্লে ও আরও ভাল ভাবে সময় দিতে পারবে কাজে। এই সমাজের মধ্যে জীবনকে তিলে তিলে হত্যা করতে দেবে না বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে,—তবে পড়াশুনা আরও দরকার। সেটা তোমার কাছে বেশ করতে পারবে। এর পরে তোমাকে যেখানে পাঠাবো, সেখানে ওকে আবরণ হবার কাজে লাগানো যাবে।

সিরিন—ওর কয়েকটা গুণ আমার বেশ ভাল লেগেছে। বুদ্ধিও বেশ। দেখো কতদূর কি করতে পারো।

সোফি—তোমরা অন্যত্র গেলে ওকে এবার ভালভাবে ট্রেনিং দিও। গোপনতা ও সাবধানী হবার স্বাভাবিক শিক্ষা মিলিটারীতে ভালোই হয়ে গেছে। তোমাদের সম্বন্ধে এতদিন আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এডা কিছু-দিন শেরিয়ার কাছে ছেলেকে নিয়ে থাক। ওদের ছেড়ে যেতে হবে মনে হতেই সিরিন উঠে গেল এডার কাছে, গিয়ে শিশুকে আদর করতে লাগলো। এডা বল্লে,—তুমি সর্ব্বক্ষণ ওকে এত যত্ন আদর করো, তাই এর মধ্যে ও কেমন সবল আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সিরিন শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বল্লে,—এডা, বাড়ীতে মার অসুখের খবর নিয়ে সোফি এসেছে, আজ রাত্রেই আমায় যেতে হবে। কিছুদিন পরেই আবার আমরা এক সঙ্গে থাকবো। তুমি সব সময় শিশুকে নিয়ে কাটিয়ো, মন অস্থির করো না। তোমার বুক ভরে থাকবে এই স্বর্গীয় সম্পদ। ভবিষ্যতের জন্য একটুও চিন্তা করো না। সোফিয়া তোমার সম্পূর্ণ ভাল ব্যবস্থা করবে, তুমি তার সহোদরার মতো—এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

কথা শেষ হবার আগেই সিরিন দেখলে, এডার চোখে ধারা নেমেছে।

নিস্তব্ধ নীরব, একটিও কথা বলতে পাচ্ছে না। বিচ্ছেদের এই গভীর ব্যথা সিরিনের অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলে। শিশুকে বিছানায শুইযে এডার মাথাটা টেনে নিলে নিজের বুকে। কোন উত্তেজনা নেই, শান্ত ভাবে এডা অশ্রু বর্ষণ কচ্ছে। সোফিয়া পিছন থেকে এসে বল্লে,—সিরিন, এত অল্প দিনে এডার অন্তর এমন ভাবে দখল করে নিয়েছ! আশ্চর্য্য!

জফি এসে এডাকে বল্লে,—তুমি একটুও মন খারাপ করোনা, খুব শীগগিরই তোমার সিরিন বেগমের কাছে তুমি যেতে পারবে। তোমার শিশুকে ছেড়ে আমরা কদিন থাকতে পারবো? এই বলে জফি শিশুকে বিছানা থেকে তুলে নিলে। এডা একটু অপ্রতিভ হলো। সে চায়নি তার অন্তরের গভীর ভাব এমনি করে প্রকাশ হয়ে পড়ে!

সিরিনের বুক থেকে মাথাটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে চোখ মুছে এডা গেল মুখ ধুয়ে আসতে। সিরিনের চোখও জলে ভরে এসেছে। এই অত্যাচারিত বুক-ভাঙ্গা-আঘাতে-জর্জ্জরিত মেয়েটি তার মনে অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে বসেছে। তার মধুর স্বভাব এদের আকৃষ্ট করেছে।

এডা এসে একগোছা রুমাল আর সিরিনের জন্য সুন্দর একটা ছুঁচের কাজ করা ব্লাউশ সুটকেস থেকে বার কল্লে। সিরিন বল্লে,—এমন সুন্দর ছুঁচের কাজগুলো কখন করেছ এডা? এ-কথা শুনে এডা কিছু বলতে পাচ্ছেনা, তার বুক চেপে যাচ্ছে, পাছে আবার সে ব্যথা চোখের ধারায় বাঁধ ভাঙ্গে, রুমালগুলি তুলে জফির হাতে দিলে। জফি এডার হাত থেকে সাদরে সে দান গ্রহণ করে ওর হাতে চুম্বন করলে। তারপর সোফিয়ার জন্য বালিসের ওয়াড়, টেবিল-ক্লথ, আর রুমাল সেলাই করা ছিল; তা দিলে। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে তার কৃতজ্ঞতা

সব চাইতে বেশী। তাঁর জন্য ভাল টেবিল-ক্লথ, রুমাল ও ছুঁচের কাজ-করা বালিসের ওয়াড় দিলে অনেকগুলো।

সিরিন গেল সব গোছ করতে,—জফি আর সোফি বসে এডাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

শেরিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক ভাবে এসে বল্লে,—সোফি এখনও তো মোটরের ব্যবস্থা হল না। কমরেডরা যে মোটরে আসবেন, তার নম্বর বদলে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছি।

সোফি—সেই ভাল হবে। এখানের কোন গাড়ী যাতে না নিতে হয়, তাই আমরা চেয়েছিলাম।

শেরিয়া—ডাক্তার নিজেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমরা মাত্র গাড়ীর পেট্রল ইত্যাদির ব্যবস্থা করবো। এডাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেও, ও আবার শীগগিরই সিরিনকে পাবে। নাহলে ওর মনের অবস্থা যা হবে, আমি তো অল্প ক্ষণই বাড়ীতে থাকতে পাই!

এডাকে মিষ্টি কথায় আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে সিরিনরা বিদায় নিয়ে রাত বারোটার সময় মোটরে চড়ে বেরুলো। অভিজাত-ঘরের সাজে সজ্জিত। গাড়ীও তেমনি জমকালো। কারও সন্দেহ হবার উপায় নেই,—বেগমদের সাজে চোখ ঝলসে ঠিকরে যাবে, যারা আসবে গাড়ীর কাছে! সোফারের পোষাকেও সরকারী ছাপ। সাহস করে ফিরে তাকাবেনা কেউ। লোকালয় ছাড়িয়ে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে মোটর চলেছে। যাত্রীরা নীরব। পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটর ছুটে চলেছে। এ পথেও মিলিটারী যানের অভাব নেই, তবে আজ রাত্রে খুব বেশী ভিড় ছিল না। জঙ্গল অতিক্রম করে আবার সহর—তারপর গ্রাম। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ—আবার গ্রাম। ভোর রাত্রে এক গ্রামের মধ্যে এসে গাড়ীতে জল নিলে, পেট্রল ঢেলে নিয়ে আবার চলতে লাগলো। দূর থেকে বিরাট তামা

কারখানা ও তেলের খনির আলো দেখা গেল। সোফিয়া বল্লে,—এই খনির একটু দূরে গ্রামের শ্রমিক-কুটীরে তোমাদের স্থান ঠিক করেছি। ক'দিন আগেই কমরেডরা পুলিসের ঘোরাঘুরি লক্ষ্য করে স্থান ঠিক করে গিয়েছিলেন, এখানে একটু অসুবিধায় থাকতে হবে। আমাদের আসা-যাওয়া হবে খুব কম। সিরিন হেসে বল্লে,—সোফি তুমি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্ম সত্যি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে? এ তো শোভা পায় না!

সোফিয়া—সুখ? সে কথা মনে হয়নি। তবে সুবিধা-সুযোগের জন্ম আমরা খুবই ব্যস্ত থাকি—সে-ব্যস্ততা আমার বৃহৎ কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। দলের প্রাণ-শক্তি যেখানে, সেখানে সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধার উপরেই কাজের সুব্যবস্থা নির্ভর করে। তোমরা তো শুধু দুটি মাত্র প্রাণী নও।

গাড়ী এসে থামলো খনি-বস্তির শেষ প্রান্তে,—গ্রামের সীমানায়,—সেখানে দুখানি মাত্র শ্রমিক-কুটীর—তার সামনে। সোফার নেমে কুটীরে গেল। অনতিবিলম্বে বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় এক শ্রমিক সোফারের সঙ্গে এসে গাড়ীর দরজা খুলে স্বাগত জানালো সোফিয়াদের। ওরা নেমে কুটীরে গেল। সামনের দিকের দুখানি কুঠুরীতে ছিল পর্দ্দানশীন শ্রমিকের স্ত্রী। সে এসে অভ্যর্থনা করে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দুখানি। মনে হল এঁরা আসছেন খবর পেয়ে যথাসাধ্য সাফ করে সাজিয়েছে। ঘরে দু'খানা ক্যাম্প-খাট পাতা—একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, একখানা ইজিচেয়ার। অপর কুঠুরীখানিতে একখানা কাঠের তক্তাপোষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙিনায় কটা ফুলের গাছ।

সকাল হয়ে গেছে। গৃহস্বামী ওদের স্নানের ব্যবস্থা করতে গেল। আঙিনার এক পাশে চট দিয়ে ঘেরা স্নানের জায়গা। স্নান সেরে পোষাক বদলে ওরা এসে বসলো তক্তোপোষে। জিনিষ কটা এবং বিছানা

পত্র গাড়ী থেকে নামিয়ে গাড়ীটা সোফার কুটীরের পিছন দিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে এলো। এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকের গৃহিণী চা এবং খাবার নিয়ে এলো। শ্রমিক এবং গৃহিণীকে সোফি ডাকলো। সকলে একসঙ্গে বসে চা ও খাবার খেলে।

সোফি বল্লে—আজকের রাত্রের ট্রেনেই আমি রওনা হবো। সন্ধ্যায় এখান থেকে বাসে উঠে ষ্টেশনে যাবো। গাড়ী তুমি যথাস্থানে পৌঁছে দাও কমরেড।

সোফারকে কর-মর্দ্দনে বিদায় দেওয়া হলো। সর্ব্বহারা কর্ম্মীর রয়েলিষ্টের পোষাকটি আবরণ হয়েছিল বেশ ভালোই।

দুপুরের আহারের পর একটু বিশ্রামের অভিপ্রায়ে তিন জনেই দেহ এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়। জফি প্রশ্ন কল্লে,—আচ্ছা, তোমাদের এই ভাবের শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন বেশ প্রসার লাভ করেছে? আমি যতদূর জানতে পেরেছি এবং সেই প্রথম দিনের পলাতকের আশ্রয় থেকে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের কাগজ-পত্র ও ব্যবস্থা দেখে তার সক্রিয়তা যতটা বুঝতে পারি, তাতে মনে হয় ভাল ভাবেই তোমরা শ্রমিক কৃষক সংগঠন করেছ। সুদূর পল্লীর মধ্যেও তার যথেষ্ট সক্রিয়তা উপলব্ধি করি।

সোফিয়া—সংগঠন যে ব্যাপক বা প্রসারিত, তোমার প্রশ্ন-অনুযায়ী তা ঠিক বলতে পারি না। শক্তিশালী কি না, এইটেই বোধ হয় তোমার প্রশ্ন। প্রত্যেক প্রদেশে আমাদের দলের সংগঠন আছে। কিন্তু অন্যান্য দলের তুলনায় খুবই কম। যে সব দলের কর্ম্মীরা কথায় যত বিন্যাস, বাইরে জাঁক-জমক, প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বর করতে পারে এবং বিপ্লবী কর্ম্মসূচীর পাশ ঘেঁসে চলে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ এবং ধনতন্ত্র-

সাহায্য পায়, সেই সাহায্যে তারা পেটী-বুর্জোয়া, বেকার যুবকদের চাকরী দিয়ে সংগঠনে লাগায়, এ সবই তো তুমি জানো! ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের এবং সখের সমাজতন্ত্রীদের যা নীতি! ঐ দুই ধরণের শত্রুর বিষক্রিয়ায় আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হতে পারে না। তা ছাড়া আমাদের অর্থের অভাব কত, তা তো জানোই। কি ভাবে দলের অর্থ সংগ্রহ হয়, তাও জানো।

জকি—এ সব আমি জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, যেখানেই হোক তোমাদের সঙ্ঘের একটু করে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে আছে কিনা? অর্থাৎ মানুষের অত্যাচারে জনগণের জীবনী-শক্তি খড়ের মত শুকিয়ে আছে নির্জ্জীব নীরস হয়ে,—এ আগুনের ফুলকি পড়ে তাদের সে মনগুলোকে জ্বালিয়ে তুলতে পারবে কিনা? সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।

সোফিয়া—বুঝেছি, তুমি যতদূর জানতে পেরেছো আর বুঝতে পাচ্ছো, তাতে তো বোঝো কি ভয়ানক অসুবিধা এবং বিপদের মাঝখানে আমাদের সঙ্ঘ এবং কাজকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের সংযোগ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ছিন্ন হয়ে যায়! যুদ্ধের সময় কি ভীষণ কড়া আইনে বহু শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী কারারুদ্ধ নির্ব্বাসিত, এ সবই জানো। তবে তোমার প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু বলতে পারি শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আমরা আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে চলেছি। এই দুই প্রদেশে আমাদের শ্রমিক আর কৃষক সংগঠন যেমন সুদৃঢ় শক্তিশালী তেমনি অসামরিক ব্যাপারের যত কাজ করবার জন্য যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করেছি। বহু দলের সমালোচনা এবং টিপ্পনী বর্ষণ প্রথম-অবস্থায় আমাদের উপর চলেছিল প্রায় যুক্তিহীন

ভাষায়। মাঝে মাঝে দলের নব সংগৃহীত বিদ্যাভিমানী সদস্যদের মধ্যেও তর্ক উঠেছে, কিন্তু আজ আর সে সব অসুবিধা বা ঝক্কাট নেই।

জফি—তাঁরা কি এখন সত্যই বুঝতে পেরেছেন যে এই দুর্দ্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক শ্রমিক-ধর্ম্মঘট আর কৃষক-আন্দোলন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের দেশাত্মবোধের প্রেরণায় আইন-ভঙ্গ সভা-সমিতেতে বক্তৃতা দিয়ে শাস্তি নেওয়ার দ্বারা মুক্তি-সংগ্রাম সম্ভব নয়?

সিরিন—তুমি কি বলতে চাও জফি, এই পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামে শত্রু-পক্ষের বাহিনীর মতোই যন্ত্র-সজ্জিত যুদ্ধ-বিজ্ঞানে শিক্ষিত একটা সম্পূর্ণ বাহিনী আশমান থেকে নেমে আসবে?

জফি—না, আশমান থেকে নামবে কেন। যেমন অন্য সব দেশের ইতিহাসে হয়েছে, সেই ভাবে এখানেও হবে। এ দেশের ইতিহাসে সৈনিকের বীরত্ব, যোদ্ধাদের শিক্ষা শৌর্য্য বীর্য্যের দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের সৈন্য এবং যোদ্ধারা কোন অংশে ন্যূন তো নয়ই—বহু ফ্রণ্টে তারা অভাবনীয় কৃতিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং দেশে কেন একটা বিরাট জাতীয় বাহিনী গঠিত হবে না? আইনের বাধা বা শাস্তি—সে তো সব রকমের রাজনৈতিক কাজেই আছে! সে সব কাজ যদি গোপনে চলতে পারে, গোপন কার্য্য-সূচী নিয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদ-উচ্ছেদের চক্রান্ত চলতে পারে, তাহলে এই অপরিহার্য্য কাজটি এদেশের রাজনৈতিক দলের কার্য্যসূচীতে নেই কেন? এ দেশের সাধারণ লোকের সংগ্রামকারিণী শক্তির পরিচয় এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

সোফিয়া—সবই বুঝি এবং অনেকেই তা বোঝে। কিন্তু ঐ বোঝা পর্য্যন্ত। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জ্ঞান-গবেষণা, বিশ্বপ্রেম, যুদ্ধের মূল কারণ, উদ্দেশ্য—এ সব একেবারে নখ-দর্পণে। তাদের বক্তৃতার বহর, লেখার

ঘটাও অসামান্য। নৈতিক-জ্ঞান বলতে সে জ্ঞান তাদের গগনস্পর্শী কিন্তু দুর্নীতির কথা যা কল্পনা করতে পারি না, তারা সেই সব গর্হিত এবং অনৈতিক কাজ নির্ব্বিবাদে করে চলেছে, কেবল ঐ দেখানো আইনের ভণ্ডামিকে একটু বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলবার মতো বুদ্ধি রেখে! আর নিপীড়িত জনগণ? তারা চির-নির্য্যাতনের বোঝাকে আরও সহস্র গুণে ভারী করে সে-ভার-বহনে শক্তির পরিচয় দিয়ে পথে-ঘাটে-মাঠে শেয়াল কুকুরের মতো মরে' হাড়-পাঁজরা পচিয়ে সার করে দেশের জমিকে উর্ব্বর করে যাচ্ছে! দেশের সেবা করে মরছে! যে-সব দরিদ্র অভাগা অভাবে মরছে, তাদেরই সগোত্রীরা সামান্য বেতনের চাকুরী পেয়ে এই সব অনাচারে সহায়তা করছে। লরী চালিয়ে যারা সৈন্যদের জন্য রাশি রাশি রকমারি খাদ্য নিয়ে চলেছে, তারাও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত! কিন্তু সবই হয়ে চলেছে! কি যে অবস্থা! সময় সময় মনে হয়—

সিরিন—ওদিকটাতে একটা বড় প্রচার দরকার সোফি। আমাদের হাজার পুস্তিকা যে-কাজ না করতে পারে, আজ পথে ঘাটে মাঠে প্রত্যক্ষ এ দৃশ্য দেখে মানুষের চোখ ফুটবে, লেখা পড়ে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। আমাদের ইস্তাহারগুলো বাণী বা প্রচার-বার্ত্তা কিম্বা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত নয়,—এই সবের ফটোগ্রাফ।

সোফিয়া—সিরিন, তুমি অনেক দিন আটক আছো, তাই ঠিক এই মুহূর্ত্তে বাইরের মরা মানুষগুলোর কথা বুঝতে পাচ্ছো না। ওদের অনুভূতি বলতে যে কিছু আছে, তা আর মনে হয় না! যাক্, তবু চলতে হবে এই কাদায় গুণ টেনে উজানে তরী বেয়ে।

সন্ধ্যার পর জিপসির পোষাকে সোফিয়া প্রস্তুত হলো। জফি রহস্য

করে বল্লে,—কি, ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে জিপ্‌সি-নাচ দেখিয়ে তার মাথা ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা নাকি ?

সোফিয়া—হ্যাঁ, সত্যই তাই। আজ এখান থেকে সোজা যাবো তাঁর কাছে। সময় এবং স্থান ঠিক করা আছে।

ভোর বেলা সহরের এক হোটেলের সামনে সোফিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় বড় মিলিটারী অফিসার নেমে এলো বাইরের পোষাকে। সামনেই বড় বড় মোটর অপেক্ষা কচ্ছে। তারা উঠে পড়লো মোটরে,—মোটরগুলো হাওয়ার মতো উড়ে চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ব্রিগেডিয়ার সাহেব এসে তার সজ্জিত মোটরে উঠ্‌তে যাবেন, সোফিয়া এসে কুর্ণিশ কল্লে। সাহেব ব্যস্তভাবে হাত দিয়ে সরেযাবার ইঙ্গিত জানালেন। জিপ্‌সি মোটরের ফুটবোর্ডের কাছে দাঁড়ালো—তখন ব্রিগেডিয়ার সাহেবের নজর পড়লো জিপ্‌সির মুখের উপর। একটু চমকে উঠলেন। জিপসি বল্লে—সময় এগারোটা—স্থান ব্লু ভিলা। আমায় কিছু পয়সা দিয়ে গাড়ীতে ওঠো, পথের লোক দেখুক। সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করবার অবসর পেলে না! ধমক দিয়ে জিপসির দান আদায় হয়ে গেল। মোটরে উঠেও ব্রিগেডিয়ারের চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হলো না। জিপসি কিন্তু পয়সা পেয়েই আর পিছন ফেরা নয়—রূপেয়ার রূপে মোহিত হয়ে খুশীর হাসিতে মুখ ভরিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল। সাহেব একবার ঘড়ি দেখলেন। ভাবলেন, এগারোটার এখনও চার ঘণ্টা দেরী!

মিলিটারী ঘড়ির সময়টা কেন দ্রুত চলে না—এই কথা ভাবতে ভাবতে ব্রিগেডিয়ার-সাহেবের মোটর এসে সহরের এক প্রান্তে একটা ম্যানশনের গেটে থামলো। দ্বিতলে উঠে নম্বর দেখে দ্বারে শব্দ করলেন। ভিতর থেকে দ্বার খুলে সোফিয়া এলো এগিয়ে—আরসাদকে ভিতরে

ডেকে দ্বার বন্ধ করে দিলে। বারান্দার দ্বার বন্ধ করে ঘরের মধ্যে সাহেবকে কৌচে বসতে অনুরোধ কল্লে। আরসাদ বল্লে—চোখ দুটিতে ঠুলি লাগাও সোফিয়া, নাহলে ঢেকে রাখলেও অনুশে ঠিকরে-পড়া চোখ দুটি—

বাধা দিয়ে সোফিয়া বল্লে—যো হুকুম! তবে ঠুলি তোমার জন্যই খুলে ফেলা হয়েছিল।

আরসাদ আজ একটু বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিল বা বাইরের বাঁধের বুঝি আর প্রয়োজন ছিল না! আলিঙ্গন-ভরে সোফিয়াকে কৌচের উপর টেনে নিয়ে বল্লে—সত্যই কি তুমি ঠুলি খুলে আমায় দেখতে পেয়েছ সোফি? বলো?

সোফিয়ার ব্যবধান বা বাঁধ ভাঙ্গার অভিব্যক্তি আজ আরসাদকে উচ্ছ্বসিত করলে। ভাষার সহস্র কলায়, ভাবের সংযত প্রকাশে এতদিন যা রুদ্ধ ছিল, আজ সকাল-বেলার ভুবন-ভোলানো চাউনি, আর দান চাওয়ার কড়া হুকুমের ভঙ্গীতে সব ভেঙ্গে গেছে। আরসাদের অন্তর এতদিন মরুভূমির মতো শুধু ধু ধু করছিল,—কোন রকমে তাকে অতিক্রম করে, জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে চলাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছিল, নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে জীবনের কঠিন পথকে অতিক্রম করে চলবে ঠিক করেছিল। কিন্তু আজ সে মরুভূমির ওপর স্বর্গের অলকানন্দার বন্যা বহিয়ে দিলে সোফি। অকল্পনীয় ভাবে এসে আরসাদের অন্তরকে সঞ্জীবিত কল্লে। এ অমৃত আরসাদ পান করে চলেছে, সোফিয়ারও ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে আরসাদের ভালবাসার আবেগ, অন্তরের গভীর-তলে সুপ্ত প্রেমকে জাগিয়ে তুলেছে—সোফির দাহের জ্বালায় অমিয়-প্রলেপ হলো আরসাদের পূর্ণ-প্রাণের ভালবাসায়।

কতক্ষণ কেটে গেছে,—দু'জনে সব ভুলে গেছে! বিশ্ব-পৃথিবী

ভুলেছে, অসহনীয় ব্যথা-বেদনা-ভরা নির্ম্মম অতীত মুছে গেছে! প্রথম যৌবনে নব উষার আলোয় যে ঘন দুর্য্যোগের কুয়াশা অন্তরকে ম্লান করে দিয়েছিল, পরিণত যৌবনের পূর্ণ-অভিজ্ঞতায় মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণের প্রখরতা ও দীপ্তি তাকে আলোকিত করলে।

অজস্র চুম্বনে আরসাদ সোফিকে ভরিয়ে দিয়েছে, সব কিছু ভুলিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে সুখ-সাগরের অতল তলে। আবেশের ঘোরে সোফি বল্লে,—এমন নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে আরসাদ যে তোমার এত-খানি ঐশ্বর্য্য-ভরা অন্তরের অমর্য্যাদা করতে—

বাধা দিয়ে আরসাদ বল্লে,—তুমি নিজেই ভেবে দেখনা সোফি, তোমার কথা!

সোফিয়া চমকে উঠলো। আরসাদ আদর করে বল্লে,—সোফি, বিচলিত হয়ো না। আমি তোমার সব খবর, সব পরিচয় পেয়েছি।

এ-কথায় সোফি আরও ধৈর্য্যহারা হলো। প্রাণের অসম্বরণীয় আবেগে আরসাদকে সে বুকে চেপে নিলে। উচ্ছ্বসিত উন্মাদনা-ভরে আদর করতে লাগলো আরসাদকে। আরসাদ জীবনে প্রথম পেলে এই এতখানি আন্তরিকতার প্রকাশ, এতখানি প্রাণের আস্বাদ! অতীত জীবন শুধু যেন উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে দোল খেয়েছিল মাত্র,—এখনকার এ গভীর উপলব্ধি অভিনব।

দুপুরে খাবার নিয়ে বেয়ারা এসে বেল বাজিয়েছে, সোফিয়া তখন চমক ভেঙ্গে উঠ্‌লো। আরসাদ তার হাত ধরে বল্লে,—মেম-সাহেব ঘুমোচ্ছেন, বেয়ারা ভাববে। নাই উঠলে!

সোফিয়া—এ-নিদ্রার ঘোরে সব কিছুই সুন্দর সুসম্পন্ন করা যায়। ছাড়ো তুমি।

আরসাদ তাতে কাণ দিলে না। সোফিয়া মিষ্ট পুরস্কারে ক্ষণিকের ছুটী মঞ্জুর করিয়ে নিলে।

বেয়ারা বল্লে,—সাহেবের মোটর ফিরে এসেছে।

আরসাদ বল্লে,—পাঁচটার সময় আসতে বলে দাও। এখন প্রয়োজন নেই।

সোফিয়া—আমার বুঝি কাজ নেই?

আরসাদ—আমি তোমার কাজের ভাগ নেবো। আমায় ভার দাও সোফি,—আমি তোমায় সাহায্য করবো,—আমি তোমার সাথী হবো।

সোফিয়া আনন্দে সফলতার গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হলো। কি ভাবে সম্বর্দ্ধনা করবে—প্রাণের গভীর আহ্বানের সাড়াকে কি করে বুক ভরে নেবে,—অন্তরের উত্তাল তরঙ্গের বিন্যাস কি ভাষায় প্রকাশ করে আরসাদকে বোঝাবে সে!

পাঁচটার সময় সাহেবের মোটর এসে উপস্থিত।

সোফিয়া বল্লে,—আমি স্নান সেরে পোষাক পরে নিই। আমায় তুমি হসপিটালে পৌঁছে দেবে।

আরসাদ—দেবো, কিন্তু কতক্ষণ তুমি সেখানে থাকবে বলো, আমি তাহলে আবার সেই সময়ে গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবো।

সোফিয়া—কতক্ষণ তুমি ছুটি দিতে পারো, বলো?

আরসাদ—পাঁচ মিনিট!

সোফিয়া—যত শীঘ্র পারি আমি কাজ সেরে নেব। সত্য, তুমি কদিন থাকবে এখানে?

আরসাদ—সোফি, আমি কি তোমায় রহস্য করে বল্লাম? আমি কুড়ি দিনের ছুটি নিয়েছি তোমার কাছে সব সময় থাকবো বলে। তার

মধ্যে কালকের দিনটা তুমি নষ্ট করেছো,—একদিন পরে তুমি এসেছ!

সোফিয়া—সে ক্ষতি আমি পূরণ করবো আরসাদ, এবং ত্রুটির জন্য শাস্তি নিতেও আমি প্রস্তুত।

আরসাদ—তোমার উপযুক্ত শাস্তি আমি দিতে পারবো কিনা ভাবছি।

সন্ধ্যার পর সোফিয়া ফিরেছে আরসাদের সঙ্গে। সাহেবের জন্য পাশের আর একটি ঘর ঠিক ছিল। সাতদিনের ছুটিটা এখানে কাটিয়ে যেতে হবে।

সোফিয়া বল্লে,—আজ হস্‌পিটালে তোমাদের ইউনিটের……মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোক সত্যই বড় চমৎকার মানুষ!

আরসাদ—হ্যাঁ। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। ওর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করতে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। জানতাম, তোমার কাজে ওকে ভাল করেই পাবে। এডার খবর বলো সোফি।

সোফিয়া—এডার একটি সুন্দর ছেলে হয়েছে। সে সুস্থই আছে।

আরসাদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।—ছেলে হয়েছে? কি রকম? দেখতে খুব সুন্দর? এডা খুব খুশী? এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেল্লে,—কিন্তু এডা কোথায় আছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নয়!

সোফিয়া—হ্যাঁ, সে খুব খুশী। ছেলে কোলে নিয়ে ছেলের পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদে আর তার কথা বলে। তোমার জন্য টেবিল-ক্লথ বালিসের ওয়াড় রুমাল সব সেলাই করে দিয়েছে,—বলে একটা সুটকেশ খুলে সব গুলো এনে দিলে আরসাদের কাছে। আরসাদ অত্যন্ত আদরে গ্রহণ কল্লে সব,—প্রশ্ন কল্লে,— ওকে কবে দেখতে পাবো সোফি?

সোফিয়া—আরও কিছু দিন পরে। এখন একটু অসুবিধা আছে।

আরসাদ বল্লে—না, কোন অসুবিধা ঘটিয়ে ব্যবস্থা করতে হবেনা। সে ভালো আছে—তার ভবিষ্যতের জন্য সে অত্যন্ত অসহায় মনে করেছিল নিজেকে, তাই তোমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। সে সময় ওর একটা ভাল ব্যবস্থার জন্য আমি অত্যন্ত অস্থির হয়েছিলাম। তখন কি আর জানতাম তোমাদের সংবাদ?

সোফিয়া—আরসাদ, কেমন করে আমার খবর সব জানলে, আমায় বলবে?

আরসাদ—সোফি, তোমার ভয় নেই। আমি এমন জায়গা থেকে জেনেছি, যেখানে তোমার বিপদে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। সিরিন কেমন আছে, এইটুকু শুধু জানতে চাই।

সোফিয়া—খুব ভাল আছে আরসাদ, তোমার কথা তাকে জানিয়েছি।

আরসাদ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সোফি আলোচনা ঘুরিয়ে নিলে। যুদ্ধের অবস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা চললো। জাতীয় সৈন্যদের উপর আরসাদের আস্থা খুব বেশী। নিজের অধিনায়কত্বে বহু সংখ্যক জাতীয় সৈনিকের মনোভাব এবং তাদের ক্রিয়া লক্ষ্য করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার মূল্য অনেকখানি, এবং বিদেশীর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের সেখানে কি কাজ এবং সংখ্যা কত, এ সমস্তই আরসাদের ভাল রকম জানা আছে। সোফিয়া বল্লে—আরসাদ তুমি জানো যে সব দেশ বিদেশীদের কবলে, সেখানে মেয়েদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনী গঠিত হয়েছে?

আরসাদ—সব সংবাদই আমার জানা আছে সোফি। তবে আমার নিজের দেশের জনগণের উপর আস্থা বড় কম,--এবং আরো আস্থা কম দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর। ওদের ওপর কোন ভরসা আমি রাখি না। সেই কারণেই জনগণের বাস্তব অবস্থা আর মনোভাব অনুকুল থাকা সত্বেও আশা করবার কিছু নেই।

সোফি—বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা আজ বিদেশে গিয়ে কত বড় বিপদ, কি অসম্ভব প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন—

বাধা দিয়ে আরসাদ বল্লে বলে,—তাঁর কথা তুলোনা সোফি,—তাঁর দেশ-সেবার নিষ্ঠা তাঁর জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অটুট পণ এবং সংগ্রামে নির্ভীক দৃঢ়তার উপর আমার একান্ত শ্রদ্ধা। আমি তাঁর একটি প্রকৃত শত্রুর কাছে শুনেছি তাঁর এই সময়কার সমস্ত কার্যকলাপের কথা। যারা তাঁকে পেলে আজ ফাঁশি দিয়েও তৃপ্তি পায় না, তারা বলেছে নিষ্ঠার কথা,-তাঁর অদমনীয় জাতীয় স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা। কিন্তু সোফি তোমার দেশের লোক তাঁকে কি দিয়েছে? প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা। আর তোমরা সাম্যবাদী, তোমরা চাও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীকে উচ্ছেদ করবে! এই ধরণের কত লেখা দেখেছি, কিন্তু কার্য্যকালে তোমাদের কত ফাঁকি, নিষ্ঠার কতখানি অভাব,—সুবিধাবাদীর মত তোমরা শুধু বড় বড় কথা কইছো।

সোফিয়া অসহিষ্ণু হলো। বল্লে,—কে বলেছে আরসাদ আমাদের দল তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,? আমরা যে নীতি নিয়ে চলেছি, তা থেকে কোন মুহূর্ত্তে বিচলিত হইনি; সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদ-সংগ্রামে আমরা তাঁর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবো। সে সংগ্রামের প্রস্তুতির, ক্ষেত্র, ধারা, রূপ আমাদের সুস্পষ্ট। আমাদের কোথাও ইনফিরিয়রিটি-কমপ্লেক্স নেই। আমরা জানি পেটি বুর্জ্জো-

য়ার সংখ্যার সঙ্গে আমাদের অগণিত জন-সংখ্যার এবং সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের তুলনা হতে পারে না। সংগ্রামের মধ্যে পেটি-বুর্জ্জোয়ারা আত্মসমর্পণ করবার সুযোগ পাবে। জগতের গতি, যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের দৃষ্টি ফুটিয়ে দেবে, যাতে তারা ঐ জাতীয়তাবাদীর লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করতে এসে প্রত্যক্ষে ও দৃষ্টান্তে উপলব্ধি করবে জাতীয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাই আমরা শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রামই করবো না, তাদের প্রত্যক্ষ করাবো যে তোমাদের এই একনিষ্ঠ সংগ্রাম, তোমাদের দেশাত্মবোধ পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখিয়ে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র রূপ ধরে দেব তোমাদের সামনে।

আরসাদ—আমি তোমাদের নীতি ও কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ জানিনা। বিভিন্ন সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী সকলেই তো দেখছি ঐ হৈ-চৈএর রাজ নীতি করে চলেছে। মোট কথা, আমার আস্থা নেই, সোফি। রাগ করোনা, বড় বড় মার্কসবাদী খ্যাতনামা সব পুঁথিপত্রে মত-ছাপানো কখনও কখনও পড়ি তো—আর আগে সিরিনও আমায় প্রায় গুলে খাওয়াতে পাল্লে বাঁচে এমন করে পড়িয়েছে! কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে তার উল্টো!

সোফি বুঝলে এদের সবার মুখে প্রায় একই কথা! রাশিয়ার উপমা, ষ্টালিনের সুবিধাবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক নীতি এদের অবিশ্বাসের মূল! সুবিধাবাদীদের কাজের ফলে প্রতিক্রিয়া এইভাবেই হবে। আজ আর এগিয়ে কাজ নেই, সময়ে আবার ভাল কথা বলা যাবে।

সোফিয়াকে নীরব দেখে আরসাদ বল্লে,—তুমি ক্ষুণ্ণ হলে? আমি কিন্তু ট্রটস্কি-পন্থীদের খুব শ্রদ্ধা করি,—সিরিন খুব ভাল ভাবেই তা জানে। আমি যখন জার্ম্মাণীতে ছিলাম, তখন ট্রটস্কি-পন্থীদের সঙ্গে খুব মিশতাম এবং ট্রটস্কির লেখা কোন বই-ই আমার পড়তে বাকি নেই। প্রকৃত

সাম্যবাদী হিসাবে তাঁকে আমি আমার শ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধা দিই,—কিন্তু তাঁদের সংগঠন কতটুকু এবং সংখ্যাতেও তা অতি অল্প,—তার উপর বিশ্বব্যাপি বিরোধিতা—কাজেই ট্রটস্কি-পন্থীদের সফলতা স্বপ্নের মতো মনে হয়!

সোফিয়া—আরসাদ, ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়, সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গঠিত বৈপ্লবিক সংগঠনে যোগ দেবার মতো মনুষ্য-সংখ্যা অল্পই থাকে, কালে তার বিরাট বৃহৎ গোষ্ঠির পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরসাদ আর বেশী কথা তুললে না। সোফিয়া বল্লে,—সেই জমিদার ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ো। তার এক ভাগ্নের কাছে আমার প্রয়োজন আছে। তার নামে একখানা চিঠি নিতে হবে।

সোফিয়াকে বেশ কিছু দিন পরিশ্রম করেই কাটাতে হলো। খবর পেলে যে রাত্রে-তারা শেরিয়ার কাছ থেকে চলে আসে, তার পরের রাত্রেই শেরিয়ার বাড়ী তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাস হয়েছে। পুলিশ এসেছিল নিষিদ্ধ কাগজ এবং পুস্তিকার সন্ধানে। পুলিশ এডার পরিচয় জেনেছে সম্পূর্ণ পর্দ্দানশীন মহিলা, শেরিয়ার বোন। তাই বেশী করে আর তত্ত্বানু-সন্ধান চলেনি। এদিকে কজন আত্ম-গোপন-কারী কর্ম্মীর সন্ধান পেয়ে পুলিস ওদের পরিচিত বহু বাড়ী ও ইউনিয়ন তোল-পাড় করে খুঁজে দু'জন কর্ম্মীকে গ্রেফ্‌তার করেছে, কাগজ-পত্রও হস্তগত করেছে। অফিস-সংক্রান্ত কাজের বেশ ক্ষতি করেছে। গ্রেফ্‌তারের কারণ যখন সোফিয়া জানলো, তখন রেগে আগুন হলো। সন্ধান করতে ভয়ও হলো—সঙ্গে সঙ্গে

দূরে আরও নির্জ্জনে সিরিনের থাকা প্রয়োজন। রাত্রেই সে ব্যবস্থার জন্ম সোফি রওনা হলো।

হঠাৎ গভীর রাত্রে সিরিনের আস্তানায় মোটর থামার শব্দে সিরিন জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে সোফিয়াকে। ঘরে আলো জ্বাললো। জানলাগুলো বন্ধ আছে ভাল করে,—শীত পড়েছে দারুণ। মোটা একটা ওভারকোটে দেহ ঢেকে সোফিয়া এসে ঘরে ঢুকলো, মুখে চোখে সুগভীর ক্লান্তি। ব্যস্ত হয়েই সে ঘরে ঢুকলো। সোফিয়াকে দেখে জফি বল্লে,—আবার কি গো-যান নিয়ে? প্রস্তুত হতে হবে নাকি?

সোফিয়া রাগের ভাণে বল্লে,—বেশ তৈরী হয়ে গেছ! ভদ্রতার স্বাগত-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত নেই!

জফি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে কম্বলখানা সরিয়ে দিয়ে বিছানা ঝেড়ে সোফিয়ার গায়ের ওভারকোটটা খুলে নিলে। সোফিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকে দুহাতে তুলে বিছানায় বসিয়ে রাগখানা গায়ে জড়িয়ে দিলে, তারপর সিগারেট-কেশ খুলে সিগারেট নিয়ে মুখে তুলে ধরিয়ে দিলে। সিরিন ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে এলো। সোফিয়াকে ধরে এনে বসিয়ে দিলে বিছানাটায়। দারুণ শীতের রাত্রে সিগারেটের উত্তাপ তিন জনকেই একটু সতেজ কল্লে। সিরিন বল্লে,—তোমরা একটু বসো। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। সোফি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছে।

জফি বল্লে,—সোফিয়া এ-কদিন তোমার পরিশ্রম গেছে খুব—না? তোমার চেহারা দেখে বুঝছি। চেহারায় আরও কি যেন আভাস পাচ্ছি!

সোফিয়া—তোমার একটা বিশেষ মত প্রকাশ করা চাই সবতাতেই না?

জফি—সেটা দোষের?

সোফিয়া—তোমার আবার দোষ কোথায়! তুমি তো সর্ব্বগুণাধার।

জফি—খুব ভাল লাগে তোমাদের মুখে গুণ-কীর্ত্তন আর রূপ-বর্ণনা শুনতে।

সোফিয়া—চব্বিশ ঘণ্টা শুনেও সাধ মিটছে না?

জফি—তা কি হয়! সিরিন আর প্রশংসা করে কতটুকু? সবই তো—

সোফিয়া—দাঁড়াও। তুমি এত বড় অকৃতজ্ঞ। সিরিন চা তৈরী করে আনলে। সোফিয়া বল্লে,—সিরিন অনেক অশুভ খবর এনেছি। কাজের খবর এবং গোলমালের খবরও যথেষ্ট, জফিকে একটা ভাল খবর দেব। আগেই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমায় এমন রাগিয়ে দিলে যে বলা হয়ে ওঠেনি।

সিরিন—এ তোমার বড় অবিচার, সোফি। যে ভাবে জফি তোমায় অভ্যর্থনা কল্লে, তার পরেও রাগ থাকতে পারে?

সোফিয়া—ও, এইটুকুতেই আমাদের খুশী করা সম্ভব মনে করো সিরিন? তুমি বড় ভাবুক হয়ে গেছ তাই ওদের ওপর অপ্রয়োজনীয় উদারতা দেখাও। দেখাও, কিন্তু এর জন্য একদিন অসুবিধায় পড়তে হবে।

জফি—বহুত মেহের-বাণী বেগম-সাহেব, আর বেশী কড়া আইন জারি করো না। সত্যি, মেয়েরা কী ভীষণ কঠিন ন্যায়পরায়ণ—না, তামাসা নয়, এ ধারণা আমার চিরদিনের।

সিরিন—সোফি, তোমাদের ঝগড়ার ব্যবস্থাটা কি বাইরে থেকে তৈরী করে এনেছো? না, অন্য কোথাকার রেশ টেনে চলেছো?

বাধা দিয়ে জফি বল্লে—না, সে রেশ স্থায়ী এবং ব্যাপক—এটা তোমাদের স্বধর্ম্ম!

সোফিয়া—জানো জফি, কি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি এবং কতখানি ক্ষতি হয়েছে! বলি—আমাদের কজন কমরেড আত্মগোপন

করেছিলেন, কটি মেয়ের ওপর ভার ছিল ওঁদের সব ব্যবস্থা করবার। সে অবস্থায় তাঁরা কমরেডদের সর্ব্ববিধ কাজ সংবাদ-সরবরাহ ইত্যাদি করতেন। ইতিমধ্যে পড়ে গেল প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—

জফি তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো—ভাল কথাই তো! কাজগুলো সহজে এবং সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারবে।

সোফিয়া—চুপ করো জফি, তোমাকে টিপ্পনী কাটতে বলেনি কেউ। সে প্রেমের গভীরতা কতটুকু তা বুঝতেই পাচ্ছো! এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে জেলশি, তার পর জেলশি থেকে জটিলতা, লোকজানাজানি, খোঁজ-খবর থানাতল্লাস! গ্রেপ্তার, ইউনিয়ন, অফিস, পাঠচক্র পর্য্যন্ত তোলপাড় করে পুলিশ সারা জেলাটাকে বিব্রত করে তুললে। কাজের কতখানি ক্ষতি হলো অবশ্য আমার জানা একজন মাত্র ছিল ওদের মধ্যে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়—আমি মিটিং ডাকিয়ে কার্য্যকরী-সমিতি থেকে কঠিন সাজার প্রস্তাব পাঠিয়েছি,—তাদের কঠিন সাজা দিতেই হবে। কত ক্ষতি বলো তো?

সিরিন—কি সাজা দিলে তোমরা?

সোফিয়া—দলের কোন কাজে তারা থাকতে পারবে না—যদি সম্ভব হয় প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে দলের কাজে দিতে হবে,—তার পর ছমাস গেলে তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা হবে।

সিরিন—কেউই তো স্বেচ্ছায় কিছু প্রকাশ করেনি?

সোফি—সে প্রশ্নই ওঠে না! স্বেচ্ছা অর্থে কি বলতে চাও? স্বেচ্ছায় জেলশি হয়নি? প্রেম করতে গেলে একটা দিক ভাবলে তো চলবেনা—সবক্ষেত্রেই যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁদের সহিষ্ণু আর সংযত হওয়া দরকার—নাহলে কাজের অসম্ভব ক্ষতি করা হয়।

সিরিন—আরে, তুমি আমায় বলছো কেন! আমি কি তোমাদের

সাজা দেওয়ার প্রশ্ন তুলেছি? আমি জানতে চাই, ওরা কতদূর বুঝলো ওদের অন্যায়ের কথা।

সোফি—তা ভাল করেই বুঝেছে। শাস্তিও তারা মাথা পেতে নিয়েছে। আমার পরিচিত না হলেও আমার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছে। আমাদের কাজে কজন মেয়েই বা আসে! তারা যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ না করে, কাজের আদর্শকে যদি সবচেয়ে বড় বলে না মানে, তাহলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এসে তারা কাজের বেশ বড় রকম ক্ষতি করে। রোমান্সের মোহে সাময়িক উত্তেজনার বশে যারা আসে, তারা কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশী,—এ সম্বন্ধে আমার ভাল রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগে তুমি যখন এ-সব বলতে, আমার খারাপ লাগতো।

জফি—তাদের ছোট গণ্ডি আর মনের সঙ্কীর্ণতার জন্য অনেক কিছু গোলমাল ঘটে—ঐ যে বল্লে,-জেলশি চাপতে পারে না। তার কারণ বৃহতের মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দেবার মত মনের প্রসারতার অভাব! আধুনিক জগতে মেয়েরা প্রতিযোগিতায় পুরুষের সমধিকারী হচ্ছে—সে কি স্বাধীনতা? ঘোরাফেরা, চালচলনই শুধু আয়ত্ত করেছে। সেটা তাদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং হালকা ফূর্ত্তির জন্যই। Individual pleasure সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা যথেষ্ট এবং সেজন্য অনেক কিছুই তারা করতে পারে। সত্যকার স্বাধীনতার যে রূপ, তা তারা ঠিক বোঝে না।

সোফিয়া—সে কথা আজকের দিনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এর আগে এভাবে দেখবারও সুযোগ হয়নি। যুদ্ধের জন্য মেয়েরা বাইরের কাজ পাচ্ছে যথেষ্ট, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার রূপ এমন বিকৃতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সে আর বলবার নয়। স্বাধীন উপজীবিকায় অর্থ উপার্জ্জন করে তারা অপকর্ম্ম যে কতই করছে! অতি সামান্য বিলাসের সামগ্রী

পাউডার বা একটি লিপষ্টিকের লোভে এক-সন্ধ্যা মিলিটারীর সঙ্গে ঘুরে আসবার আনন্দ, সামান্ত সাজ-পোষাকের লোভে সারা-রাত নেচে কাটানো ইত্যাদি—

সিরিন—সোফি, এ-সব ছবি আমি জেলে বসে দেখেছি এবং শুনেছি আমার জেলের বন্ধুর কাছে। জেলে আসবার আগে দেশকে এতখানি উন্নত দেখে আসবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি!

সোফিয়া—নির্ম্মমতা হৃদয়-হীনতার কথা বলে শেষ করা যায় না। দেশের দরিদ্র, রোগক্লিষ্ট অনাহারীর মৃত-স্তূপের পাশ দিয়ে রং-বেরংএর পোষাক পরে সিনেমায় যাওয়া, পলকা-বিলাসে [illegible] অসংখ্য মেয়ের দল যখন দেখি সিরিন,—তাদের মধ্যে অনেকের আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে, দেশের শিক্ষিত ঘরের মেয়ে—কাজেই বিদেশী মিলিটারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা তাদের কাছে নিজেদের দেশের প্রতিভা বিকাশ করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কেমন করে তারা হারাবে? আমি ওদের সহ্য করতে পারি না!

সিরিন—ওরা অত্যাধুনিকতা (ultra-modern) জাহির করতে এত অধীর যে দেশ বা সমাজের ক্ষতির কথা ওদের মনেই আসে না। নামের সঙ্গে ছাপই আছে বড় বড়! এতদিন শুনে আসছিলাম মেয়েরা শিক্ষা পায় না! কিন্তু শিক্ষার ছাপ তো এখন ভাল করেই দেওয়া হয়। বাপ-মা কত কষ্ট করে পড়ান্, সমাজের লোক বাহবা দেয়।

জফি—শিক্ষার ছাপ যে বল্লে, সেটা কোথায়? মনে? না, প্রয়োজনের বস্তুতে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার ছাপে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হয় এই তোমাদের বিশ্বাস্ নাকি?

সোফিয়া—আমরা তা বলছি না; তবে দশজনে বলে, তার পুনরুক্তি কচ্ছি। আমাদের (theory) থিওরী, যুগ-যুগ ধরে যারা নির্য্যাতন

ভোগ করেছে, অত্যাচারিত হয়েছে—তারা মাথা তুলে একদিন সমাজে বিপ্লব আনবে—,সে-বিপ্লব মেয়েরা ঐ পলকা সাজ-পোষাক আর নাচ তামাসায় আনলো নাকি, তাই ভাবি। যাক এ কথা। ওদের কথা নিয়ে আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই! সব দিক দিয়েই আজ দেশের কি অবস্থা—কমরেডরা কারাগারে, কর্ম্মীর অভাব, পুলিসের তাড়না, যুদ্ধের অনুকূল গতি!

সোফিয়া পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালে, এত অন্যমনস্ক যে অন্যদের দেবার কথা ভুলে গেল।

সিরিন বল্লে,—বুঝতে পারি সোফি, তোমার এখনকার মনের অবস্থা।

জফি সিগারেট নিয়ে সিরিনের সামনে ধরলো। তখন সোফিয়ার হুঁশ হলো যে ওদের দিতে ভুলে গেছে। সে একটু অপ্রস্তুত হয়েছে দেখে সিরিন যল্লে—সোফি, তোমার অপ্রতিত হবার কারণ নেই। জফি খুব ভাল করেই বোঝে, এ-রকম আলোচনা শেষ করতে হয় সিগা-রেটের আগুনে।

সোফিয়া—হ্যাঁ, তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করেছি—একেবারে ······সীমান্তের কাছে। সেই বৃদ্ধাই থাকবেন তোমাদের আবরণ। এডাকে সঙ্গে দেবো,—তুমি বুড়ীকে দেখবে। আর বিশেষ দেখাশুনার জন্য জফি সাহেবেরও থাকা প্রয়োজন। ওখানে আর অত গোপনতা রক্ষা করতে হবে না,—জঙ্গল আর তেপান্তরের মাঠ। তাছাড়া বাড়ীটা হলো তার এক আত্মীয়ের।

সিরিন বল্লে,—সোফি, তুমি আবার সেই হৃদয়হীনটার সাহায্য নিয়েছ?

সোফিয়া—সাহায্য নিই নি গো,—সেই সূত্রে ঐ লোকটার সঙ্গে

আলাপ হয়েছিল। আমি নিজে তার কাছে যাইনি। তবে তার আত্মীয়ের বাড়ী বলে সম্পূর্ণ একেবারে নিরাপদ। পুলিশের ভয় নেই, এইটুকু জানালাম। কোন ভয় নেই সিরিন!

সিরিন— আরসাদের খবর কি, সোফি?

সোফিয়া—অনেক দূর এগিয়েছে—বোনের জন্য ব্যাকুল! একবার যদি দেখা করিয়ে দিতে পারি, সে জন্য আমায় কত অনুরোধ জানালে।

সিরিন বল্লে—রহস্য ছাড়ো। সত্য বলো, সে এতখানি এগিয়েছে? দেখতে আসতে চায়?

সোফিয়া—সত্য সিরিন, এসেই যে বলেছিলাম, ভাল খবর,—তা এই। তুমি তোমার ভাইকে সম্পূর্ণ ভাবে তোমার সাথী পাবে। জাতীয়তাবাদের ঝোঁক তার এখনও বেশ আছে। সে সত্যই শিক্ষিত, জ্ঞানী—তার আচ্ছন্নতা সহজেই কেটে যাবে।

সিরিন ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—সোফি, যেদিন বুঝবে ওর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব, একটুও দেরী করো না।

সোফিয়া কিছুই বল্লে না—গভীর দৃষ্টিতে সিরিনের পানে চেয়ে রইল, ভাবতে লাগলো, দুজনের প্রতি দু-জনের এতখানি আন্তরিক সহযোগ তবু কি করে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গিয়েছিল?

জফি দুজনের মনই পড়ে নিলে। নিয়ে বল্লে,—ভাই-বোনের আকর্ষণী শক্তিতে মিল আছে।

সোফিয়া—জফি, তোমার মনে ঐ কথাটাই শুধু জাগলো কেন?

জফি—ওটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে একজনের চোখের মধ্যকার টেলিভিশনে!

সোফিয়া—আমি কালই চলে যাবো সিরিন। পরের বারে আমি বোধ হয় আসতে পারবোনা। কমরেড "এস" আসবেন। তিনি

তোমাদের সেখানে পৌঁছে দেবেন। আমি পরে যাবো, খুব সম্ভব। ষ্টেশন পর্য্যন্ত মোটরের ব্যবস্থা থাকবে। বুড়ী এবং এডাকে পাবে ষ্টেশনে। সেখান থেকে একসঙ্গে যেতে পারবে।

সিরিন—জানো সোফি, আর এক দিন যদি দেরী হতো বাড়ী ছাড়তে, তাহলে বিশেষ মুস্কিলে পড়তুম। অবশ্য তিন মাইল্ দূরে পুলিশ এলেও শেরিয়ার কাছে সে খবর পৌঁছোয়। জ ফির জীবনে "এম-পি"র উৎপাতের অভিজ্ঞতা অনেক থাকতে পারে কিন্তু নরক মন্থন-করে' আনা সি-আই-ডি পুলিশের জুলুম-কণ্টকীর অভিজ্ঞতা নেই! এবার একটু হচ্ছে। আর্মির মধ্যে কাজের প্রসার দিন দিন বাড়ছে খবর পেলাম,—সে প্রসার কেমন আর কি রকম, আমায় সব বলো।

পকেট থেকে দু'তাড়া কাগজ বার করে সোফিয়া সিরিনের হাতে দিলে,—আর একখানা নোট-বুক। বললে,—কমরেড "এস" এসে ম্যাপগুলো দিয়ে যাবেন।

সিরিন—তোমার এখন একটু ঘুমোনো প্রয়োজন সোফি,—আধ ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ ঘুমোও।

সোফিয়া বললে,—সেই ভোরের দিকে ঘুমোবো। জফির দিকে ফিরে বললে,—কারখানার মজুরের অতিথি হয়ে দিন কেমন কাটছে জফি? নানা দিক দিয়েই অসুবিধা হচ্ছে খুব, না?

জফি—অসুবিধার কথা মনে হয় না! ওদের আতিথ্য খুব চমৎকার। এত যত্ন করে বাড়ীর মেয়েরা! অনেক সময় আমরা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে ওদের গোপনতা এবং সতর্কতার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেখে! লোক আসে-যায়, ওরা কেমন সহজে বাইরে থেকে তাদের বিদায় করে। কবার রাত্রে কর্ম্মীরা এসেছেন। কেমন সতর্ক হয়ে তাদের আনে আমাদের কাছে; আবার নিয়মিত সময়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে

আসে। এদের এই ভাবে প্রস্তুত করে তোমরা আত্ম-গোপনের স্থানটুকু এমন নিরাপদ করতে পেরেছো।

সোফিয়া—ওরা যদি কোন কিছু গ্রহণ করে, তবে তা রক্ষা করার জন্য জীবন-পণ করে। এবার আমার সে অভিজ্ঞতা ভালই হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই ওরা এনে দেয় ?

সিরিন—প্রয়োজনের বেশী আনে অনেক সময়। ওরা ভাবে খাবার ব্যাপারে আমরা বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। মোটেই তা নয়। কাল তুমি খাবে ওদের খাবার, ভালই লাগবে।

সোফিয়া সারাদিন কাটিয়ে আবার সন্ধ্যায় বিদায় নিয়েছে। কদিন কাটলো। কমরেড এস মোটর নিয়ে এসেছে এদের অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য। গৃহস্বামী এবং বাড়ীর সকলে একত্র হয়ে ওদের বিদায় দিতে এলো। মজুরের অতিথি-সৎকারে ওরা মুগ্ধ, সে কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিলে।

সিরিন বল্লে,—দিন আসবে, যেদিন তোমাদের সঙ্গে আবার অবাধে মিশতে পারবো, লুকোবার প্রয়োজন হবেনা। তোমরা প্রস্তুত থেকো।

মিস্ত্রি বল্লে,—আমার এখানে যতজন আছে ইউনিয়নে, তারা সকলেই দৃঢ়-সঙ্কল্প। কাজ ভাল করেই চলবে। তুমি যে সব উপদেশ দিয়েছ, সেই মত আমাদের কাজ ভাল ভাবেই চলছে। আমাদের খবর নিও এবং দিও। আমরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমাদের ইউনিয়নের সদস্যরা বিপ্লবী—তারা গতানুগতিক নিয়মে ইউনিয়ন চালায় না।

ওরা খুশী মনে বিদায় নিলে।

সীমান্তের প্রায় কিনারায় পাহাড়ের অপর দিকে বিপজ্জনক এলাকা

না হলেও বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নয়! তবে এদিকে পাহাড়ী জংলী ছাড়া অন্য বাসিন্দা বড় নেই। জমিদার এবং ধনীদের প্রমোদ-উদ্যানের মতো কখানা বাংলো আছে। তারই একখানায় বৃদ্ধাকে আবরণ করে থাকা। এবার বড়-মানুষি জাঁক-জমক একটু বেশী পুলিশের চোখ ধাঁধাবার জন্য। এডা এসেছে শিশুটিকে নিয়ে। বৃদ্ধা সিরিনদের ফিরে পেয়ে খুব খুশী। প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিল সীমান্তের কাছে বলে, কিন্তু সিরিন বোঝালো, এখানে কোন ভয় নেই। নিরীহ জংলী পাহাড়ী পল্লীতে বিমান-আক্রমণ হবে না—যদি হয়, তাহলে আত্ম-রক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

মস্ত বড় বাংলো। বাগানখানিও বেশ বড়। দূরে একটা সরু নদী। মাঝে মাঝে মিলিটারী রসদ নিয়ে নৌকো যায়। মিলিটারীর ভীড় নেই, তবে কখনও কখনও এদিকে আসে। পর্দ্দানশীন ভাবে থাকায় কোন অসুবিধা নেই। বৃদ্ধা আছে অসুস্থতা এবং বার্দ্ধক্যের আবরণ নিয়ে।

শিশুটিকে নিয়ে এডা অনেকখানি শান্তি পেয়েছে। শেরিয়ার কাছে সে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল—এখানে আরও সুযোগ মিলেছে। সোফিয়া এসেছে এক-মাস পরে খবরের রাশি নিয়ে। যথাযথ ভাবে এদের পৌঁছে দিলে সংবাদ। এডার শিশুকে নিয়ে কাটালো কিছুক্ষণ—সিরিনকে বল্লে,—খোকার সুমধুর সঙ্গ পেয়ে তোমরা নিশ্বাস ফেলতে পারছো!

সিরিন—সত্যি, কিছুক্ষণ আমাদের যেন অন্য জগতে নিয়ে যায়।

সোফিয়া—দুদিন আগে বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখে এসেছি খুব ভাল তৈরী হচ্ছে। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এর আগে আর দেখেছি বলে মনে হয় না। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে প্রায় সব কিছুই।

তারপর জনান্তিকে প্রশ্ন কল্লে,—জফিকে তোমার জীবনের কোন কথা বলোনি সিরিন?

সিরিন—না, অতীতের ব্যক্তিগত কথা কিছুই বলিনি। বলেছি রাজনীতির প্রত্যেকটি কথা। তবে একদিনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমি তার কথা বলেছি এইটুকু মাত্র যে নির্ম্মম ভাবে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে! আমার মনে হলো, আমার সন্তানের কথা বলেছি, ও তা বুঝেছে! একটা মাত্র প্রশ্ন করেছিল, কোনমতেই তাকে এখন কাছে পেতে পারোনা? এছাড়া আর কোন প্রশ্ন কোন দিন করেনি। পাছে আমি নতুন করে ব্যথা পাই বা আমার অতীত ওর প্রয়োজনীয় নয়,—তাই হয়তো কোন দিন প্রশ্ন করেনি! আমিও ওর অতীত জীবনের কিছু জানি না সোফি, জানতে চাইওনা। এখানে একবার আরসাদকে আনা সম্ভব হবে?

সোফিয়া—হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে। আনবো তাকে শীগগিরই। সামনের মিটিংএ তাকে আনবো—যে কজন কমরেড আসবেন, তাঁরা সবাই মিলিটারী এক্সপার্ট। এখানে আসবার একটু অসুবিধা আছে পথটার জন্য,—নাহলে খুবই নিরাপদ।

সিরিন—একটা কথা বলো তো সোফি,—আরসাদের অন্তরের সবটুকু ব্যথা মুছিয়ে দিতে পেরেছ? সেও কি পেরেছে কিছুটা তোমার মুছে দিতে?

সোফিয়া অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলো। উচ্ছ্বাস-ভরে বল্লে,—কিছুটা নয় সিরিন, আরসাদ আমায় নূতন জীবন দিয়েছে—আমায় পূর্ণ করেছে, জীবন্ত করেছে। আমি কতটুকু পেয়েছি, তা তুমি তার কাছেই জানতে পারবে। সত্যি সিরিন, এত সুন্দর প্রাণ কোথায় পেয়েছিলে তোমরা!

সিরিন—মানুষ সন্ধান করে না বলেই পায় না সোফি, নাহলে সুন্দর প্রাণের অভাব কি সত্যই আছে সুন্দর পৃথিবীতে?

এ সময় এডার শিশুটিকে কোলে নিয়ে জফি এলো—স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর শিশু শশীকলার মতো বেড়ে উঠছে দিন দিন। জফির কোলে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সিরিন দেখলো। সোফিও তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে জফির পানে। শিশুর হাসির ছটায় সময় এবং স্থান হয়ে উঠেছে অভিনব।

এডা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো।

জফি বল্লে,—এডা তোমার ছেলেকে এবার মিলিটারী ট্রেনিং দেবো—কেমন?

এডার অতীত স্মৃতি বুকে এমন ধাক্কা দিলে—চোখ জলে ভরে এলো। জফি অপ্রতিভ হলো। সে শিশুকে তখন হাসাচ্ছিল, সেই হাসি-ভরা মুখখানি এডার মুখের উপর তুলে দিলে। শিশুকে নিয়ে মাকে অন্যমনস্ক করে দিতে চাইলে। তার পর চা খাবার সময় নানা কথা এডাকে নিয়ে। এডাও তাতে নিজেকে সামলে নিতে পারলো।

সিরিন সোফিয়াকে বললে,—জফি খোকার ফটো তুলেছে সোফি, তুমি নিয়ে যেও, ব্রিগেডিয়ার-সাহেবকে দেখিয়ো। এডার ব্রিগেডিয়ার সাহেব বড় চমৎকার লোক না কি! আমি একবার দেখা করবো ভদ্রলোকের সঙ্গে। সত্যি, এডার মুখে তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয়।

এডা বললে,—আলাপ হলে আমার চেয়ে বেশী ভাল বুঝতে পারবে তাঁকে—কত সুন্দর তিনি!

সিরিন—থাক, আর বলোনা, শুনলে আমার হিংসে হয় ভারী।

সোফিয়া রাগ দেখিয়ে বললে,—হিংসুটে লোক কারও প্রশংসা সহ্য করতে পারে না! এডা তুমি আমার কাছে বলো।

জফি—না, এখন থাক, তাহলে আমরা হয়ে পড়বো অপ্রয়োজনীয়—যতটুকু আমাদের কাছে আছো, আমরা তোমায় পেতে চাই।

সোফিয়া—বেশ, তবে কোন কথা বলে দরকার নেই। তোমার যত রকম—

জফি—থামলে কেন সোফি? বিশেষণগুলো লাগাও।

চায়ের পেয়ালা তৈরী, এডা বললে,—ওকে আমায় দাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জফি—তোমার চা ঠাণ্ডা হবে না? আমি ওকে নিয়ে বেশ চা খেতে পারবো। চামচটা ওর হাতে দিচ্ছি। তাহলে অস্ত্রগুলো আর আক্রমণ করবেনা।

দুপুরে বসেছে তিনজনে। টাইপ-মেশিনে সিরিন ছাপছে একটা ব্যবস্থা-লিপি। এ সব কাজে ক'ঘণ্টা কেটে গেল। রাত্রে একটা মিটিং আছে—সেজন্য কাগজ-পত্র তৈরী করতে হবে।, দেশের অবস্থাও দিন দিন সঙ্কটময় হয়ে উঠছে।

রাত্রে তিন জন কমরেড এসেছেন। পরামর্শ বৈঠক বসেছে। অনেক সংবাদ তাঁরা বহন করে এনেছেন।

প্রতি-দিনই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার অতি-দ্রুত পরিবর্ত্তন সূচিত হচ্ছে, কিন্তু এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক নেতারা কোন সংগ্রাম-মূলক কাজ আরম্ভ কচ্ছেন না! সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাও তাঁদের প্রস্তুত নেই। সাম্রাজ্য-বাদীর সঙ্গে তাঁরা সংগ্রাম করবেন, দেশকে স্বাধীন করবেন, এটা সহজ ভাবে জানা আছে—এই পর্য্যন্ত।

সিরিন বললে,—বেশ তো, তাঁরা সংগ্রাম করবেন বলছেন, স্বাধীনতাও

চান, আমাদের সুযোগ মিলবে সাম্রাজ্য-বাদীর বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ঘোষণার অভিনয়ে। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের ধারা নিয়ে গোলমাল বাধা সম্ভব, সেটা যতদূর কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে করা যায়, করলেই চলবে। সাম্রাজ্য-বাদীর আওতায় দেশের জাতীয়তা-বাদী বা আপোষ-বাদীরা যখনই তথাকথিত সংগ্রাম বা সংগ্রামের মত কিছু আরম্ভ করবে, আমরা তার সুযোগ গ্রহণ করবো নিশ্চয়, তবে আমাদের যদি তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে চাতক পাখীর মতো বসে থাকতে হয়, তাহলে সময় এসে দ্বারে আঘাত দিয়ে ফিরে যাবে,—সেজন্ম অবস্থাকে এবং জনগণকে প্রস্তুত রাখা আমাদের প্রধান কাজ। উপযুক্ত সময়ে সংগ্রাম সুরু করলে ঐ সব নেতার দল বসে থাকতে পারবেনা—বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামবে।

"কমরেড "এস"—সে ব্যবস্থা সাধ্যমত আমরা করছি। বাম-পন্থী জাতীয়তা-বাদীদের মনোভাব সংগ্রামের দিকেই—তবে তারাও সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ নয়। এখনকার অবস্থায় জনগণের অসন্তোষ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে দেশ-ব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ করবার উপযুক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং আমাদের কার্য্যসূচী অনুযায়ী আমরা সংগ্রাম সুরু করতে পারি। কোন কোন জায়গায় তা সম্ভব সে সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ আমি লিখে এনেছি।

সিরিন,—বিভিন্ন ফ্রন্টের সামরিক সংবাদ এবং আমাদের দলের কার্য্য-কলাপ জাতীয়তা-বাদী নেতার সংগঠিত মুক্তি-ফৌজদের প্রত্যেক বিষয়ের সংবাদ কতদূর সংগ্রহ হয়েছে? নৌ-বাহিনীতে দেশীয় যোদ্ধা নাবিক, সমর-শ্রমিকের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কমরেড এ"—এ-বিষয়ে খুব শীগগিরই সম্পূর্ণ তথ্য তোমায় দেবেন, তবে আজও যা লিখে এনেছি তাতে তোমার প্রোগ্রাম তৈরী করবার অনেকখানি সুবিধা হবে। আমরা আশা করছি, আগামী সপ্তাহে ডক এবং রেলওয়ে

ধর্ম্মঘট আরম্ভ করবো। সে বিষয় তোমায় আগেই জানিয়েছি। চাহিদার দাবী করে দীর্ঘ দিন কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়েও ওরা তার জবাব পায়নি, আগামী সপ্তাহে চরম-পত্র দিয়ে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করবে। উত্তরের প্রতীক্ষার দিন অবশ্য অল্পই থাকবে। কারণ ওদের উত্তর এক রকম পাওয়া গেছে। ওরা এ সময় কিছুই করতে রাজী নয়, তাদের এ সঙ্কল্প কাগজে-কলমে পেতেও দেরী নেই।

সিরিন—তবে তো খুব ভাল সংবাদ। এ দিকে সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। তারা প্রতিদিন পথে ঘাটে দেখছে সাম্রাজ্য-বাদীর নির্ম্মম শোষণে এবং ধনী-সম্প্রদায়ের জঘন্য লোলুপতায় প্রতিদিন অনাহারে খাদ্যাভাবে হাজার হাজার লোক গ্রামে-সহরে পথে-ঘাটে মরছে; আর সামরিক অফিসার, সৈনিক, সমর-শ্রমিকেরা জঞ্জালের মতো গাড়ী-বোঝাই খাদ্য জলে ফেলে দিচ্ছে বা আগুনে পোড়াচ্ছে! মৃত দেশবাসীর সাড়া নেই,—দানবের মতো সমর-যন্ত্র এবং দস্যুর মতো সৈনিক অফিসারদের অস্ত্র-সজ্জিত দেখে আতঙ্কে শিউরে আছে। আর নয়, ইস্তাহারগুলো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেবার আরও ভাল ব্যবস্থা করো। তথা-কথিত জাতীয়তা-বাদী নেতাদের সংগ্রামে নামাবার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য-অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করে দাও। যত শীঘ্র পারো তোমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আজকের এই সব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করো,—এবং কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা করো।

এর পর বিশেষ বিশেষ অবস্থা স্থান এবং সময় সম্বন্ধে আলোচনা হলো। অনেক রাত্রে মিটিং শেষ করে কম্‌রেডরা বিদায় নিলেন।

সোফিয়া আজ সকালে চায়ের টেবিলে বল্লে,—এবার বেশ কিছু-

দিনের মতো যাচ্ছি কফি,—কাজ পড়েছে খুব বেশী, কর্মীর অভাবও যথেষ্ট বোধ কচ্ছি। কমরেডরা তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসবে। নিরাপদ জায়গা হিসাবে এখানে কোন চিন্তার কারণ নেই। তা ছাড়া যে-ভদ্রলোক তোমাদের খবর দেবেন, তিনি একজন সরকারী খয়েরখাঁ বৃদ্ধার আত্মীয়। বৃদ্ধার জন্য সুবিধা ভাল রকমের পাওয়া গেছে। এডার দিকে চেয়ে বল্লে,—এডা, এখন তুমি নিজেকে এবং তোমার ভবিষ্যৎকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পরম শুভার্থী পেয়েছ। শিশুর জন্য কণামাত্র চিন্তা করোনা।

এডা নির্ভর-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল,— জবাব দিলেনা।

দুপুরে সোফিয়া বিদায় নিলে।

সহরে এসে সোফিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে—বিশ্রামের অবসর নেই। কদিন পরেই রেলওয়ে আর ডকে ধর্ম্মঘট সুরু হয়েছে। সোফিয়া প্রত্যক্ষে এ-সব কাজে যায় না, তার আত্ম-গোপনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। যথা-সময়ে সব সংবাদই তার কাছে আসে। মিলিটারীতে তার কর্ম্ম-ক্ষেত্র ব্যাপৃত কিন্তু সর্ব্বত্রই ছদ্মবেশ এবং অত্যন্ত গোপনতা-সহকারে কাজ করতে হয়।

আজ কফি-খানায় দেশী সামরিক অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় সোফিয়া কফি খেতে বসেছে, অল্পক্ষণ পরেই মেজর সাহেব এলেন। সোফিয়া অভ্যর্থনা করে বসালে। কফি খাওয়া শেষ করে সোফিয়া বল্লে,—চলো না সাহেব, তোমার জীপে একটু ঘুরে আসি। সময় আছে।

মেজর—নিশ্চয়। তোমার জন্য সময় তৈরী করে নিয়েছি।

জীপে উঠে সোফিয়া বল্লে,—নতুন ইস্তাহারগুলো পড়েছ ?

মেজর সাহেব সোফিয়ার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে, তারপর উত্তর দিলে,—হ্যাঁ, কিন্তু ফ্রণ্টে যাবার জন্য আবেদন কেন ? সেখানে তো শুধু মরেই শেষ হবে সব। যাদের বুকে প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্খা, শুধু মরে তাদের লাভ কি ?

সোফিয়া—ফ্রণ্টে গিয়ে মরতে হবে কেন ? যদি ব্যাপকভাবে আত্ম-সমর্পণ করা হয়, তা হলে তারা খুব বড় কাজ করতে পারবে।

মেজর—আত্ম-সমর্পণ এত সহজ নয়। আজ্ঞা পাবা মাত্র তাদের আক্রমণের জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং শত্রু তাদের স্বাগত অভ্যর্থনা করবেনা, অস্ত্র চালিয়ে ধ্বংশ করবে।

সোফিয়া—শত্রু যাতে ধ্বংশ না করে, সে ব্যবস্থা থাকলে তো আর আপত্তি হবে না ?

মেজর—তাও খুব বিপদের। অতখানি বিশ্বাস করবার পাত্র কি তারা ?

সোফিয়া—বিশ্বাস করবার মতো তারা একটুও নয়, তবে প্রয়োজনের তাড়নায় আমাদের সাহায্য করবে। অবশ্য ঐ যে আত্ম-সমর্পণ করা, তাতেও যতদূর সম্ভব সতর্কতা থাকবে। অন্য দিক দিয়েও বিপদ বেশী, ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকার কল্লেও মৃত্যু নিশ্চয়,—অবশ্য এ-সমস্ত ব্যবস্থাই দেশের যখন চরম্ সঙ্কট আসবে, তখনকায় জন্য।

মেজর—মিলিটারী অফিসারদের মধ্যেও যথেষ্ট অসন্তোষ বিদ্যমান। ডক-ধর্ম্মঘটের সময় যখন মিলিটারী ফৌজ আর অফিসার দিয়ে ওদের গুলি করে মারতে বল্লে,—সে কি অবর্ণনীয় অবস্থা—দেশী সৈন্য পাঠিয়ে তাদের গুলি করানো কিংবা মেশিন-গান চালানোর উদ্দেশ্যে মানুষগুলোকে সম্পূর্ণ হিংস্রক জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রমাণ করানো হয়েছিল,তারা

সহ্য করতে পারেনি! কয়েক জায়গায় অস্বীকার করেছে কিন্তু তার ফলে কোর্ট-মার্শালে প্রাণদণ্ড। এর পর তিনটে কোম্পানীর দেশীয় সৈন্যরা ক্ষেপে উঠেছে,—স্বজাতি-হত্যা,—এ-কথা তাদের মুখে বার-বার শোনা যাচ্ছে।

সোফিয়া দেখলে, মেজর নিজেও বেশ উত্তেজিত। এ সময় আরও তলিয়ে বোঝানো যাবে,—সোফিয়া তাই বলতে আরম্ভ কল্লে,—আজ তোমাদের মনে এ-ভাবের জন্য প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তোমরা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পাচ্ছো,—কিন্তু জগত জুড়েই তো এই অকল্পনীয় নির্ম্মমতা চলেছে বীর! পৃথিবীর কোন প্রান্তেই আজ শান্তির সংসার নেই। এই দুঃখ-দুর্দ্দশার বিকট মূর্ত্তি—প্রত্যেক দেশে সহস্র সহস্র মায়ের বুক-ফাটা কান্না! জগতের পানে একবার তোমাদের দৃষ্টি ফেরাও যোদ্ধার দল। পৃথিবীতে মানুষের বসতি হোক, পৃথিবী থেকে দানবের ধ্বংশ হোক। তোমাদেরই সে কাজের ভার নিতে হবে। তোমাদের হাতে আজ অস্ত্রের ক্ষমতা, সে ক্ষমতা কাজে লাগাও,—তোমরা আজ সর্ব্বশক্তির আধার-রূপে মিলিটারী-মেশিন অধিকার করেছ। জগৎ কোন পথে চলেছে আজ? অত্যাচার, ধ্বংশ, শোষণ, নির্ম্মমতা, বর্ব্বরতার পথে,—তোমরা বদলে দাও সে পথ!

মেজরের মন আজ তিক্ত হয়ে অসহ্য ভারাক্রান্ত ছিল,—সোফিয়ার কথাগুলো তার কাণে এ সময় যেন যাদুমন্ত্রের মতো প্রবেশ কল্লে। ডকের হত্যালীলা মেজর সাহেব স্বচক্ষে দেখেছেন,—নাবিকদের উত্তেজনা এবং অসন্তোষের কথা গোপনতার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। জীপটাকে মেজর খুব জোরে চালিয়ে চলেছে,—একবার সোফিয়াকে প্রশ্ন করলে,—কোন্ দিকে যাবে?

সোফিয়া—যেখানে তোমার ইচ্ছা! তবে ছটার সময়…… হিসের কাছে আমায় নামিয়ে দিও।

জীপ চললো। দুজনে নির্ব্বাক।

একটু পরে সোফিয়া ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন কল্লে,—আচ্ছা মেজর, ঐ যে তিনটে দেশী রেজিমেণ্টের বহু সৈন্য আর অফিসাররা বিদ্রোহ করেছে, তাদের কি অবস্থা হবে, বলতে পারো ?

মেজর—ক্যাম্পে বন্দী। কারণ অতগুলোকে তো আর গুলি করে মারতে পারে না, তা হলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তারা যে ক্যাম্পে আছে, সেখানে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও আমরা জানতে পারলাম, বহু ইস্তাহার তাদের হাতে পৌঁছেচে, তাতে তাদের অনেক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

সোফিয়া—শেষ পর্য্যন্ত তাদের সাহস এতখানি থাকবে তাতে, মনে হয় তোমার ?

মেজর—নিশ্চয় থাকবে। তারা এখন মরণের তীরে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখতে পাচ্ছে। এ সময় তারা ভাবছে, মরতেই তো হবে, সাম্রাজ্যবাদীর কশাই-খানায় মরবার আগে এমন-কিছু করে যাই, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্তত চেতনার সম্ভাবনা থাকবে! আমাদেরই মতো দানবীয় কাজে তারা আবার জীবন আরম্ভ না করে যেন!

সোফিয়া—তোমায় আমি কাল সমস্ত কাগজ-পত্র পৌঁছে দেবো মেজর। তোমাদের প্রোগ্রাম, তোমাদের ধারা, বাহ্যিক ভাবে কি করা উচিত এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে তোমরা ঐ কঠিন বন্ধনের মধ্যে থেকেও বিরাট শক্তির চালনায় কাজ করতে পারবে, সে বিষয় বিশদ ভাবে লেখা পুস্তিকা পাবে। আজ পর্য্যন্ত যা পড়েছ, তাতে আদর্শ প্রচার এবং তোমাদের মনের ছাপ পড়েছে মাত্র। তোমার অধীনে যারা আছে,

তাদেরও নিয়মিত পৌছে দেবার চেষ্টা করবো। কাল কোন সময়ে লোক যাবে, বলো ?

মেজর সময় এবং ঠিকানা দিয়ে বল্লে,—তুমি তো নিজে যাবেনা, তবে আমি চিনবো কেমন করে যে তোমার লোক ?

সোফিয়া বল্লে,—সে চেনা দেবে। আমি সময়-মত আবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমার সময় আমার জানা আছে।

মেজর—না মহাশয়, আমার সব-দিন ডিউটি সমান নয়।

সোফিয়া—ঠিক দু'দিন পরে তুমি আমার দেখা পাবে।

মেজর গাড়ীর স্পীড্ একটু কমিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল সোফিয়ার পানে। ভাবছিল, কে এই রমণী ? আজ কদিন মিশছি এর সঙ্গে—কোন পরিচয়ই জানলাম না! আশ্চর্য্য কথা বলে! গতিবিধি আরও আশ্চর্য্য !

গাড়ী প্রায় থামবার অবস্থা।

সোফিয়া বল্লে,—কি চিন্তা কচ্ছো সাহেব? সময়ে সব জানতে পারবে যোদ্ধা। তোমাদের ওপর অনেকখানি আশা নিয়ে চলেছি আমরা। ঐ মোড় দেখা যাচ্ছে, ঐখানে আমায় নামিয়ে দেবে ?

মেজর—নিশ্চয়। যেখানে তোমার প্রয়োজন বলবে, সেই খানেই আমি পৌছে দেব।

মোড়ের কাছে এসে জীপখানা থামলো। সোফিয়া গাড়ী থেকে নামলো। মেজর জীপের ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে একটু অন্যমনস্ক ভাবে সোফিয়ার দিকে চেয়ে আছে। গাড়ী থেকে নেমে সোফি দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ী পথে মিলিটারী-ট্রাক, লরী, জীপ, ভ্যান সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে,—মোড়ের মাথায় জীপখানা এক-পাশে দাঁড়িয়েছে—এক-ধারে পাহাড়, অপরদিকে ভ্যালি নেমে গেছে। সোফিয়া মেজরকে

অন্যমনস্ক দেখে আবার গাড়ীতে উঠে এলো। এসে মেজরের ষ্টিয়ারিংয়ে রাখা হাতখানা ধরে বল্লে,—কি ভাবছো বন্ধু? একটু নেমে এসো।

মেজর একটুও প্রস্তুত ছিল না, সোফিয়ার এই অত্যন্ত সহজ আপন-করা ভাবে আরও বেশী অন্য-মনস্ক হয়ে পড়লো। সোফির টানে নেমে এলো পথে,—আবার ভাবছে, সত্যই আশ্চর্য্য রমণী! কি সাহস, কত দৃঢ়তা, কতখানি সহজ আপন-করা ভাব! অথচ মার্জ্জিত!

সোফিয়া এবার মেজরের হাতখানায় ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—কি ভাবছো? কোন রণক্ষেত্রের ষ্ট্রাটেজির কথা মনে পড়ছে?

মেজর—না, ভাবছিলাম আশ্চর্য্য রমণী তুমি!

সোফিয়া—না বন্ধু, আমি অত্যন্ত সহজ, আমাকে চিনলে তোমার ধাঁধা মিটে যাবে, খুব শীগ্‌গিরই আমায় চিনবে যোদ্ধা।

মেজর বল্লে,—আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

বড়ই অন্যমনস্ক ভাবে কথা বলছে, সোফিয়া তার হাত ধরে খানিকটা এগিয়ে পথ এসেছে। সোফি আবার কথা বলাবার চেষ্টা কল্লে, বল্লে—সাহেব তোমরা কথা বড় কম খরচ করো, না? বলে একটা হাত পকেটে দিয়েছে—দেখে মেজর তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে সিগারেটের কেস্ বার করে সোফিয়াকে নিবেদন কল্লে। সোফিয়া বল্লে—মনটা এবার সহজ করে নাও।

দুজনে সিগারেট ধরিয়ে পথের বাঁকে কাঠের বেড়ার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা-শেষের সূর্য্য তখন পৃথিবীকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাবার রং ছড়িয়েছে, পাহাড়ের গায়ে ও খাদে সুন্দর হয়ে পড়েছে সে রঙ্গিন আলো। পাখীগুলো পরস্পরের কাছে বিদায়-সম্ভাষণ সুরু করেছে। নির্জ্জনতার মধ্যে ওদের কিচ-মিচ শিস্ দেওয়ার মধ্যে কত কি জানিয়ে দিচ্ছে। পথ দিয়ে মাঝে মাঝে

মিলিটারী লরী কচি কচি মায়ের বাচ্ছাগুলোকে বোঝাই করে মরণ-সাজ পরিয়ে দৌড়ুচ্ছে। সোফি তাদের পানে আকুল দৃষ্টিতে শেষ দেখা পর্য্যন্ত চেয়ে আছে। মেজর এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলো—এদের জন্য কতখানি অনুভূতি! সোফি বলে উঠলো—দেখছ ঐ নব-প্রস্ফুটিত কিশোর জীবন অকালে কি ভাবে নষ্ট হবে,—কোন্ প্রয়োজনে কোন্ সার্থকতায়? তার বিনিময়ে কি পাবে? উচ্ছ্বাস-ভরা কথাগুলো বুকে এসে আটকে গেল—চোখে মুখে ফুটে উঠলো অন্তরের অব্যক্ত ব্যথার আভাস।

মেজর পরিষ্কার উপলব্ধি করলে। সেও খুব ভাব-প্রবণ হয়ে পড়েছে! সোফিয়ার কাছে সরে এসে বল্লে,—বন্ধু, এতখানি দরদ-ভরা অন্তর,—এমন মহৎ প্রাণ কেমন করে তোমাদের হলো? কোন্ আদর্শ তোমাদের এতখানি মহৎ কর্ম্মে নিয়োগ করেছে? আজকের দিনের এই ক-ঘণ্টা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সোফিয়া আবার মেজরের হাত ধরলো, ধরে বল্লে,—আজকের এই ক-ঘণ্টা কেন বন্ধু, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে চলবো। অন্তরের গ্রন্থিতে আমাদের সম্বন্ধ,—এ কত আপন!

হঠাৎ মেজরের নজর পড়লো ঘড়ির দিকে—দেখে সোফিয়া বলে,—তোমার দেরী হয়ে গেল বন্ধু?

মেজর—না, দেরী হয়নি, কিন্তু এখন বিদায় নিতে হবে। জানিনা এই অসহ্য নির্ম্মম কাজ কতদিন আরো করতে হবে। প্রতি-মুহূর্ত্তে মনে হয়—

সোফিয়া বলে,—আর বেশী দিন নয় বীর! তোমরা স্থির থেকো, দৃঢ় থেকো, জাতি আর দেশ তোমাদের উপর অনেক বেশী আশা রাখে। তোমরা পারো অনেক কিছু করতে—এ-কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলোনা। তোমাদের শক্তিতে দৃঢ় আস্থা রেখো। আবার দেখা হবে।

মেজর্‌ কর-মর্দ্দন করে বিদায় নিলে। জীপে উঠতে গিয়ে আবার ফিরে এলো ; এসে বল্লে,—যদি কিছু মনে না করো বন্ধু, একটা কথা জানতে চাই !

সোফিয়া—কিছু মনে করবোনা বন্ধু, অসঙ্কোচে বলো।

মেজর—এখানে তুমি কতক্ষণ থাকবে ? প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো,—এ জায়গা সহর থেকে বেশ দূরে। কোন গাড়ী বা কিছু রইলো না তোমার সঙ্গে।

সোফিয়া অকুণ্ঠ স্বরে বল্লে,—তুমি নিশ্চিন্তে চলে যাও বন্ধু, আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছি, তিনি এখনি আসবেন। তা ছাড়া আমাদের সর্ব্বদাই বিপদসঙ্কুল পথে জীবন কাটাতে হয় এবং আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থাও রাখি সেই মতো। তুমি ভাবনা করোনা। কালই আবার দেখা হবে। যদি একান্ত সময় করে না উঠতে পারি, পরশু নিশ্চয়।

জীপে ষ্টার্ট দিয়ে মেজর মুহূর্ত্তে উধাও হয়ে গেল—সোফিয়া দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো সেই মরণ-পথের যাত্রীদের কথা,—কতখানি প্রাণ,—মনের কি উদার শিক্ষা, কি সংযত মার্জ্জিত ব্যবহার ! অন্তরে বৈপ্লবিক প্রেরণা ! আজ তার মন যেন কেমন এলোমেলো ! কত কথার তরঙ্গ বইছে,—সামলাতে সময় লাগবে !

এমনি সব কথা ভেবে চলেছে,—সময় কেটে যাচ্ছে—বিশ মিনিট অতিবাহিত হলো। আরসাদের আসবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে,—পাঁচ মিনিট-পর-পর ঘড়ি দেখছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলো—একটু উঁচুতে উঠে বায়নাকুলার নিয়ে দেখতে লাগলো। আরসাদকে দেখা গেল না,—দেখতে পেলে, কতকগুলো আমেরিকান সৈন্য হৈ-হৈ করতে করতে এই দিকে আসছে। সোফিয়া ভাবলে, এদের চোখ এড়াতে হবে। যদি উপরের দিকে ওঠে, দেখা যাবে।

যদি নীচে নামি তা হলেও উপায় নেই! পিছনে একটা গাছ ছিল। তার আড়ালে লুকোবার ব্যবস্থা কল্লে,—তাতেও সুবিধা হলো না। তখন পাহাড়ের গায়ে মিশে শুয়ে পড়লো গাছের গুঁড়ির আড়ালে,—নিজেকে ঢাকলো! সেই সময় একটা শুকনো কাঠের খোঁচা লেগে বাঁ হাতের খানিকটা গেল কেটে। রক্ত পড়তে লাগলো। রুমাল দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে রইল। সৈন্যরা শিস্ দিতে দিতে হৈ-হৈ করে চলে গেল।

সোফিয়া উঠে দাঁড়ালো। টর্চ্চটা জ্বালিযে রাস্তায় ফেল্‌লে। আবার বাইনোকুলার নিয়ে দেখতে লাগলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। দূরে একটা মোটর-বাইকের শব্দ। সোফি ভাবছে—নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে! নাহলে আমায় সময় দিয়ে এত দেরী করার কারণ থাকতে পারে না।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। ভাবতে ভাবতে রাস্তায় নেমে আসছে,—মোটর-বাইকখানা তখন দশ-বারো হাত মাত্র দূরে। আলো এসে পড়লো সোফির গায়ে। সোফিও টর্চ্চ জ্বালিয়েছে। বাইক থামিয়ে আরসাদ লাফ দিয়ে পথে নেমে পড়লো। সোফি এগিয়ে এলো। কোন প্রশ্ন না করে আরসাদ সোফিকে বুকে টেনে নিয়ে গাঢ় চুম্বন কল্লে। উৎকণ্ঠায় অনুশোচনায় আরসাদের মন অধীর। সোফিকে নিরাপদ দেখে কতকটা শান্ত হলো। কিন্তু ত্রুটির জন্য সোফিকে কি বলবে? দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় সারা দেহ-মন চঞ্চল। সোফি বল্লে,—তোমার এত ভাবনা করবার মতো কি হয়েছে?

আরসাদ কোন কথা বলতে পাচ্ছে না,—যেন কত অপরাধী!

আরসাদ আবার সোফিকে চুম্বন কল্লে,—মিষ্ট আদরে ভরিয়ে বল্লে,—তুমি কি জানবে কি-দুশ্চিন্তায় আমার সময় কেটেছে? এই বিপদ-সঙ্কুল

জায়গায় সন্ধ্যা বেলা তোমায় প্রতীক্ষা করতে বলে আমি আসতে পারছিলাম না !

সোফিয়া বাধা দিয়ে বল্লে,—তোমার কোনো বিপদ হয়েছে কি না এই ভাবনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। নাহলে তুমি তো জানো আরসাদ, বিপদ-সঙ্কুল স্থানে গভীর রাত্রে সম্পূর্ণ একা আমায় যাতায়াত করতে হয়। কেন এত চিন্তা প্রিয়তম ? আমার জীবনের অনেক-কিছুই তো তোমার জানা হয়ে গেছে।

আরসাদ বল্লে,—তবু আজ নিজেকে আমার অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে।

সোফিয়া—অপরাধের শাস্তি যদি গুরুতর দিই, তা হলে আর—বলেই আরসাদকে বুকে টেনে নিলে।

রাত্রির অন্ধকার তখন ঘোর হয়ে এসেছে—প্রতীক্ষার প্রতিটি পল অসহ্য ভাবে কাটিয়ে এমনি করে পাওয়ায় সব ভুলিয়ে দিয়েছে। পথ বা যান-বাহনের কথা মনে নেই !

হঠাৎ একটা মিলিটারী-লরীর শব্দ শোনা গেল। আরসাদ বাইক-খানা একেবারে পথের কিনারায় সরিয়ে নিলে। সৈন্যবাহী লরীখানার হেড-লাইটের আলো দূর থেকে ওদের গায়ে পড়েছে। এমন নির্জ্জন স্থানে বাইকের ধারে অফিসার-সাহেবকে দেখে লরী থামিয়ে সৈন্যরা অভিবাদন জানালে। বেগম-সাহেব তখন ওড়নায় মুখ ঢেকেছেন।

আরসাদ বল্লে,—সোফি খুব ভাল খবর আছে,······বাটালিয়নের জাতীয় সৈন্যরা যুদ্ধে যাবেনা বলে অস্ত্র ত্যাগ করে বন্দী হয়েছে,—দু'টো ইউনিটের জাতীয় সৈন্য এবং কজন অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাদের ওপর অত্যাচার সুরু হয়েছে বটে, তবে মেরে ফেলতে সাহস কচ্ছে না—এই হলো আজ দুপুরের খবর।

সোফিয়া—হ্যাঁ, ওকে গুলি চালানোর ফলও জেনেছি। চারদিন আগে একটা রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় পুলিশ আর মিলিটারী গুলি করেছিল,-তারও প্রতিক্রিয়া! এ সময় যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তবে ভাল হয়। আমরা তাদের সম্পূর্ণ ভাবে নামাবার সমস্ত কৌশল স্থির করেছি। সেই মুহূর্ত্তে বহিঃ সাম্রাজ্য-বাদীর আক্রমণের তীব্রতা বাড়লে সামরিক বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সার্থক হবে। আর এখানে নয়। চলো, অনেক কথা ব ছে, কাজ অসংখ্য,—কর্ম্মীর অভাবও অত্যন্ত বেশী অনুভব কর্চ্ছি।

আরসাদ—চলো সোফি, এ-স্থান এখনি ত্যাগ করা দরকার। বলেই সোফিকে তুলে নিলে বাইকের ওপর। পাহাড়ের গা কেটে তৈরী-পথ। জঙ্গলাকীর্ণ বাইকের লাইট জোর করে জ্বালিয়ে দ্রুত চালিয়ে চলেছে নির্জ্জন পথে। সোফি পিছনের দিকে বসে কখনও আরসাদের কাঁধের ওপর মাথা নুইয়ে দিচ্ছে, কখনও বা দুহাত দিয়ে পিছন থেকে আরসাদকে বুকের ওপর বেষ্টন কচ্ছে,—আরসাদের সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুলগুলোর ওপর মুখ রেখে মধুর স্পর্শ নিচ্ছে।

আরসাদ বল্লে,—মোটর-বাইক যদি নিজের ইচ্ছায় ঠিক চলে, তবেই গন্তব্য স্থানে পৌছুনো যাবে সোফি, নাহলে চালকের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

সোফি বল্লে,—চালকের গতি দ্রুত হবে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে, আর শক্তি—বলেই মুখখানা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আরসাদকে চুম্বন কল্লে। আরসাদ এক হাতে সোফিকে বেষ্টন করেছে—সামনে একটা গাড়ীর আলো দেখে আবার সচেতন হলো! বাইক চলেছে তীরের বেগে। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে,—গতির এই দ্রুত বেগ—

সোফির কথা শেষ হলো না। আরসাদ বল্লে—সোফি, এমন স্বচ্ছ সহজ

জীবন-প্রবাহ আমার থেমে গিয়েছিল। জীবনকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছিলাম—উৎসাহ-হীন শুষ্ক নিরানন্দময় কাজের মাঝে। প্রতিক্ষণে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছিলাম! কেমন করে আমার জীবনকে মধুময় কল্লে! জীবন্ত কল্লে! আমার ঐশ্বর্য্যময়ী রাণী তুমি! আমার স্তব্ধ জীবনের গতিকে তুমি আজ দুর্ব্বার করেছ, আমার নিরর্থক জীবনকে সার্থক করেছ,—তুমি বুঝতে পারবেনা সোফি, আমি কি ভাবে নিজেকে শুকিয়ে ফেলেছিলাম! এর চেয়ে আত্মহত্যা সহস্রগুণে ভাল।

সোফিয়া এ-কথার উত্তর দিলে প্রাণ থেকে উজাড়-করা আদরের উচ্ছ্বাসে।

দু'ঘণ্টা পরে তারা সহরের বুকে ফিরে এলো। আরসাদ বল্লে,—মিলিটারী ডাক্তারের বাংলোয় যাবো সোফি, সেখানে আজকের রাতটা কাটাবো,—যাবে? ডাক্তার নেই। সেখানে দুজন অফিসার আসবেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

সোফিয়া—কিন্তু এই হসপিটালে যে আমি ক'বার সেবার কাজ করতে হিউমেনিটারিয়েন ওয়ার্কে এসেছি। ওরা কেউ চিনবে না তো?

আরসাদ—না, তোমার আজকের সাজে কেউ তোমায় চিনবে না! আমিই চিনতে পারি না! হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার বন্ধুরা আহত সৈন্যদের বই, খাবার, ফল-টল দিতে এসে কত রকমের ইস্তাহার বিলিয়ে গেছেন। তুমি এসে কি কি করতে?

সোফিয়া—আমি অত্যন্ত সাধু ব্যক্তি। আমি এসে দেখতাম, ওরা কি রকম বই পেলে, খাবার খেয়ে খুশী হল কিনা। ইস্তাহারগুলো পড়েছে কিনা, তাও বোঝা যেতো।

ডাক্তারের বাংলোর সামনে বাইকখানা রাখলে। বেয়ারা এসে

দরজা খুলে দিলে। আরসাদ নিজের বাড়ীর মতো ঢুকে গেল ভিতরে। সোফিকে বসবার ঘরে বসিয়ে আলো জ্বেলে দিলে।

দু'জনে কৌচে বসেছে,—আরসাদের নজর পড়লো সোফির হাতের দিকে। রুমালে বাঁধা বাঁ-হাতের উপরটা—রুমাল রক্তে রাঙা। পোষাকেও রক্ত লেগে আছে। রক্তটা তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, ভিজে লাগছে। আরসাদ ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—কি হয়েছে সোফি? হাতে যে রক্ত পড়ছে,—

সোফি বলে,—ও কিছু নয়। একটু আইডিন পাওয়া গেলে ভাল হয়।

আরসাদ বেয়ারাকে বললে একটু আইডিন আনতে। তার পর নিজে রুমাল খুলে দেখলে, বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দেখে আরসাদ বললে,—এত অগ্রাহ্য কচ্ছো কথাটা? খানিকটা মাংস উড়ে গেছে যে! সেপটিক হবার ভয় নেই বুঝি?

সোফি—তাইতো বললাম আইডিনের দরকার আছে।

আরসাদ—কি করে কাটলো? এখনি কেটেছে মনে হচ্ছে!

সোফিয়া—তুমি ভুলে যাচ্ছো যে তুমি একজন মস্ত যোদ্ধা। একটু হাত কেটেছে, তাতেই এত দুশ্চিন্তা!

আরসাদ—দুশ্চিন্তায় যোদ্ধার পরিচয় ভুললাম কিসে? কিন্তু না, তুমি বলো, কি হয়েছে?

ভৃত্য আইডিন আনলে। আরসাদ তুলো দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিলে হাত। খানিক পরে ভৃত্য কফি আর বিস্কুট নিয়ে এলো।

আরসাদ বললে,—আমি তোমার মুখে তুলে দিচ্ছি কফি আর বিস্কুট—তুমি আহতের মতো খাও।

সোফিয়া—তাতে আমার একটুও লজ্জা নেই, বেশ আরামে বসেই খাবো।

আরসাদ আবার প্রশ্ন করলে,—কি করে কাটলো সোফি, বলো?

সোফিয়া—এমন কিছু নয়। ব্রিটীশের মাথা-রক্ষা-করা আমেরিকান মিত্র-সৈন্যরা ব্রিটীশের উপনিবেশে ধর্ম্মের ষাঁড়ের মতো যে ভাবে বেপরোয়া কীর্ত্তি করে বেড়ায়, তাদেরই কজনকে দূর থেকে দেখে বিষধর সাপ বা বাঘ-ভাল্লুকের ভয় ভুলে জঙ্গলে পালাতে গিয়ে গাছের শুকনো ডালের খোঁচা লেগে কেটে গেছে।

আরসাদ—ওদের এত ভয় কেন সোফি? ওরা যতই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াক,—ভয়ানক ভীতু। আছে বেশ। ওদের আস্কারা না দিলে ঘেঁষতে ভয় পায়। তোমার রুদ্র মূর্ত্তি দেখলে কোনো গোলমাল না করে পালাতো।

সোফিয়া—তোমার এমন ভুল ধারণা থাকা ঠিক নয়। ওরা মেয়ে দেখলে কাণ্ডজ্ঞানহীন—সেদিকের কোন ভদ্রতার বালাই রাখে না। আমি অবশ্য সাধারণ সৈনিক আর অফিসারদের কথা বলছি,—উচ্চ-পদস্থ জনকয়েক অফিসার সভ্যতার পরিচয় নিশ্চয় দেয়। এ ছাড়া ওরা ব্রিটীশ উপনিবেশের আলালের ঘরের দুলাল—যা ইচ্ছা করে বেড়াচ্ছে। পথে ঘাটে ওদের সাজ-সজ্জায় জাঁক-জমকে চলায়-ফেরায় ওদের আভিজাত্য আর দম্ভ ফেটে পড়ছে। ট্রেনে ওদের সর্ব্বাধিকার। সেটা অবশ্য ব্রিটীশ অফিসারদেরও! দেশী যাত্রীদের কুকুরের মতো নামিয়ে দিয়ে সদর্পে তাদের আসন দখল করে বসবে। পথে ঘাটে মাঠে ওদের অধিকার-বিস্তারের দাপটে মানুষ প্রায় নিরাশ্রয় হয়ে উঠেছে। সুদূর-গ্রামেও মানুষ আজ ভেড়া, ছাগল, গাছের ফল, গরুর দুধ কিছুরই অধিকারী নয়। যার যেখানে যথাসর্ব্বস্ব আছে, ঐ সর্ব্বভুকদের জন্য দিতে হবে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দরিদ্র গ্রামবাসীকে ভিটে-ছাড়া জমি-ছাড়া করে কোন প্রান্তরে পাঠিয়ে আমেরিকানদের এয়ারোড্রোম, প্রমোদ-ভবন, ইমারত তৈরী

হচ্ছে। সহরে ভাল বাড়ী, ম্যানসন, ফ্ল্যাট—কোথাও দেশের লোক বাস করতে পাবে না,—পৃথিবীর ধন-কুবেরদের পোষ্যপুত্রেরা দখল করে বসে আছে। দরিদ্র, পরজাতির শোষণে জর্জ্জরিত দেশগুলোতে ওদের এই সব জাঁক-জমক আর বাইরের আড়ম্বর সহ্যের অতীত। সব তাতেই ওদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। ওদের দেশের লেখক বা সমাজ-হিতৈষীরা ভারী মজার লোক! তাদের লেখায় বলায় ফেটে পড়ে পরদুঃখ-কাতরতা। শান্তি, চতুঃস্বাধীনতা, গণতন্ত্র—ওরা কণ্ঠস্থ, মুখস্থ করেছে কিন্তু ডাক ডাকবার সময় সকলের সেই একই আওয়াজ অর্থাৎ কাজের বেলায় সবাই এক। আর ওদের কথা, ওদের চলা, ওদের ব্যবহার—প্রত্যেকটী খুঁটিনাটির মধ্যে ভ্যানিটি ফুটে উঠছে—কিন্তু সে দম্ভের মধ্যে কোন মহৎ আদর্শের বালাই নেই। আমি ওদের কজন অফিসার, সাধারণ সৈনিক এবং কজন সিভিলিয়ান লেখক আর সমাজ-সেবীর সঙ্গে মিশে দেখেছি, ওরা সব এক ছাঁচে ঢালা।

আরসাদ—তোমার এতখানি তিক্ত অভিজ্ঞতা আমেরিকানদের সম্বন্ধে? কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোক থেকে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা পর্য্যন্ত আমেরিকানদের সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত, ক্বচিৎ কখনো কেউ এক-আধটা বিরুদ্ধ কথা বলে মাত্র।

সোফিয়া—কজন লোক আর ওদের উদ্দেশ্য তলিয়ে বুঝছে বলো? গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবার সব রকম অভিসন্ধি এঁটেছে। এবারে বৃটিশের চরম দুর্দ্দশার দিনে ছাতা দিয়ে তার মাথা রক্ষা করবার অজুহাতে সর্ব্বগ্রাসী অভিসন্ধির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে। বাজার দখল হোল, তার পর সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সেটাকে কায়েম কচ্ছে সর্ব্বদেশের জন-সাধারণের কাছে জাঁক-জমক, আভিজাত্য, কল-কারখানা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-বিস্তার ইত্যাদির মধ্য

দিয়ে। প্রপীড়িত দুর্ব্বল জাতি ঐ মোহে অন্ধ হচ্ছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা যতক্ষণ না ঠকবেন, ততক্ষণ তাঁরা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দূর-দৃষ্টির অভাব পরাধীন জাতির দারুণ অভিশাপ!

আরসাদ বল্লে,—কিন্তু একটা লক্ষ্য করবার ব্যাপার, মেয়েরাই খুব বেশী আকৃষ্ট হয় আমেরিকানদের দিকে। এটা আমরা ভাল করে লক্ষ্য করেছি।

সোফিয়া—খুব সহজ কারণ, মেয়েরা সর্ব্বদাই বাইরের চাকচিক্যে জাঁক-জমকে আর হালকা কথায় আকৃষ্ট হয়। গভীরতার বালাই মেয়েদের বড় একটা থাকে না। আমেরিকানরা সোজা করে কথা বলে—যা চায়, যা বলে, তা ঘুরিয়ে বলে না, এবং সেই বলা আর চাওয়ার মধ্যে ফুটিয়ে তোলে ওদের সতেজ ভাব! ঐটি তাদের বিশেষত্ব আর নূতনত্ব! মেয়েদের মাদকতাও সেইখানে। নূতনত্বকে পছন্দ করতে হবে, তাহলেই আধুনিক হওয়া বা আধুনিক নাম নেওয়া যায়। সেখানেও মোহ আছে। বেশ তলিয়ে কোন জিনিষ ভাবা তাদের স্বভাব নয়। অন্যে ভাবিয়ে দিলে তখন তাকে আঁকড়ে নিতে পারে, এই পর্য্যন্ত। নিজের প্রতিভার বিকাশ কজন মেয়ের হয়েছে আজ পর্য্যন্ত? অথচ সম-অধিকারের জন্য শতাব্দী ধরে চীৎকার চলেছে! সে অধিকার শুধু ঐ বাহ্যিক ঘোরা-ফেরা এবং অর্থকরী উপায়-উদ্ভাবনেই প্রকাশ পেয়েছে,—যা কিছু করে, সব বাইরের পলকা অনুকরণ,—সমান হওয়া নয় এ। আমেরিকানরা ঐ বাইরের পলকা ভড়ং দিয়ে মেয়েদের ভোলায়। তাদের নিজেদের দেশের মেয়েরাও উন্নতির দিক দিয়ে বাইরের সম-অধিকার এবং হাটের ভিড়ের সমঝদার, সে কথা ওরা জানে। তাই ভাবে, সব দেশের মেয়েরাই ঐ-রকম হবে।

আরসাদ—তোমার কাছে আজ যা শুনলাম, এমন খুব কমই শুনেছি। আমার নূতন লাগছে। তবে এও ঠিক, জাতটার নব-জন্মের পর উন্নতি এত দ্রুত হয়েছে যে তারিফ না করে পারা যায় না।

সোফিয়া—কোন জাতকেই তারিফ করতে আমার আপত্তি নেই। পাঁচ বছরে হিটলার জার্ম্মেনীতে যা কল্লে, তা মানুষের কল্পনার অতীত। ইটালীও যথেষ্ট করেছে। আয়র্লাণ্ড থেকে আরম্ভ করে তুরকি—তোমায় না বল্লেও চলে। কিন্তু মানুষ-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করেছে, মানব-সমাজের আদর্শ নিয়েছে পৃথিবীতে এমন একটি দেশ বা জাতি দেখাতে পারো? সব দেশের আর জাতির চূড়ান্ত পরীক্ষা হল, কে কতখানি বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব-লীলায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে! সারা দেশের মানুষগুলোকে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি যুদ্ধাস্ত্রে রূপান্তরিত করেছে মাত্র। এই হলো শ্রেষ্ঠত্ব! এই হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হবার সাক্ষ্য! এই হলে মানব-সভ্যতা! গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—কত রকমারি বুজরুকী-তন্ত্র, তাই না?

আরসাদ একদৃষ্টে সোফিয়ার দিকে চেয়েছিল। কথাগুলো যেন মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখছে, এই রকম ভাব। এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিলে, দু'জন মিলিটারী অফিসার এসেছে। আরসাদ তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। দু'জন অফিসার প্রতীক্ষা কচ্ছে। আরসাদ প্রশ্ন কল্লে,—কি চাই?

মিলিটারী অফিসার—আমরা ডাক্তার চাই। আমাদের মেশের ডাক্তার অনেক-দূরে গেছেন। মেশে কোন চাকর নেই, বেয়ারা নেই, সবাই কোথায় পালিয়েছে। আমাদের ইউনিটের দেশী আর্ম্মিলেবর সব কাল থেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের রশদ আসছে না। তিনজন কমরেডের

কলেরা হয়েছে। টেলিফোন নেই—তার কেটে দিয়েছে—এম্বুলেন্স আসছে না। ডাক্তার কোথায়?

আরসাদ বল্লে,—তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি এখনি ফোন করে ডাক্তার আনিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমরা বাইক নিয়ে চলে যাও। এম্বুলেন্স পরে যাবে। তোমাদের মেশের অসুস্থদের হসপিটালে পাঠিয়ে তোমরা ও-মেশ ছেড়ে দাও। বলেই কটা ফোন করে দিলে।

অফিসার দু'জন যাবার আগে বলে গেল,—আমাদের রেশম-গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু জিনিষ নিয়ে আর্ম্মি-লেবররা পালিয়েছে,···ইউনিটের ডাক্তার নার্শ সব ছেড়ে চলে গেছে। তারা সবাই দেশী। কজন মাত্র বৃটীশ এবং অন্য-দেশী অফিসার আছে। আমরা আরও জেনেছি, সহরে আজ ভীষণ রকম গুলি চলেছে, মিলিটারী দিয়ে শোভাযাত্রা বন্ধ করা হয়েছে।

আরসাদ বল্লে—তোমরা চলে যাও। এখনি অসুস্থদের পাঠিয়ে দাওগে, আমি সর্ব্বত্র ফোন করে দিচ্ছি।

তারা চলে গেল। আরসাদ বল্লে,—শুনলে সোফিয়া?

সোফিয়া খুব অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল,—তেমনি ভাবেই জবাব দিলে,—কিন্তু আমায় তো সহরে যেতে হবে আরসাদ। কেমন করে পৌঁছুবো?

আরসাদ—কোথায় যাবে বলো, আমি পৌঁছে দেব। আমার বাইক-তো ওদের দিলাম, এখন ফোন করে অন্য গাড়ী আনাচ্ছি।

সোফিয়া—আমার বেশী সময় লাগবে না। তুমি যদি অপেক্ষা করতে পারো, আমি পনের মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরে চলে আসবো।

আরসাদ অল্প সময়ের মধ্যেই মোটর আনিয়ে নিলে। তাড়াতাড়ি দুজনে রওনা হল। মাঝ-পথে গিয়ে সোফিয়া একখানা ট্যাক্সি ভাড়া কল্লে,

আরসাদকে বল্লে,—তুমি একটু অপেক্ষা করো। তোমার গাড়ী নিয়ে সে-জায়গায় যাবোনা।

আরসাদ বল্লে—আমি একটু ঘুরে আসি। কুড়ি মিনিট পরে ঠিক এইখানেই আসবো।

সোফিয়া একটি ছোট বাড়ীতে গেল। কজন কমরেড ছিল সেখানে। তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা সেরে একটা কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে তখনি বেরিয়ে এলো। ঠিক সময়ে আরসাদের গাড়ীর কাছে এসে ট্যাক্সিকে বিদায় দিলে।

আরসাদ বল্লে,—এখনি এক আমেরিকান-অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—সহরের সেই মিছিলের কথা,—সে বল্লে—সে নিজে দেখেছে. খুব বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল,—বহু মেয়ে ছিল সে-মিছিলে। মিছিলকারীরা আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে বলে মিলিটারী দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে।

সোফিয়া—হ্যাঁ, আমি সব জেনেছি। আরও অন্যান্য জায়গায় গুলি চলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ডক আর রেলওয়ে ধর্ম্মঘট থেকে এখানকার রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয়ে নানা ভাবে বাড়তে আরম্ভ হল। তোমার আমেরিকান সাহেব কী বল্লে?

আরসাদ—ভদ্রলোক বেশ শিক্ষিত। তাই একটু চিন্তা করে কথা কইলেন। তবু সেখানে নিজেদের দেশের কথাটা তুলতে ভোলেননি।

সোফিয়া—ওদের স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা তো! ওরা নিজের জাতের কথা না তুলে কথাই কইতে পারে না। অথচ এমন জাত নেই, যার রক্তে আমেরিকান জাতের সৃষ্টি। সে-ইতিহাস ওরা ভুলে যায়। ভুলে সব জাতের ওপর দম্ভ ফলাতে চায়। ওরা স্বাধীন জাত বলতে যে গর্ব্ব বোধ করে, সেটাও বাইরের রূপ! গভীর ভাবে সাধারণ লোকের

জীবন আর ধনীদের জীবন মিলিয়ে দেখবার জ্ঞান বা বুদ্ধি ওদের নেই,—অথচ শতকরা একশোজনই নাকি শিক্ষিত, অগ্রগতিশীল! নূতন মানব-সমাজের কী শিক্ষা ওরা পেয়েছে? বিভিন্ন জাতি আর দেশ থেকে বিতাড়িত, নিপীড়িত হয়ে অত-বড় মহাদেশের বাসিন্দা হল, কিন্তু মনের সংস্কারে বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর কল্পনাও করতে পারে না। ভুঁই-ফোড় জাতের একটা ক্ষুদ্র অস্তিত্ব আবিষ্কার করে দম্ভে ফেটে পড়ছে, তা দেখে বাহবা দেবার কি আছে? সবই সেই গতানুগতিক নিয়মে চলেছে। ভাষার এবং বাইরের কয়েকটি পালিশ-করা-রীতি ও ব্যবহারের চাক-চিক্যে "স্বাধীন জাত" "উন্নত জাত" বল্লেই তো আর বিজ্ঞান-সম্মত মানুষ-সমাজের স্বাধীনতা বা উন্নতির প্রমাণ হয় না। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে পোষা জন্তুর মতো ওদের সৈন্যগুলোকে—তাদের অস্বাভাবিক জীবন; যত্র তত্র যা ইচ্ছা করে বেড়ায়। আমরা বলি, বর্ব্বরতা, অমানুষিকতা এবং নৈতিকতার আইনে তাদের সাজা দেবার উপদেশ দিই কিন্তু তাদের অপরাধ কি? মনুষ্যত্ব বলতে তারা কি শিক্ষা পেয়েছে? কেমন করে নিজের জীবন স্বচ্ছন্দ রেখে ফাঁকা ফুর্ত্তির মধ্যে সময় কাটিয়ে ভাল করে মানুষ মারা যেতে পারে, এই ওদের শিক্ষা। ওদের মাইনে দিয়ে ভাড়া করে নিয়ে মানুষ-মারার কাজে লাগাচ্ছে গোটা-কতক সুবিধাবাদী। ওদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে? ওদের আহার বিহার অবস্থান দেহ-মনের চাহিদাকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য তো করবেই—এর জন্য বড় কথা বলে বাহাদুরী নেবার মানে হয় না! সমাজ আর শিক্ষার জড়কে উপড়ে না ফেল্লে যুগ-যুগ ধরে এটা চলতে থাকবে। এ অবস্থা মানুষের স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করা, এ-কথা সবাই বোঝে, কিন্তু স্বার্থের দায়ে উল্টো কথা বলে মাত্র।

আরসাদ—সোফিয়া তোমরা সব কিছুতেই বিরাট আদর্শবাদের

মধ্যে গিয়ে অত্যন্ত সহজ করে দেখতে পাও! এত অসংখ্য জটিলতা-জড়ানো সমাজ-নীতি কি এত সহজবোধ্য বলে মানুষ ভাবে?

সোফিয়া—সহজ-ভাবে এবং শুভ দৃষ্টিতে দেখতে বা দেখাতে যাদের স্বার্থে বাধে, তারা বৃহদাকার পুঁথির মধ্যে নানা ভাবের কথা আর থিওরীর প্যাচ দিয়ে অত্যন্ত জটিল করে রাখে। আসল সমস্যা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে সেই সব পুঁথির নীতি গুলে খাইয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ দিয়ে বিদ্বান তৈরী করা হয়। কজন লোকের সাহস আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শীলরমার্কা এক-গজ-টাইটেল-পাওয়া লোকদের যুক্তি খণ্ডন করতে যাবে? এইটাই হল বুর্জ্জোয়া-সমাজের সব-চাইতে বাহাদুরী! বিষ-প্রয়োগে (slow poison)—কথা শেষ হবার আগেই গাড়ী এসে ডাক্তারের বাংলোর সামনে পৌঁছুলো। ডাক্তার অন্যত্র গেছেন, দু'তিন দিন পরে আসবেন।

সোফিয়া—আজকের রাতটা এখানে কাটাতে পারবো আরসাদ। কাল ভোরেই সহরের হোটেলে আমায় পৌঁছে দেবে তুমি। এখন আর এক-মুহূর্ত্ত সময় পাওয়া যাবেনা, কাল মেজর সাহেবকে সময় দিয়েছি, ওঁর কাছে ফ্রন্টের সব খবরই পাবো। এবার তুমি শীগগিরই যেতে পারবে সিরিনের কাছে।

সিরিনের কাছে যাবে শুনে আরসাদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সাগ্রহে প্রশ্ন কল্লে,—কবে যাবো?

সোফিয়া—দু'দিন পরে তোমায় জানাবো। তার পর একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বল্লে,—বোনের ওপর এতখানি টান সত্ত্বেও কেমন করে যে আলগা হয়ে গিয়েছিল মাঝখানটা! আচ্ছা আরসাদ, তুমি সিরিনের খবরের জন্য আগেও কি খুব ব্যস্ত হতে?

আরসাদ—ব্যস্ত? যেদিন সিরিনের পালানোর খবর পেলাম, সেদিন

ছিল আমাদের একটা বড় গোছের কনফারেন্স। যেভাবে কাজ করেছি সেদিন, তা আর আজ বলে বোঝানো যায় না।

সোফিয়া,—কি, ভাবনা হয়েছিল? না, দুঃখ হয়েছিল? কিংবা বোনের বুদ্ধিমত্তা, সাহসের কথা জেনে—

আরসাদ—দুঃখ ছাড়া আর সবগুলোই হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বে বুক ভরে গিয়েছিল। জানো সোফি, সিরিনের আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী? ওর ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত ঝঞ্ঝা-বেদনায় ভরা। জীবনের প্রথম সোপানে পা দিয়েই এত বড় আঘাত পেয়েছিল—তারপর সেই অল্প বয়সে কেমন করে সম্পূর্ণ নিজের প্রতিভায় আজ এই আদর্শ জীবনে এসে পৌছেচে, সে কথা ভাবলে আমি আশ্চর্য্য হই! আমি বলবো ওর ছেলেবেলা থেকে জীবন-কাহিনী। আত্মীয়-স্বজনের কাছে অবিচার, অত্যাচার, সমাজের কাছেও যথেষ্ট অন্যায় এবং মিথ্যা অভিযোগের নির্য্যাতন পেয়েছে! রাজনৈতিক জীবনে তাকে সর্ব্বদা সংঘর্ষ আর সংগ্রামের মধ্যে কাটাতে হতো—শত্রু-পক্ষের কাছে নির্য্যাতন আর শাস্তি-ভোগের কথা বর্ণনা করা যায় না। সিরিনের কথা মনে হলে আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়ি! আমি যে-জীবন চালিত করেছিলাম সব কিছু ভুলে, তাতে ডুবে মরতে চেয়েছিলাম! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিনি সিরিনের ভালবাসা, সিরিনের কাজ। সিরিনের জীবন আমাকে জীবন্ত রেখেছিল। তবে—

সোফিয়া—তবে আর বলে দরকার নেই।

আরসাদ—সোফি, সিরিনের কথা, সিরিনের আলো আর সুবাস আমার কাছে কেমন হয়ে আসতো জানো? গভীর জলের নীচে থেকে পঙ্কিলতা ভেদ করে পদ্ম যেমন শুভ্রতা আর ঐশ্বর্য্য নিয়ে প্রখর সূর্য্যকিরণে ঝলমল করে, তার বুকভরা মধু নিয়ে হাসি ফোটায়—সিরিনের ভালবাসা, সিরিনের প্রতিভা মানুষের ঝঞ্ঝাময় জটিলতাময় জীবনে ঠিক তেমনি হাসির

আলো দেয়। ওর জীবনের দুর্দ্দান্ত গতিকে কোন ব্যক্তি বা কোন দুর্দ্দান্ত অবস্থা প্রতিরোধ বা মন্থর করতে পারেনি! নির্য্যাতন, কঠোরতা ওকে ম্লান করতে পারে নি! সংগ্রাম করে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়ে ও আরও জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়েছে। সিরিনের দৃঢ়তা এবং স্থির-প্রতিজ্ঞার জন্য সময়-সময় ওকে অত্যন্ত কঠিন ভেবে ভুল করি। কিন্তু সে ভুল! সিরিন প্রাণময়ী প্রেমের নির্ঝর!

সোফিয়া—আরসাদ তুমি এমন্ করে জানো বোঝো সিরিনকে, তবু তোমাদের এত বড় ব্যবধান ছিল? আর আজ তুমি এত সহজেই তার আদর্শ-বাদে আত্ম-নিয়োগ কল্লে? কৈশোর থেকে দিনের পর দিন সিরিন তোমায় যেভাবে টেনেছে, যে-ভাবে তোমরা পরস্পরকে জেনেছ, একসঙ্গে পড়াশুনা করেছ—

আরসাদ—হ্যাঁ সোফি, পড়াশুনো করেছিলাম। সিরিনের তর্ক যুক্তি জানতাম, কিন্তু সে-জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাছাড়া আমি বরাবরই একটু বেশী ভাব-প্রবণ ছিলাম। সে-দিকটাতে সিরিনের ছিল অত্যন্ত সন্দেহ, তাই সে আমায় আলগা দিয়েছিল!

আরসাদের অজান্তে কেমন এক অভিমানের ভাব ফুটে উঠলো, সোফিয়া তা বুঝতে পারলে। একথা সোফিরও মনে হয়েছিল। বলেও ছিল সিরিন একদিন! সিরিন তা স্বীকার করেছে। সিরিনের দিকেও ছিল খানিকটা ব্যর্থতার বেদনা।

সোফিকে নীরব থাকতে দেখে আরসাদ বল্লে,—ক্ষুন্ন হলে সোফি?

সোফিয়া—না, না, খুব খুশী হয়েছি, বুক ভরে আনন্দ পেয়েছি, মনের স্বাভাবিক গতিকে এই ভাবে তুমি স্বীকার কল্লে বলে! আচ্ছা, ইদানীং তোমার কাছে সিরিনের কোন খবর আসতোনা?

আরসাদ—খবর সর্ব্বদা পেতাম—ওর মেয়েকে আমি সর্ব্বদা দেখতে

যাই। যেখানেই যাই, ফিরে এসেই তাকে আগে দেখতে যাই। সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হবার পর বহু আত্মীয় তাকে যত্ন করতে আসে, কিন্তু মেয়ে ঠিক মায়ের মতো তেজস্বিনী। এত কম বয়সেই সে বেশ বুঝে চলে। আমাকেই সে তার সব-কিছুর ভার দিয়েছে। অবশ্য তার বাবা মারা যাবার পর কোর্ট থেকে আমাকেই অভিভাবক করেছে। সিরিন কোন দিন আমায় কোন প্রশ্ন করেনি। জেল থেকে খবর পাঠাতো মেয়ের পড়াশুনার সম্বন্ধে এবং শরীর কেমন আছে এই মাত্র। আমি তাকে সমস্ত জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষ মেয়েকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিত খুব কম। এই সুদীর্ঘ-কাল সে মায়ের কোন খবরই জানে না। সিরিনের আত্ম-গোপনতার পর মায়ের ওপর পুলিশ অত্যন্ত কড়া দৃষ্টি রাখছে, জুলুমও করে খুব।

সোফিয়া—আদর্শে এবং কর্ম্মে মেয়ে কিন্তু বেশ তৈরী হচ্ছে।

আরসাদ—সে খবর আমি জানি। কারণ তাকে পড়াবার ভার সিরিন আমার ওপরেই দিয়েছিল। কেমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী মা, আমার উপর ব্যর্থতার শোধ নিলে মেয়েকে তৈরী করাবার ভার দিয়ে!

সোফিয়া—এ খবর তো জানতাম না। প্রথম যে সময় সিরিনের কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যায়, সে-সময় সিরিন একটি দিন মাত্র সেই মর্ম্ম-বিদারক কাহিনী বলেছিল,—আর কোন কিছুই বলেনি।

আরসাদ—সোফিয়া, এখন তোমার একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার,—ভোরেই তো আবার কাজ আছে।

সোফি—আজ রাত্রে ডাক্তারের ফেরবার আশা নেই তো? কারণ আমি ডাক্তারের সামনে পড়তে চাইনা।

আরসাদ—না, সে সম্ভাবনা নেই।

দু'দিন কেটেছে, আরসাদের সঙ্গে দেখা করবার সময় হয়নি। সহরে গ্রামে রাজনৈতিক আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। জাতীয়তা-বাদীরা সভা-সমিতি বক্তৃতা শোভাযাত্রা আরম্ভ করেছে পূর্ণোদ্যমে। গ্রামে খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট খণ্ড খণ্ড ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এ-সবই সমগ্র-বিদ্রোহের সূত্রপাত মাত্র, তাই ব্যাপক ধর্ম্মঘট এখনও আরম্ভ হয় নি।

এ-দিকে বহিঃ-সাম্রাজ্য-বাদীর বিমান-আক্রমণ, সীমান্ত অতিক্রম সুরু হয়ে গেছে। দেশ-জোড়া অশান্তির দাবানল, সাম্রাজ্য-বাদীর অত্যাচার, গ্রেফতার, লাঠি-চালনা, সামরিক-শক্তি-প্রয়োগ, সংবাদ-পত্রের উপর কড়া নিষেধ-আইন,—দমন-নীতির চরম ব্যবস্থা।

দুপুরে সহরের এক বড় হোটেলে সোফি আরসাদের সঙ্গে দেখা করলে। সঙ্কেত ঠিক করে বলে দিলে,—এই রকম নিশানা দেখলে সেই কমরেডের সঙ্গে কথা বলবে। ইউনিট ও কোম্পানীর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তুমি এসো। আমি আজই রওনা হচ্ছি,—তোমার যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক রইল। কদিনের সময় করে নিয়ে তুমি সিরিনদের ওখানে যেও। আমাদের সামরিক জরুরী বৈঠকে তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। মেজর আজ রাত্রে ফ্রন্টের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে যাবে। সেও সামরিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবে।

সংবাদ ও কাজের স্তূপ বহন করে দুপুর রৌদ্রে সোফিয়া এসেছে —,পোষাকটা ছিন্ন মলিন, রুক্ষ চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে মুখে পড়েছে, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। বাগানে ঢুকতেই জফির চোখে পড়লো ঝড়ো-পাখীর মতো রূপখানা। জফি বল্লে,—নীড়ে ঝড় উঠেছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে ঝড় বইছে কি বাইরের রূপচ্ছটাকে ফুটিয়ে তুলতে ?

সোফিয়া—জফি, কবিতার সাগরে ডুব দিয়ে সব সময়ই কবিত্ব করতে মন চাইছে না। খুব জরুরী খবর! সিরিন কোথায়?

জফি—হ্যাঁ, জরুরী খবর তো বুঝি! খবর রোজই পাচ্ছি। এখন একটু বসো,—একটু ক্লান্তি দূর করো। বলে সিগারেট নিবেদন কল্লে। সোফিয়া সিগারেট ধরিয়ে বল্লে,—অনেকক্ষণ সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, সংগ্রহ করবার উপায়ও ছিল না। মনে পড়ছিল –

বাধা দিয়ে জফি বল্লে—তোমাদের আবার মনে পড়ে? যখন অবসাদে ক্লান্তিতে ভরে যাও, তখনই আবার এসে পড়ে তোমাদের বিপ্লবের ঝড়,—এ তো সখের শ্রম মেটানো মাত্র!

সোফিয়া—না গো না, সিগারেট পান করাটা সব সময়ই দরকার। সখের জন্য একবারও নয়। তবে প্রয়োজনগুলো আমাদের স্বেচ্ছাধীন। নেশার দাস আমরা কোন দিনই হই না। তোমাদের ওপরও আমাদের নেশা লাগে না, তাই তো ভয় পাও—বলে সে একটু হাসলো।

স্নান সেরে সিরিন এসে দেখে, সোফি এসেছে। আগে থেকে আসবার কোন সংবাদ ছিল না। সোফিয়া বল্লে,—জফি নাকি দেখতে পেলে, ঝড়ে আমায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছে!

সিরিন বল্লে,—চেহারাটা সেই কথাই বলছে। এখন স্নান করো আগে, তারপর কথা।

সোফি—কাজের স্তূপ একেবারে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-লিপি প্রস্তুত করতে হবে।

সিরিন—সব হবে। স্নান সেরে নাও,—বলে সোফির পোষাক বার করে দিয়ে এলো।

দুপুরে খাওয়ার শেষে ঘরের দ্বার বন্ধ করে তিন জনে বসেছে।

ঘরের বাইরে আগুনের ঝলক দিচ্ছে। পাথুরে-পাহাড় গরম-ঠাণ্ডার সবটুকুই টেনে নেয় দেহে এবং সে গরম-ঠাণ্ডা দেহ থেকে পাহাড় ছড়িয়ে দেয় সর্ব্বত্র। বাংলোগুলো পাহাড়ের কিনারায় বলে গরম-শীত দুইই খুব তীক্ষ্ণ।

সিরিন—তা'হলে রাজনৈতিক নেতারা সংগ্রাম সুরু করবার একটা ধাপ আমাদের দিলে! এতদিন মাথা খুঁড়ে যা হলো না, শ্রমিক-বিক্ষোভের চাপে তা সম্ভব হলো, এবং ব্যাপক ভাবেই সংগ্রাম সুরু করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

সোফিয়া—হ্যাঁ, ধর্ম্মঘট দ্রুত বিস্তারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দল তাদের সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে,—তবে তাদের আন্দোলনই বলো আর সংগ্রামই বলো, দক্ষিণ-পন্থী নেতারা একে চরমে পৌঁছুতে দেবে না। এক-দল আপোষ করে বসবেই। এ-সময় আমাদের কাজকে পূর্ণোদ্যমে সংগ্রামমূলক করে তুলতে হবে। যেভাবে সামরিক-অসন্তোষ আর বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাচ্ছে,—তাতে মনে হয়, খুব শীগ্‌গিরই সমগ্র বিদ্রোহে জনগণ প্রস্তুত হবে। আমাদের প্রস্তুতি যথাসাধ্য করাও হচ্ছে। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে আমাদের ট্যাক্‌টিক‌স্ ঠিক করতে হবে। মিলিটারীর মধ্যে দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যকার তিনজনকে কাল এখানে আসতে বলেছি। আমাদের অনেক কমরেড মিলিটারীর মধ্যে গিয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের একত্র করে মতের এবং কার্য্যসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় কমরেডরা আত্মগোপন করে আছেন। আপাতত প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দেওয়া বন্ধ আছে। যে-মুহূর্ত্তে রাজনৈতিক আন্দোলন চরমে উঠবে, সে সময় আমাদের

armed uprising) সশস্ত্র বিপ্লবের কাজ আরম্ভ হবে। গেরিলা-সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে।

সিরিন—বাইরের সংবাদ পাওয়া গেছে। রেডিওতে প্রতিদিন যে সংবাদ আসে, প্রচারের বাহ্য আড়ম্বর বাদ দিয়ে তার সারাংশ কিভাবে প্রতিক্রিয়া করছে?

সোফিয়া—প্রকৃত কাজের অবস্থা অত্যন্ত হতাশজনক। জাতীয়তা-বাদী নেতার কজন সহকর্ম্মী এখানে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে,—অন্যান্য দলও প্রায় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীর মত তাঁকে দেশ-দ্রোহী আখ্যা দিতে ছাড়চেনা। তাঁর যে কজন বিশ্বস্ত কর্ম্মী বা অনুবর্ত্তী ছিলেন, তাঁদের গ্রেফতার ও যথাবিধি দমন এবং কারারুদ্ধ করেছে। দেশের লোকের মনোভাব বিশেষ আশাপ্রদ নয়। তবে সাম্রাজ্যবাদীর নির্ম্মম অত্যাচারে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বড় বড় রাজনৈতিক বক্তৃতা-বাগীশের কথায় আর ভুলতে চায় না।

সিরিন—বহিঃসাম্রাজ্যবাদীর উপরে যে দেশবাসীর ঘোর সন্দেহ তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তারাও তো সাম্রাজ্যবাদী এবং নূতন সাম্রাজ্যবাদী—তাদেরও লোভ যথেষ্ট।

সোফিয়া—সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক কূট সর্ত্ত বা চুক্তির কথা বুঝবে না কেন? পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে অতি সহজেই বুঝতে পারে। আজ কি-ভাবের সামরিক চুক্তি, অর্থনৈতিক চুক্তি এবং রাজনৈতিক চুক্তি বিপরীত মতবাদীর সঙ্গে হয়ে চলেছে! আজ যে শত্রু, কালই সে সামরিক প্রয়োজনে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে—আবার চুক্তি ভঙ্গ কচ্ছে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে এ-সব কুটনীতির ব্যবহার তারা করে চলেছে কিন্তু পরাধীন দেশের আবার রাজনীতি! তাদের মনস্তত্ত্বই আলাদা!

সিরিন—কেন, জাতীয়তা-বাদী নেতার রেডিও-ঘোষণের আবেদনে তো পরিষ্কার করে বলা ছিল যে তিনি সাময়িক ভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, সামরিক সাহায্য নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ-সংগ্রাম করবেন, এবং যুদ্ধ চালু থাকা-কালীন বহিঃসাম্রাজ্য-বাদীকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ঘাঁটী সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক কর্ত্তৃত্ব জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব থাকবে,—সেখানে কোন বিদেশী কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। এই ভীষণ যন্ত্র-যুদ্ধের দিনে কোন্ দেশ আজ বিদেশীর সাহায্য ছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সংগ্রাম-কুশলী শত্রুর সম্মুখীন হতে পাচ্ছে? ফ্রান্স, ইতালী এমন কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মাথা আমেরিকার কাছে বিকিয়ে আছে,—এ সমস্তই যুদ্ধের কারণে করতে হচ্ছে—আর আমাদের দেশের লোকের মগজে আছে শুধু ছুঁৎমার্গ! রাজনৈতিক কূট ব্যবস্থা সেখানে প্রবেশ করে না!

সোফিয়া—রেডিওর সংবাদ ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতার আবেদন ছাড়াও যে সব বিশ্বস্ত ব্যবস্থা-লিপি আসে, তাতে সেখানে কত হাজার জাতীয় সৈন্য ও অফিসাররা সর্ব্বধিনায়কের অধীনে কিভাবে সামরিক শক্তি ও যন্ত্র-কৌশল শিক্ষা কচ্ছেন, এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং সংগ্রাম কচ্ছেন, সে সব বিবৃতি প্রকাশ করে ছড়ানো হচ্ছে। তোমায় তো সে সব পুস্তিকা ও ইস্তাহার পাঠিয়েছি। কিন্তু প্রতিক্রিয়া শুনবে? আমাদের দেশের তথা-কথিত সাম্যবাদীরা তাঁদের বৃটিশ প্রভুর সুরে সুর মিলিয়ে পঞ্চম-বাহিনীর প্রভাব বলে ঐ সকল প্রচারকে ব্যাখ্যা কচ্ছেন। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক জাতীয়তা-বাদীরা বৃটিশ আর আমেরিকানদের গণতন্ত্রী রূপ দর্শন করে তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে আর-সব দেশের শাসনকে ফ্যাশিষ্ট-শাসন

বলে মনে করেন। উপনিবেশে বৃটিশের অত্যাচার ও ফ্যাশিষ্ট হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে তফাৎ হল এই মাত্র—ভণ্ডামীর কথায় মানুষগুলোকে আরও বেশী দাস-জাতিতে পরিণত করবার কৌশল! এইটুকু বোঝাবার মতো বুদ্ধিমত্তা বড় বড় মহারথীদের নেই,—তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঢাক পেটাচ্ছেন বৃটেন, আমেরিকা, চায়না গণতন্ত্রী! এমন অদ্ভুত মনোবৃত্তি পৃথিবীর আর কোন দেশের রাজনীতিতে আছে কিনা জানি না!

জফি এবার প্রশ্ন কল্লে,—আচ্ছা, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতার হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও সামরিক ক্ষমতা এলে তোমরা সাম্য-বাদী, তোমাদের রাজনৈতিক-ক্ষমতা কতটুকু আসবে? এবং তোমাদের যে নীতি, তার সফলতা কি আবার সংগ্রাম করে আনতে হবে? কিন্তু সেও কঠিন ব্যাপার নয় কি?

সিরিন— সে আশঙ্কা আমাদের যথেষ্টই আছে, তা সত্ত্বেও বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা চাই বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদ। সে-কাজ আমরা জাতীয়তা-বাদীদের সঙ্গে দেশের গণ-শক্তি নিয়ে একসঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো,—এবং গণ-শক্তিকে সংহত ও সচেতন করে সংগ্রাম-মুখী করবো। সংখ্যার সীমাবদ্ধ বুর্জ্জোয়া শক্তির সঙ্গে গণশক্তির তুলনা করা সম্ভব হবেনা, তাছাড়া ওদের মধ্যে আবার বিভক্ত হবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। ধনিক-শ্রেণী মাঝ-পথে বাধার সৃষ্টি করে একদলকে টেনে নিয়ে যাবে, আপোষ করাবে কারণ তারা বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর আওতায় ব্যবসা করে। আমাদের দল চরম-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং তারা সামরিক সংগঠনের মধ্যে অতি অল্প অংশ হলেও সর্ব্বত্র প্রবেশ করে আছে এবং তারা সম্পূর্ণ ভাবে সাম্য-বাদী আদর্শে গঠিত। চরম-সংগ্রামের সময় তারা সাধ্যমত প্রচার এবং প্রত্যক্ষে অভিজ্ঞ করবে সংগ্রাম-কারীদের। বৃটীশ সাম্রাজ-বাদীদের উচ্ছেদের পর রাষ্ট্র-ক্ষমতা

সংগ্রাম-কারীদের হাতেই আসবে এবং তাদের দাবী ও সত্যকার স্বাধীনতা বলতে যে রাষ্ট্র-রূপ তা জাতীয়তা-বাদে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-গঠন ব্যতিরেকে এই দীর্ঘ দিনের নির্য্যাতন-ভোগী মরিয়া-হয়ে-সংগ্রাম-করা যোদ্ধার দল সন্তুষ্ট হবে না। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, বামপন্থী জাতীয়তা-বাদী নেতা মুক্তি-ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের অনুগামীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে—তাঁর নীতি ও উপদেশ অনুসারে কাজ করেনি—তাতে বাইরে থেকেও তাঁর শক্তি দুর্ব্বল হয়েছে। অন্য দিকে দক্ষিণ-পন্থীরা ব্যক্তিগত কারণে এবং রাজ-নৈতিক কারণে তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে। আমাদের বুর্জ্জোয়াদের মধ্যে এই ভাবে বিভেদ হলে সুবিধা হবে।

জকি—কিন্তু তোমাদের পক্ষে খুব বেশী শক্তি সংহত না হলে সফলতা আনা অত্যন্ত কঠিন। জন-শক্তি বিরাট হলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্ব্বদাই তাদের বিভ্রান্ত করে—সে বিপদ বড় কম নয়।

সোফিয়া—সে-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের কাজের ধারাও বৈদেশিক ভাবে তৈরী করা, গতানুগতিক নিয়মে শিক্ষিত যুবকদের পাঠ-চক্রে সভ্য করে বা ছাত্র-সমিতি, যুব-সমিতিতে মাত্র বিদ্যা-কচ্‌-কচি পুঁথি-পড়া পাখী তৈরী করার নীতি কিছুটা বদলানো হয়েছে। রোমান্টিক ধাতের যুবকদের জন্য শুধু শ্রমিক ইউনিয়নের কাজ ও কৃষক ইউনিয়নের কাজ দিয়ে মুখে কার্ল মার্কস্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ লেনিন আউড়ে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করানোই কাজ নয়। প্রত্যেক যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত সামরিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতার পূর্ণ-শিক্ষা দেওয়া, সামরিক-বাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের ঐ পেটী-বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তিতে যে পদ-মর্য্যাদা ও নিজেদের শ্রেণীকে আলাদা করে ভাববার আকাঙ্খা পোষণ করে, কাজের মধ্যে তারা প্রত্যক্ষ করে সমশ্রেণী-ভাব আনবে। সর্ব্ব-প্রধান

উদ্দেশ্য হলো, তারা কেতাব-কীট হয়ে যে কর্ম্ম-ক্ষমতা, সংগ্রাম-কারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তার পুনরুদ্ধার হবে। ঐ সামরিক বাহিনীর শিক্ষাগার থেকে কাল্পনিক শ্রেণী-পার্থক্য তারা বাস্তব-ক্ষেত্রে উপলব্ধি করে পেটী-বুর্জ্জোয়া ভাব ভুলবে। আমরা ঐ বাহিনীর মধ্যেই পাঠ-চক্র ও বক্তৃতা-বৈঠক সৃষ্টি করেছি। সেখানে শ্রমিক-কৃষকদের স্থানও সমভাবে আছে। কৃতিত্বের দ্বারা পদ-মর্য্যাদা সামরিক নিয়মে দেওয়া হয়।

জফি—আমার কাছে তোমাদের এই কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপযোগী এবং সম্পূর্ণ সমর্থন-যোগ্য। এখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তোমাদের struggle আরম্ভ হতে কত দেরী, মনে হয়?

সোফিয়া—আজও তা বলবার সময় আসেনি, তবে খুব শীগগিরই চরম-সংগ্রামের সময় উপস্থিত হতে পারে। কিছুদিন এদিক-ওদিক হতে পারে মাত্র।

জফি—তোমরা তা'হলে নিশ্চিত যে সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদের পর তোমাদের সর্ব্বহারা নেতৃত্বে রাষ্ট্র-ক্ষমতা তোমাদের হাতে আসবে!

সিরিন—সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। যদি কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয়তা-বাদীদের হাতে ক্ষমতা যায়, তবে সে ক্ষণকালের জন্য। আমাদের নীতি, আমাদের কৌশল নির্ভুল। আমরা আমাদের আদর্শে পৌঁছুবার পথে দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রাম করে চলবো। নিরন্তর বিপ্লবের ধারায় সাম্রাজ্য-বাদী ও ধন-তন্ত্র-বাদীদের উচ্ছেদ করবো। ক্ষণিকের কোনও রকম রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আমাদের বাধা সৃষ্টি করবে না। করলে সংগ্রাম করে সে বাধা চূর্ণ করবো। আজ-রাত্রে বিভিন্ন কর্ম্ম-সূচী প্রস্তুত করতে হবে। জফি, তোমার সামরিক ব্যবস্থা-লিপি নিয়ে এবার সোফির সঙ্গে আলোচনা করো। এখানে যে সামরিক বৈঠক হবে, তাতে আমাদের ষ্ট্রাটেজী স্থির করতে হবে। জানো সোফি, আমি জফির কাছে

সম্পূর্ণভাবে হাতে-কলমে সামরিক শিক্ষা নিচ্ছি,—শুধু বই পড়েই বোঝা নয়।

সোফিয়া—সর্ব্বহারা-বাহিনীর জি, ও, সি ছিলে, এবার সুপ্রীম কমাণ্ডার হবে,—কি বলো জফি ?

সিরিন—এবার দু'খানা বই-এর নাম দিলাম, তুমি গিয়েই পাঠারে,—নূতন বই কিনতে পাবে না। মিলিটারী অফিসারদের কাছ থেকে জোগাড় করতে হবে।

সোফি—তোমার ভাই পারবেন দিতে, তিনি তো পরশু আসছেন এখানে।

সিরিন—এতক্ষণ তুমি এ-কথা বলোনি! নিজে আছো বেশ বিভোর হয়ে, অন্যের কথা ভাববার দরকার কি ? আরসাদ একা আসবে ?

সোফিয়া—হ্যাঁ। সে একাই আসবে। তারপর আর দুজন কমরেড আসবেন……মেজর আর ক্যাপটেন……। ইতি-মধ্যে আমাদের লেখার কাজ সব শেষ করে নিতে হবে।

সন্ধ্যার একটু পরেই আরসাদ এসেছে। তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বহু দিন পরে আরসাদকে পেয়ে সিরিন এমনই ভাবাতিশয্যে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল যে অন্যের সামনে চেষ্টা করেও চোখের জল চাপতে পারেনি। সিরিনকে বুকে টেনে নিয়ে আরসাদ আদর করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে কত দূরে চলে গিয়েছিল, আদর্শের সংযোজনায় আবার পাশাপাশি মিশেছে এমন করে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুজনে নীরব। সোফিয়া এবং জফি একটু দূরে সরে ছিল। বুঝেছিল, দুজনের প্রথম দেখার সময় অন্তরের যে গভীর ভাব প্রকাশ হবে, সেখানে অন্যের না থাকাই ভাল।

নীরবতা ভঙ্গ করে সিরিন বল্লে,—আরসাদ সত্যিই তোমায় এমন করে পেলাম!

আরসাদ সিরিনের হাত দুটি চুম্বন করে বল্লে,—সিরিন, তোমার আকর্ষণই আমায় অনেক দূর থেকে এনেছে। আজ তোমারই জয়।

সিরিন আরসাদের বুকে মাথা নুইয়ে দিলে—আরসাদ আদর করতে লাগলো।

সোফিয়া চা করে নিয়ে এলো। জফির সঙ্গে আরসাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হল না। জফি এগিয়ে এসে আরসাদের করমর্দ্দন কল্লে। আরসাদ জফির মুখের পানে চেয়েছিল,—সত্যই এত সুন্দর, এমন সুপুরুষ সে জীবনে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। সোফিয়া আরসাদকে বল্লে,—আবার বোনের মত ভায়েরও···। জফি একটু রাগ দেখিয়ে সোফিয়ার দিকে চাইলে। সোফিয়া বল্লে,—একটুও অপরিচিত নয়! তোমাকে না দেখলেও তোমার সব কিছুই চেনা জানা হয়ে গেছে। রাগ করবার প্রয়োজন নেই।

সিরিন উঠে এসে জফিকে বল্লে,—জফি, আরসাদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করো। তখনও তার গলার স্বর ভার হয়ে আছে, সজল আঁখি দুটিতে অভিনব ভাব ফুটে রয়েছে।

জফি গিয়ে আরসাদের পাশে কৌচটায় বসলো। নানা কথা এবং আলোচনা হল। এডা শিশুটিকে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে। সিরিন কোলে করে আরসাদের কাছে শিশুকে নিয়ে এলো। আরসাদ কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠে শিশুকে বুকে তুলে নিলে। এমন সুন্দর! এডা কই? এসো এখানে—এমন চমৎকার স্বাস্থ্য! এত সুন্দর শিশু! কতক্ষণ কাটলো শিশুকে নিয়ে। শিশুও বেশ হৈ-চৈ প্রিয় হয়েছে। মিলিটারীর হাতে তার শিশু-

জীবন স্পন্দিত চঞ্চল হতে অভ্যস্ত হয়েছে। এভাকে অনেক কথা এক নিমেষে জিজ্ঞেস করে নিলে।

রাত্রি এগারোটার সময় তিনজন সামরিক অফিসার ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছেন। এসেই ছদ্ম আবরণ খুলে স্ব-স্ব আলোচনায় যোগদান করেছেন। সামরিক কেন্দ্র ও ঘাঁটি-সমূহের ম্যাপ ও কার্য্য-সূচীর মোটামুটি একটা খসড়া ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়েছিল, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা, পরিবর্ত্তন, সংশোধন, সংযোগ ইত্যাদি হল। ক'জনেই অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ সামরিক কর্ম্ম-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেন। রাজ-নৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন বিপ্লবী দলের কর্ম্ম-সূচী নিয়েও আলোচনা হল। কি ভাবে উপযুক্ত সময়ে সংগ্রাম আরম্ভ হবে, সেটা নির্ভর কচ্ছে অবস্থা, সময় এবং সুযোগের উপর। রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতির যে দ্রুত পরিবর্ত্তন সূচিত হচ্ছে, তা থেকে সময়ের নির্দ্দেশ স্থির হল। জাতীয় সৈন্য, মধ্য-অফিসারদের সংখ্যা এবং কোন কোন্ ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যাধিক্য ও বিদ্রোহ করবার উপযোগী স্থান ও অবস্থা, সে সম্বন্ধেও আলোচনা হল।

সিরিন সশস্ত্রসংগ্রামের (Insurrection) কার্য্যসূচী পড়ে শোনালে,—শ্রমিকদের দিয়ে ধর্ম্মঘট করিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ানো নয়,—তারা অস্ত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে এসে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগ দেবে। খাজনা বন্ধ অন্দোলন করে কৃষকরা নীরবে অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করবে না, অফিসারদের সঙ্গে সংগ্রাম করে হাতিয়ার কেড়ে নেবে,—কাছারী, থানা পুলিস-ষ্টেশন আক্রমণ করবে। যে সময় সীমান্তে বহিঃসাম্রাজ্যবাদীর প্রবেশ দ্রুত চবে সেই সময় সীমান্ত থেকে বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। জাতীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে, মুক্তিফৌজরূপে সংগ্রাম করবে।

সীমান্তের সর্ব্বপ্রকার যান-বাহন সংবাদ সরবরাহ ও রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ ছিন্ন করে দেবে। এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি দ্রুত হলে সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার বাড়বে, সেই সময় পুলিশ বাহিনী ও যত জাতীয় বাহিনী আছে, তারা জাতীয় সংগ্রামে সাহায্য করবে,—সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সংগ্রাম করবে। এইভাবের বিস্তারিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী কি ভাবে কোন্ কোন্ প্রদেশে কাজ হচ্ছে সমস্তই আলোচনা হল। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে গেল। সামরিক কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহুক্ষণ সুচিন্তিত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল, সময় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমগ্র-বিদ্রোহ আরম্ভ করবার দিন ধার্য্য হবে।

সামরিক অফিসাররা এদের কর্ম্মপদ্ধতি এবং সমগ্র-বিদ্রোহের প্রোগাম জানতে পেরে খুবই উৎসাহী হয়েছেন। এমন সব দিকেই বিচক্ষণতা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সহ সংবাদ-সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে সময় ও বাস্তব অবস্থা নির্ণয়, সমস্তই তাদের আশা ও উদ্দীপনা বর্দ্ধিত কল্লে। তাদের মধ্যেও অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠেছে, সংখ্যায় যদিও অল্প, তবু সামরিক ব্যক্তিদের দৃঢ়তা অসীম!

ওদের বিদায় দিয়ে নিজেরা আবার বসলো আলোচনা করতে। সামরিক অফিসারদের আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার প্রশংসায় সকলে আশার আলো দেখে আরও পূর্ণ উদ্যমে কর্ম্ম-সূচীর ব্যবস্থা আরম্ভ কল্লে। ঘরের মধ্যে রেডিও-যন্ত্র ও ট্রান্সমিটার যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। বৈদেশিক সংবাদের আদান-প্রদান যথেষ্ট সতর্কভাবে করা হয়। এবিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ কমরেড্ বাড়ীর একটু দূরে পাহাড়ী চৌকিদারের বেশে থাকেন। এখানে জংলী পার্ব্বত্য জাতি অনেক আছে। তাদের প্রস্তুত করার জন্য কমরেডরা নিয়মিত আসেন। সিরিনরা এবিষয়ে

একেবারে কিছুই বোঝে না এই ভাব,—কমরেডরা গোপনে বেশী রাত্রে বাংলোয় আসেন। পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে বেশ ভাল ভাবে সংগঠন করা হয়েছে,—তার ব্যবস্থা-লিপি এই বাংলোতে প্রস্তুত হয়।

ভোরের দিকে সকলে একটু ঘুমিয়ে নিলে। বেলা ন'টার সময় এড়া চা তৈরী করে ওদের ঘুম ভাঙ্গালে। আজকে দিনের বেলাটা কথায় ও আলোচনায় কাটলো। সন্ধ্যার পর সোফিয়া ও আরসাদ বিদায় নিলে।

সিরিন বল্লে—আবার কবে আসবে আরসাদ ?

আরসাদ সিরিনকে আদর করে বল্লে,—সুযোগ পেলেই আসবো সিরিন! জফির কর-মর্দ্দন করে বিদায় চাইলে আরসাদ। যাবার সময় বেশ একটু ভাব-প্রবণ হয়ে গিয়েছিল, জফির হাত ধরে বল্লে,—তোমায় এ-রকম ভাবে পেয়ে আমার অন্তর ভরে গেছে। ভাষা নেই বন্ধু তোমাকে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করবার। আমি সমস্তই শুনেছি। সিরিনের মতো ঐশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বগুণ-সম্পন্না নারীর কাছেই তোমার মর্য্যাদা হবে। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে কর্চ্ছে তোমায়, কিন্তু ভাষার দীনতা—

বাধা দিয়ে সোফিয়া বল্লে,—জফির সঙ্গে কিছুদিন যদি কাটাতে পারো আরসাদ, তা হলে আর তোমার বলবার কিছু প্রয়োজন হবে না, ও সব আদায় করে নেবে।

জফিও খুব ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিল—আন্তরিক অভিব্যক্তির মধ্যে আরসাদের হাতখানা চেপে ধরে বল্লে,—যদিও এই প্রথম দেখা, কিন্তু অনেক দিনই আপন হয়ে গেছ বন্ধু, তোমার সব কথাই সিরিন বলেছে —তোমার আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। আবার মিলবো, বিরাট মিলনের মাঝে। আমাদের জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সার্থক হবে যেদিন জীবনের একমাত্র কাম্য সেই মহৎ আদর্শে পৌছুবো।

সোফিয়া ও সিরিন একাগ্র হয়ে দুই যোদ্ধার বিদায়-সম্ভাষণ উপভোগ কচ্ছিল। কতক্ষণ কেটে গেছে। নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে যে মধুর ক্ষণটি মাধুর্য্যময় হয়ে উঠেছিল, কোন ভাষায় তাকে ফোটানো যাবে না।

ওদের বিদায় দিয়ে এসে এডার চোখ দুটি জল-ভরা হয়ে উঠলো, কিছুক্ষণের জন্য সে বিছানায় আশ্রয় নিলে। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের-মমতা ও সহানুভূতি তার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে আছে, জীবনকে ওলট-পালট করে দেওয়া পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছে। সিরিন ঘরের ও বাইরের আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে বসলো জফির সঙ্গে। অতীতের কত স্মৃতি মনে পড়ে মনকে ভরে দিলে। জফি নীরবে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে,—সিরিনের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। তার মনও যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে! দুজনের প্রাণের এই সুগভীর মিলন,—কেউ কারও অতীত জানে না! দুজনই যখন পরস্পরকে একান্ত-একাকী অনুভব করে, তখন সে-ক্ষণটুকুকে মধুময় করতে দু'জনে দুজনের অন্তরের পরশ পূর্ণ ভাবে নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কতক্ষণ কেটে গেল। সিরিন মৌন ভঙ্গ করে জফিকে আলিঙ্গন কল্লে—আদর করে বল্লে,—দীর্ঘ সময় একা রয়েছ প্রিয়তম!

জফি ভাষার উত্তর খুঁজে পায় না—সিরিনকে বুক ভরে নিয়ে মিলনের পূর্ণতা অনুভব করলে।

কিছুদিন কেটে গেল,—সর্ব্বত্র আন্দোলনের দ্রুত প্রসার—যুদ্ধের অবস্থাও সঙ্কটজনক। প্রত্যেক প্রদেশেই সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে।

গ্রেফ্‌তার, গুলিচালনা, এরোপ্লেন থেকে বোমা-বর্ষণ করে আন্দোলন বন্ধ করা, শ্রমিক ধর্ম্মঘটে পুলিশ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ, গেরিলা বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণ ও তাদের কাজের জন্ম অত্যাচারিত ত্রাসিত গ্রামবাসীর ঘর-জ্বালানো—এ-সব সংবাদ প্রতিদিন পাচ্ছে। সারাদিন লেখাপড়া, জফির কাছে সামরিক শিক্ষা নেওয়া, বিরামহীন ভাবে কার্য্যতালিকা প্রস্তুত, পুস্তিকা লেখা, চিঠি টাইপ করা প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। জফিও তেমনি সারাদিন ব্যস্ত—অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত একত্র পরামর্শ। কমরেডরা এলে নব নব সংবাদ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী লেখা,—উত্তেজনা-পূর্ণ সংবাদে প্রতিদিন কাজ বেড়ে চলেছে।

কদিন ধরে সোফির কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তার খোঁজ পাচ্ছে না। বিভিন্ন প্রদেশে দলের কার্য্য-কলাপের সংবাদ সংক্ষিপ্ত ভাবে আসতে আরম্ভ করেছে, গ্রেফতার ও দমন-নীতি এড়িয়ে আর কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কমরেডরা কারারুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধের সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ। দশ হাজার জাতীয় সৈন্য একসঙ্গে ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকার করে কারারুদ্ধ হয়েছে—বহু সমর-শ্রমিক কাজ ছেড়ে দিয়েছে। দুটি বড় বড় বন্দরে ডকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছে! ধর্ম্মঘট ব্যাপক ভাবে আরম্ভ না হলেও প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু কিছু আরম্ভ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সোফি কিম্বা কোনও কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যদের সঙ্গে দেখা নেই। সিরিন দু'দিন ধরে অত্যন্ত অশান্তিতে কাটাচ্ছে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও অস্থিরতা দমন হচ্ছে না।

সারা-রাত কাজ করে ভোরের দিকে সিরিন ঘুমিয়ে পড়েছে, জফির ঘুম ভেঙে গেল, সে এসে বারান্দায় বসলো। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় দূর থেকে ভেসে আসছে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি। পাহাড়ে বসে কে গান গাইছে! জফি চমকে উঠলো—সুরটি খুব চেনা। কি চমৎকার

কণ্ঠস্বর! সিরিনের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে,—এমন মধুর সঙ্গীত এই ক্ষণটাতে তাকেও শোনাতে হবে! কে গাইছে এমন দরদ দিয়ে? উঠে ঘরের দিকে যাবে, চোখ পড়লো বাগানের বেড়ার দিকে,—দেখে, সিরিন স্তব্ধ হয়ে গান শুনছে।

ভোরের চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সিরিনের ঘুমঘোর-মাখা অঙ্গে। জফি আস্তে আস্তে পিছন থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গান থেমে গেছে,—তার রেশ তখনও ডুবিয়ে রেখেছে সিরিনকে,—সে রেশ অমর কবিতার মাঝে খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি ফিরতে গেল জফির কাছে,—মুখ ফেরাতেই দেখে, তার আকাঙ্ক্ষা-কামনা-তৃপ্তি এক হয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছে! সিরিন তন্ময় হয়ে গেল, সুরের মূর্চ্ছনা যেন জফির রূপে ভরে গেছে! সিরিন এলোমেলো ভাবে বল্লে,—কেমন করে জানলে—

জফি—যে তুমি ভোর বেলা মধুর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছ?

সিরিন—না, তা কেন! মধুময় সঙ্গীতে মুগ্ধ হলে প্রাণ যা চায়. তার সন্ধান—

জফি—আজও সে-কথা জানবার অসুবিধা থাকতে পারে? বলে সিরিনকে বাহুর আবেষ্টনে বদ্ধ করে বাংলোর মধ্যে এলো। এসে বল্লে,—কে এমন গান করছে সিরিন, বলতে পারো? আমার বড় প্রিয় সুর, একান্ত চেনা সুর!

সিরিন—আমার মনে হয়, আমাদের কোন কমরেড রাত্রে এসেছেন পাহাড়ী জাতিদের কাছে। কোন কাজে এসেছেন। থাকলে আজই জানা যাবে, কে ইনি।

দুপুরে এক কমরেডের সঙ্গে এক সামরিক অফিসার এসে সংবাদ দিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। বহিঃ-সাম্রাজ্য-

বাদী সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে এসেছে। সীমান্তের পাহাড়ী জাতি এবং জনগণ তাদের সাহায্য করেছে। জাতীয় সৈন্সরা বহু সংখ্যায় আত্ম-সমর্পণ করেছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নৌ-সৈন্সরা বিদ্রোহ করেছে, হাওয়াই-জাহাজ ও আর্টিলারি ফোর্স বিদ্রোহ করেছে। ডকে আগুন লাগানোর জন্য যে সব নাবিকদের বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের অন্যায় শাস্তির প্রতিবাদে ওরা সভা করে, সেই সময় মিলিটারী ফৌজ দিয়ে তাদের ওপর গুলি চালানো হয়, এর পর বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কট-ময়।

কমরেড এম এসেছেন। তিনি বল্লেন, দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের বিপ্লব আরম্ভ হবে। ইতিমধ্যে তোমরা প্রস্তুত হও। সামরিক-বাহিনী পরিচালনার সর্ব্ববিধ সমর-সজ্জা এবং নীতি স্থির করবার জন্য কাল রাত্রে এখানে সকলে মিলিত হবো। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত—সময়ও উপস্থিত। বাইরের সংবাদ সমস্তই ভাল। সময় সম্বন্ধে আমরা জানাবো, এবং সেই মতো সৈন্স ও অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের আসবে। ইতি-মধ্যে বহু সৈন্সসহ অস্ত্র ও সমর-সজ্জার সামগ্রী পার্ব্বত্য পথে এসে পৌচেছে, জলপথেও আসবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিরিনরা এ সংবাদ গত রাত্রেই ট্রান্সমিটার-যোগে জেনেছিল। বাইরের কমরেডদেরও জানাবার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে।

সিরিন বল্লে,—তোমরা আর দেরী না করে ফ্রন্টে যাও এবং যেমন করে হোক আজকের মিটিংএ এখানে ওদের আসতে বলে এসো। আমাদের আর দেরী করবার সময় নেই।

রাত্রে বড়-রকমের পরামর্শ-বৈঠক, পার্টির নির্দ্দেশ ও কর্ম্ম-সূচী সমাধা হল। সামরিক বিপ্লবী সমিতির সর্ব্বাধিনায়কত্ব জফির ওপর অর্পিত হল।

স্থল-সৈন্য এবং আর্টিলারী সামরিক বাহিনীর কর্ত্তৃত্ব আরসাদের ওপর, সিরিনকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-সীমান্তে জল-স্থল-ব্যোমে সংগ্রাম পরিচালনা এবং সুপ্রীম কমাণ্ড দেওয়া হলো। সোফিয়ার উপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সমর-পরিচালনা ও কমাণ্ড দেওয়া হলো। এডা জানালো—আমার শিশুর ভার যে মেয়েটী বৃদ্ধার পরিচর্য্যা করে, তার উপর দিয়ে আমিও কাজে যোগ দিতে চাই। আমি সমর-ক্ষেত্রে যেতে চাই যুদ্ধ করতে। সামরিক কাজে আমায় তৈরী করে নাও।

সিরিন আতিশয্য-ভরে এডাকে আদর করে টেনে নিয়ে বল্লে,—তোমার কথায় মনুষ্যত্ব আর মাতৃত্বের প্রকৃত পরিচয় পেলাম। তোমার শিশুর ব্যবস্থার জন্য আমি আরও ভাল লোক ঠিক করবো। তাঁর নিজেরও একটি সন্তান আছে, মন বেশ উঁচু। তাঁকে আজই এখানে আনতে পাঠাচ্ছি। শিশুকে তিনি বুকে করে রাখবেন। তিনি আমার আত্মীয়া এবং দলের সদস্য। কর্ত্তব্য এবং হৃদয়-বৃত্তিতে তিনি আদর্শ রমণী।

এডা উৎফুল্ল হয়ে আরসাদের কাছে ছুটে গেল। আরসাদ তাকে আদর করে বুকে টেনে নিলে। তারপর মেজর···এম-এর হাতে এডার শিক্ষার ভার দিলে। মেজর সাগ্রহে এডার ভার গ্রহণ কল্লেন। পরদিন আরও ক'জন মেয়ে-কমরেড এসে মিলিত বৈঠকে যোগ দিলেন। আজ রাত্রে এদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সামরিক কার্য্যভার অর্পণ ও গ্রহণ করা, নিজ নিজ রেজিমেন্টের নাম-করণ এবং শপথ-গ্রহণ পূর্ণ সামরিক প্রথায় এ-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে। অন্যান্য জায়গায় কমরেডদের জন্য সিদ্ধান্ত ও কর্ম্মভার-প্রেরণ, দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদনে এ-সমস্ত ব্যাপার স্থির হলো। সর্ব্বহারা বিপ্লবের নীতি সাম্য-বাদী আদর্শের নিষ্ঠায় এবং দৃঢ়তায় এঁরা শপথ করলেন। দলের কাছে এ-সব, অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে বিপ্লবী সামরিক-সমিতির কাছে সামরিক স্বাক্ষর-লিপিতে স্বাক্ষর

করা হল। সম্পূর্ণ সামরিক-অনুষ্ঠানে রাত্রে ভোজনের ব্যবস্থাও হল। ভোজনের পর দায়িত্ব এবং সামরিক পদ-মর্য্যাদা অনুসারে পোষাক এবং বিভিন্ন বাহিনীর চিহ্নিত পদকে (applate) প্রত্যেকে সজ্জিত হলেন।

রাত্রি-শেষে বিভিন্ন-স্থানের কমরেডরা বিদায় নিলেন। বিপ্লবী-সামরিক-বাহিনী সম্পূর্ণ-ভাবে গঠিত হয়ে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। প্রতি-ঘণ্টায় রেডিও-মারফৎ অবস্থার ক্ষিপ্র গতির সংবাদ আসছে। সহর-গ্রাম-নগর সর্ব্বত্র জনগণ সংগ্রামে উদ্যোগী। সেখানে যেভাবে প্রস্তুতি ছিল, সেখানো খণ্ড-ভাবে বা ব্যাপক ভাবে সোভিয়েটের নির্দ্দেশে সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রদেশে ও জেলায় সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক ও কপর্দ্দক-হীন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মিশ্রনে মিলিটারী-বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রাম পরিচালনার ভার তাদের উপর ন্যস্ত। গ্রামে বা জেলাতে সংগ্রাম করে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলে থানা, কাছারী, বিচারালয় অধিকার করবার পর তারা পঞ্চায়েত গঠন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনা করবে। যতদিন না কেন্দ্রে গণ-পরিষদ গঠিত হয়, ততদিন প্রথমে জেলায় তারপর প্রদেশে জনগণ তাদের পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব মেনে কাজ করবে সেই মতো। সাম্য-বাদী সঙ্ঘের নীতি ও কর্ম্ম-সূচী অনুযায়ী ঐ সব পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। সংগ্রামের গোড়া থেকেই তাদের কাছে বিস্তৃত-ভাবে ব্যবস্থা-লিপি দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি সর্ব্বহারা বিপ্লবী-বাহিনীর সৈনিক ও মধ্য অফিসার, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংগ্রাম-কারী (revolutiouary fighters) সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন হয়ে সংগ্রামে যোগ-দান করবে। কোন মতে তারা বিভ্রান্ত না হয়, প্রতারিত না হয়, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের শিক্ষা, তাদের প্রতিজ্ঞা-লিপি, স্বাক্ষর-লিপি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীর পাশমুক্তি-সংগ্রামে যে-ভাবের ত্যাগ ও উৎসর্গ বিপ্লবীরা

করবে, জনগণকেও সেই ভাবেই অত্যাচার সহ্য করতে হবে। তারা যেন আর এক বিশ্বাস-ঘাতক ধন-তন্ত্রীর কাছে আত্মবলি না দেয়! সম্পূর্ণ চার্ট সহজ সরল ভাবে এগারোটি ভাষায় লিপিবদ্ধ হল।

বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয়তা-বাদীদের হাতে বিপুল শক্তি এবং বাম-পন্থী জাতীয়তা-বাদী নেতার সামরিক নেতৃত্বে সমর-সম্ভারও বহু-সংখ্যক। জাতীয়তা-বাদী সামরিক অফিসার এবং সৈন্য দ্বারা মুক্তি-বাহিনী গঠিত সে দিকে আমাদের অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। দেশের জনগণ সংগ্রাম করবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদের জন্য জাতীয়তা-বাদী নেতা বহিঃ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে যে চুক্তি ও সর্ত্ত করেছেন, তা তাঁর নিজের দাযিত্বে করা হয়েছে। দেশের অজ্ঞ জনগণ তাঁকে নেতা নির্ব্বাচন করে নি। এবং বিভ্রান্ত রাজ-নীতিবিদগণও কোন সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করে তাঁদের মতামত দেননি বা মুক্তি-ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের পক্ষেও সব অবস্থা জানানো সম্ভব হয়নি। এই কারণেই গণ-সংগ্রামে সচেতন সংগ্রাম কারীরা জাতীয়তা-বাদী নেতার সংগ্রামে সহায় হবে, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-স্থাপন সম্ভব হবে না। সে সময় তিনি সামরিক ক্ষমতার প্রয়োগে দেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা করতে পারবেন না। আমাদের বিপ্লবী সঙ্ঘ জনগণের স্বার্থে গণ-পরিষদের শ্লোগান এবং প্রচার দ্বারা দেশের জনগণকে সচেতন করবে। এই ভাবের ব্যবস্থা-লিপি ইস্তাহার কার্য্য-সূচী বিস্তারিত ভাবে প্রস্তুত করে তখনি ছাপাখানায় পাঠানো হল।

বিপুল কাজের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ তৎপরতা এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনার সংবাদ, যুদ্ধের সংবাদ সিরিনকে অধীর করে তুলেছে। অফিসেও বিরামহীন কাজ—এ সময় ছদ্মবেশে নানা লোকের আসা-যাওয়া।

সোফিয়ার কোন সংবাদ নেই। সিরিন অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। জফি রেডিওর সংবাদ যথানিয়মে সিরিনকে শোনাচ্ছে। রণকৌশলের গভীর আলোচনায় সিরিন জফির সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, এমন সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির এবং জটিল সমস্যার সংবাদ এলো। ওরা বসলো সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা স্থির করতে। পর-মুহূর্ত্তে সংবাদ এলো রেলওয়ে-শ্রবিকদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট। কঠিন বাস্তব অবস্থার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। কোথা দিয়ে দুপুর কেটে গেল—সন্ধ্যায় স্নান সেরে সারাদিন পরে চা খেতে বসেছে—আবার দূর থেকে সেই ভোরের সঙ্গীত! সিরিন চমকে উঠলো। জফি বল্লে,—সিরিন একাধারে তোমার এই কঠিন বাস্তব-বাদ কঠোর কর্ম্মরত শ্রম, গবেষণা, কূট তর্ক আর সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্য-পিপাসা,—এ-সময়েও মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি তোমায় মুগ্ধ কল্লে,—আশ্চর্য্য তুমি!

সিরিন চায়ের পেয়ালা শেষ করে উত্তর দিলে—তোমার বিশেষত্বগুলো অনুভব করতে পারো না বুঝি? সেই ক্যাম্পের দিনগুলো থেকে আজ পর্য্যন্ত যা পাচ্ছি, আমাকে বিস্ময় ছাড়া আর কি দিচ্ছ?

দূরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। জফি বল্লে,—একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ-শব্দ যেন একটু অন্য রকম লাগছে। কনভয়ের শব্দ! ভিতরের দিক থেকে বায়নাকুলার দিয়ে দেখলে, কখানা সামরিক যান পর-পর। কোন সংবাদ নেই অথচ কি ভাবে ব্যবস্থা হতে পারে? প্রস্তুত হয়ে রইল সঙ্কট-ক্ষণের জন্য। একখানা মোটর বাইক বাংলোর দ্বারে এসে সঙ্কেত জানালে। নিশ্চিন্তে ওরা বেরিয়ে এলো। সোফিয়া এসেছে বাইকে আরসাদের সঙ্গে।

সোফিয়া বাইক থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এলো। সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে,—এই প্রদেশে সর্ব্বত্র সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। সহরে সশস্ত্র

বিপ্লব, যান-বাহন বন্ধ, রেলওয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘট,—ডকের অবস্থা শোচনীয়। বহিঃ-সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণে বৃটিশ সৈন্যরা বিপর্য্যস্ত। জাতীয় সৈন্যরা রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বাধা দেবার জন্য গুলি চালনার আদেশ অগ্রাহ্য করায় তাদের ওপর শাস্তির ব্যবস্থা হয়, সেজন্য তারা ব্যারাকে বিদ্রোহ করে। সেখানে গুলি চলে, বহু হতাহত হয়। সেই সংবাদ অন্যান্য ক্যাম্পে যাবা মাত্র সেখানেও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। এদিকে জনগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে,—সম্পূর্ণ ভাবে। গ্রামে-গ্রামে থানা আক্রমণ করেছে,—তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে থানার লোকদের বন্দী করেছে, হত্যা করেছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে বিদ্রোহীরা সহরে পূর্ণমাত্রায় সশস্ত্র-বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে। অত্যাচার, সামরিক বাধা— এ-সবে তাদের আতঙ্ক নেই। টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে। দেশীয় সৈন্যদের সাহায্যে একটা আর্টিলারী ইউনিটের সম্পূর্ণ রণসম্ভার বিপ্লবী সংগ্রাম-কারীদের অধিকারে এনে দিয়েছে ঐ যোদ্ধারাই। সামরিক কৌশলে অস্ত্রচালনা করে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সংগ্রাম কচ্ছে। ······জাতীয় রেজিমেণ্টের অফিসাররা প্রতীক্ষা কচ্ছেন আমাদের অভিমত ও সংগ্রাম-পরিচালনার পরামর্শ-বৈঠকের জন্য। শীঘ্র তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। এ জায়গা সম্পূর্ণ আমাদের অধীনে। এখানকার সমস্ত পার্ব্বত্য জাতি সমবেত ভাবে সমর-সজ্জায় সজ্জিত। বিপ্লবী সমর-পরিষদ দ্বারা তাদের রেজিমেণ্ট গঠিত হয়েছে। আমাদের লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল এন্‌ ওদের অধিনায়কত্ব কচ্ছেন। সামরিক পরিচ্ছদে চলো জফি,—তোমার সুনিপুণ সমর-শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সমর-কৌশলের পূর্ণ পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত।

অতি সত্বর ওরা প্রস্তুত হয়ে সামরিক পরিচ্ছদে রওনা হল। জফির কণ্ঠে আন্তর্জাতিক সমর-সঙ্গীত প্রাণ-মাতানো সুরে উচ্চারিত হল—

সমবেত ভাবে ওরা আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত করতে করতে মোটরে গিয়ে উঠলো।

সামরিক বিপ্লবী সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত স্থির করে প্রত্যেকের রণক্ষেত্র, সামরিক পরিচালনা, নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে। দুটি প্রদেশ বহিঃসাম্রাজ্যবাদীর অধিকারে—সেখানকার রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হস্তচ্যুত। জাতীয় সৈন্য ও মুক্তিফৌজের কর্তৃত্ব সাময়িক দিক দিয়ে হলেও জনগণের দ্বারা স্থাপিত পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে, এবং সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী-সঙ্ঘের নেতৃত্বে। পূর্ব্ব-সীমান্তে সংগ্রামের রূপ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করেছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রচণ্ড বাধাদানের মুখে জাতীয় সৈন্যরা পর্য্যুদস্ত। যান-বাহনের পথে বাধা সৃষ্টি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর রসদ এবং সমরাস্ত্র প্রেরণের পথ বন্ধ করেছে, অরণ্য গিরি-সঙ্কট—পথ অতি-সঙ্কীর্ণ, অবরোধের চেষ্টা করে জাতীয় সৈন্যদের পরাজিত করবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে। বিমান-পথে বিরামহীন বোমা-বর্ষণ, অন্যান্য রণক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন। এই রণক্ষেত্রে পরাজয় হলে আর উপস্থিত জয়ের আশা নেই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র এটি। কোন ক্রমে সমর সম্ভার পৌছানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে সর্ব্বাগ্রে রেডিও-যোগে সংবাদ প্রেরণ সত্ত্বেও সঙ্কটাপন্ন গিরি-পথ অতিক্রম করে আসা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য রণক্ষেত্রের সাফল্যের সংবাদও যোদ্ধাদের মনে শক্তি সঞ্চার করতে পাচ্ছে না। প্রত্যেক রণ-ক্ষেত্র জয় সুনিশ্চিত কিন্তু সর্ব্ব-প্রধান এবং অত্যন্ত কঠিন রণ-ক্ষেত্র এটা। সিরিন শিবির থেকে সমস্ত সংবাদ পাচ্ছে—সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত। মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেও তারা প্রতি-পক্ষের সমরাস্ত্রের কাছে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। এমন সময় সিরিন সংবাদ পেলে, জাতীয়তা-বাদী বাম-পন্থী নেতা

বিরাট ফৌজ ও সমর-সম্ভার নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব দু-একটা সীমান্ত অতিক্রম করে এসে পৌছুবেন। সমর-ক্ষেত্রে জয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সময় কেটে চলেছে। কোন সাহায্য এখনও এসে পৌছায়নি। সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ কচ্ছে। অস্ত্রহীন অবস্থায় সংগ্রাম আর সম্ভব নয়। রশদ নেই। সিরিন এ সময় রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রেডিও-যোগে সৈন্যদের বল্লে,—এখনি তোমরা আত্ম-সমর্পণ করো, অনর্থক মৃত্যু-বরণ করা সঙ্গত হবে না। অতি-সত্বর জাতীয়তা-বাদী নেতার অস্ত্র-সাহায্য এবং ফৌজ সহ আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছি। আত্ম-সমর্পণের অল্প সময় পরেই আমরা জয় লাভ করবো। রসদ সমর-সম্ভার ও ফৌজ এসে পরাজিত করবে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীকে, তখনই তোমরা মুক্ত হবে। দুটি সমর-ক্ষেত্রে আমাদের জয় হয়েছে। রাজ-নৈতিক আন্দোলন সফল হয়েছে। পাশা-পাশি তিনটি প্রদেশ সম্পূর্ণ ভাবে সাম্রাজ্য-বাদীর কবল-মুক্ত। প্রদেশে প্রদেশে বিদ্রোহ সর্ব্ব প্রদেশের কারাগার চূর্ণ করে সমস্ত বিপ্লবীরা বেরিয়ে এসে সৈনিক শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামে সহযোদ্ধা আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত। ক্ষণকালের জন্য আত্ম-সমর্পণ করো।

বিপ্লবী সৈন্যরা আত্ম-সমর্পণ করেছে। সিরিন শিবিরে ফিরে যাবার সুযোগ পেলেনা—সামনের মোহানায় গিয়ে জল পথে অন্যত্র যাওয়া স্থির করে এগিয়ে চলেছে। অজস্র বোমা-বর্ষণ—কামানের গোলায় সর্ব্বত্র ধূমাকীর্ণ। মোহনার কাছে এসে দেখলে সাম্রাজ্য-বাদীর কজন সৈন্য আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসছে।

পথের মোড় ঘুরে ভিন্ন পথে এগিয়ে চলেছে, অতর্কিতে একটা গুলি এসে বাঁ-হাতে লাগলো—সাংঘাতিক না হয়ে হাতের খানিকটা মাংস

ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেল। কিন্তু গন্তব্য স্থানে যাবার উপায় নেই, সামনেই শত্রু। ইউনিফর্ম্ম খুলে ফেলে দিয়ে ভিতরের পোষাক আবরণ মাত্র রেখে জলে ঝাঁপ দিলে সিরিন। ধোঁয়ায় অন্ধকার। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—কেউ দেখতে পেলেনা। সাঁতার কেটে চলেছে। কত দূর গিয়ে দেখতে পেলে, ছোট একখানা লাইফ-বোট আসছে। সিরিন একবার ডুব দিলে, তার পর ভেসে উঠে দেখে, ডিঙ্গিখানা একেবারে সামনে। বিপদকে বরণ করে উদ্ধার হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করে উপস্থিত বুদ্ধি সঞ্চয় কল্লে। ডিঙ্গিতে চারজন ইংরেজ ও কানাডিয়ান সৈন্য ছিল। তারা সিরিনকে জল থেকে তুললে। আলো ফেলে দেখলে, মেয়ে। তারা নানা মন্তব্য করতে লাগলো—সিরিন কিছুই বুঝতে না পারার ভাণ কল্লে। হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা কল্লে—বোমা-বর্ষণের ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তারা বল্লে,—কোন ভয় নেই। সিরিন ইশারা-ইঙ্গিত করে বল্লে,—এই গ্রামে আমায় পৌঁছে দাও—আমি ঐ গ্রামের মেয়ে। তারা অত বুঝলে না, বল্লে,—আচ্ছা চলো। আঘাত লাগেনি? সিরিনের এতক্ষণ জলে সাঁতার দেবার পর হাতের রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। অত্যন্ত অসহায় ভয়-বিহ্বল ভাবে ইঙ্গিতে করুণা ভিক্ষা কল্লে। তারা বললে, কোথায় পৌঁছুতে হবে বলো? সিরিন দেখিয়ে দিলে,—তীরে নামিয়ে দাও, গ্রামে যাবো।

তারা বেয়ে চললো ডিঙ্গি। খানিক দূরে গিয়ে গ্রামের মিটমিটে আলো দেখতে পেলে। সমর-ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। তীরে নামিয়ে বললে,—একা যেতে পারবে এই অন্ধকারে? সিরিন আবার তেমনি ভয়-পাওয়া ভঙ্গিতে বললে,—কি করবো না হলে? তারা বললে, —চলো আমরা পৌঁছে দেব। সিরিন বললে,—এই সামনের বাড়ীতে পৌঁছে দিলেই হবে। সিরিনকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ওরা রসিকতা করতে

লাগলো। একজন তার গায়ের সার্টটা খুলে সিরিনকে দিলে পরতে—সিরিন ধন্যবাদ জানিয়ে সার্টটা গায়ে নিলে।

গ্রামে ঢুকে দু'তিনখানা বাড়ী পেরিয়ে এক ছুতোরের কুঁড়েয় প্রবেশ করলে। সৈনিকরা বললে,—এবার আমরা যাই। সিরিন একটু অপেক্ষা করতে বল্লে। ভিতরে গিয়ে ছুতোরদের সঙ্গে কি কথা বল্লে, তারপর একটা মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে এসে ইঙ্গিতে বল্লে,—আমার এত উপকার করেছ—একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। একটু ভিতরে এসো।

ওরা ভিতরে গেল। সিরিন আপ্যায়িত করে ঘরের দাওয়ায় বসালে এবং একটু চা খেতে অনুরোধ কল্লে। তারা পরস্পরে বলা বলি কল্লে,—মন্দ কি?

চা আর সামান্য কিছু খাবার এনে ওদের খেতে দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে ক'জন লোক এসে ওদের তিনজনের রিভলভারগুলো কেড়ে নিলে। তিনজনেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সিরিন তখন অত্যন্ত মধুর সম্ভাষণে তাদের ভাষাতেই বল্লে,—বীর সাহসী সৈনিক তোমাদের উপকার জীবনে ভুলবোনা। তোমরা আজ আমাদের কাছে প্রকৃত পুরস্কার পাবে। মানুষের কাছ থেকে মানুষ যে-পুরস্কারে সম্মানিত হয়, আমি তাই দেব এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

তারা কেমন যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল, এ কি কাকে পরিত্রাণ করলাম? সিরিন আবার বল্লে,—এখন তোমরা অত্যন্ত উত্তেজিত, কথা ঠিক বুঝবেনা। একটু প্রকৃতিস্থ হও, তখন বুঝতে পারবে। তারা বল্লে,—আমরা ফিরে যাবো এখন। সিরিন বল্লে,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমরা ফিরে যাবে। এই দানবী হত্যা-লীলা-ভূমি থেকে ফিরে যাবে। প্রকৃত শান্তিময় মধুময় গৃহে ফিরে যাবে সৈনিক! তোমরা জানো না, তোমরা বুঝতে পারো না, তোমরা কি কর্চ্ছো! কেন কর্চ্ছো। কোন্ সার্থকতায় তোমাদের মূল্যবান জীবনকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ধ্বংশ হয়ে যাচ্ছো? তোমরা দেশ ও জাতির আধফোটা ফুল। কিশোর জীবন সবে মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে—এ জীবন কি ধ্বংশ করবার? না, ধ্বংশ হবার?

ওরা তিন জনে চেয়ে আছে নির্ব্বাক! উত্তর দিলে না। সিরিন আবার বল্লে,—সৈনিকরা বসো, আমি তোমাদের আন্তরিক ভাবে এ-সব কথা বলছি। এখন তোমরা বুঝতে পারবে না। কারণ তোমরা অত্যন্ত উত্তেজিত।

একজন প্রশ্ন কল্লে—তবে কি আমরা শত্রুর হাতে বন্দী?

সিরিন বল্লে,—শত্রুর হাতে বন্দী নও, মানব-সমাজের প্রকৃত হিতৈষী অতিথি তোমরা। আজ যে-নীতির অনুসরণে অনর্থক তোমরা হত্যা করে চলেছো, আমরা সেই নীতির চির-অবসান ঘটাবার জন্য সংগ্রাম করছি। আমরা সাম্য-বাদী, আজ আমাদের এই সংগ্রামের জয়ে শুধু আমাদের দেশের কয়েক জন মাত্র লোক স্বাধীনতার রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণকে প্রতারিত করবেনা। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী মানুষের মতো বিশ্ব-দরবারে পরিচয় দেবার মতো রাজ-নৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করে সারা বিশ্বে সাম্য-বাদ প্রতিষ্ঠা কল্লে বিশ্ব-বিপ্লবের সংগ্রামে সৈনিক হবে।

সিরিন আর কিছুই বল্লে না। তাদের বিশ্রামের জন্য সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দিলে,—বল্লে,—কোন চিন্তা করো না। তোমাদের যথারীতি সম্মান দিয়ে আমরা তোমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

সেই রাত্রেই সে নিকটবর্ত্তী সঙ্ঘের অফিস থেকে সমস্ত সংবাদ আনবার জন্য লোক পাঠালে।

পরের দিন দুপুরে সংবাদ জানলো, বিভিন্ন রণ-ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ জয় এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল হয়েছে। সিরিনের আত্ম-সমর্পণ আজ্ঞা দেবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা ফৌজ ও সমর-সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়ে সাম্রাজ্য-বাদী বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবীরা জয়-পতাকা উড়িয়েছে পঞ্চায়েত অফিসে রক্ত-পতাকা উড্ডীন করেছে। নগরে নগরে বিজয়োৎসব—রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্ত্তৃত্বের উপর। সর্ব্বহারা-বিপ্লবী সামরিক সমিতির সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। এই সমর-পরিচালনা ও

সমর-কৌশলের সুপ্রীম কমাণ্ড ছিল জফির। প্রত্যেক রণক্ষেত্রের কমাণ্ডার ও জেনারেল এবং উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সম্মেলন হয়েছে। বামপন্থী জাতীয়তা বাদী নেতাকে সম্বর্দ্ধনা করে সামরিক সম্মান দিয়ে এই সভায় আহ্বান করা হয়েছে। সামরিক কর্তৃত্ব এখন কিছুদিন চলবে। সত্বর গণভোটের উপর নির্ব্বাচনে গণ-পরিষদ গঠন করবার প্রস্তাব হয়েছে; সর্ব্বহারা বিপ্লবী দল সেই নির্ব্বাচন-ব্যবস্থায় অগ্রণী।

সকলে মিলিত হয়েছে,—জফির এত-বড় সম্মান, এত-বড় সাফল্যের জন্য সকলের কাছে অভিনন্দিত, প্রশংসা-বন্দিত। আরসাদ সোফিয়া দু'জনেই প্রত্যেক রণক্ষেত্রের সফলতা ও বিজয়-গৌরবের মাল্যে বিভূষিত। জফির মুখে বিষাদ-কালিমার ছাপ—জলে ঝাঁপ দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা ওরা জানতে পেরেছে। সিরিনের বিচক্ষণতার ক-ঘণ্টার জন্য মাত্র আত্ম-সমর্পণ করায় বৃহৎ রণক্ষেত্রের জয় এবং সমস্ত সমর-কৌশল, যুদ্ধ সজ্জার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সকলের প্রশংসায় অভিনন্দিত কিন্তু তার পর সিরিনের আর কোন সংবাদ কেউ জানে না! শত্রু হস্তে বন্দী? নিহত? কোন সংবাদই নির্ভর-যোগ্য নয়।

সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হল। সামরিক কর্ত্তৃত্বে দেশের উপস্থিত ব্যবস্থা-ভার ছয়জন কমাণ্ডারের একটি কমিটি গঠিত করে তার উপর ন্যস্ত হল। সিরিনের স্থান শূন্য—সকলেরই ধারণা, সিরিন জীবিত। ছয় জনের মধ্যে তার নাম ধার্য্য হয়েছে। জাতীয়তাবাদী নেতার স্থান ঐ ছজন কমাণ্ডারের মধ্যে সসম্মানে দেওয়া হল। জফির অবসর-হীন দিবস আর রাত্রি—এবং বসে নিজের কথা চিন্তা করবার মুহূর্ত্তে অবসর নেই। এত-বড় সম্মান, এতখানি সাফল্য আজ তাকে পূর্ণ করতে পাচ্ছে না। নগরে নগরে বিজয়োৎসব। সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ, প্রাসাদে, কুটীরে সর্ব্বত্র রক্ত-পতাকাও জাতীয় পতাকা উড়ছে। সর্ব্বত্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। সন্ধ্যায় আলোক-সজ্জায় সজ্জিত গ্রাম নগর বিজয়-আনন্দকে প্রদীপ্ত করেছে। সামরিক অনুষ্ঠানে বিজয়োৎসবের দিন ধার্য্য হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্ব্বহারা বিপ্লবীদের সে উৎসবে যোগদানের

জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এই সময় সাম্যবাদীদের একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সংযোজনা বাস্তব ভাবে কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থার উদ্যোগ এবং সর্ব্ববিধ আয়োজন সিরিন সংগ্রামের আগেই লিপিবদ্ধ করেছিল।—সে সময় অবস্থা ও পরিস্থিতির অনুযায়ী যা করা সম্ভব হয়নি তাকে এখন কার্য্যকরী করবার সুযোগ উপস্থিত। প্রত্যেকটি সুচিন্তিত কার্য্য-সূচী আন্তর্জাতিক দূরদৃষ্টি দ্বারা লিপিবদ্ধ। প্রতিপলে প্রত্যেক কমরেড সিরিনের অভাব অনুভব কচ্ছে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সৈন্য শিবিরের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা সম্পন্ন করে জফি শিবিরে ফিরেছে। সেখানে কাজের স্তূপ নিয়ে কজন অপেক্ষা কচ্ছিল। পরদিন দুপুরে আবার ব্যবস্থা বৈঠকের মিটিং, প্রয়োজন। রাত্রের পোষাক বদলে জফি শ্রান্ত দেহ বিছানায় লুটিয়ে দিলে। শয্যা কণ্টকময়। এতদিন শয্যার সঙ্গে সম্বন্ধ খুব অল্পই ছিল, বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। আজ আর সহ্য করতে পারে না—সিরিন নেই? সেই প্রথম দিনের দর্শন থেকে আজ পর্য্যন্ত,—আকাশ-পৃথিবী-সাগর-ভূধর সর্ব্বত্র সিরিন মিশে গেছে জফির সঙ্গে এক হয়ে। জীবনের গতিকে কোন পথে ঘুরিয়ে, কত-বড় সার্থকতা,—মহৎ আদর্শবাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবার উপযুক্ত করিয়েছ তুমি প্রিয়তম! আমার আজ যা কিছু সার্থকতা, যত-কিছু কৃতিত্ব, সে তোমারই জন্য। এই দিনে তোমায় হারালাম?

সোফি বলেছিল,—"অসম্ভব জফি, সিরিন নিশ্চয় ফিরে আসবে। প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রের সৈন্য তাকে চাইছে। আমাদের সন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নি জফি, সে ফিরে আসবেই।

সোফির কি দৃঢ় বিশ্বাস! —সিরিন আমার, সাধনার সম্পদ আমার, জীবনে সর্ব্বস্ব তুমি, তোমাকে হারিয়ে আমি কেমন করে এই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করবো?

আর পারে না জফি--ছুটে বাইরে এলো,—বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলো। শীতের অবসানে বসন্তের ভোরাই বাতাস। রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় ভরা—দূরে ধূ ধূ কচ্ছে বালি। সামনে দিয়ে পথ

বহু-দূর-প্রসারী! জফির বুকের বেদনা তার আরও অসহনীয় করে দিলে সামনের ধূ-ধূ করা বালুময় মরু-প্রান্তর! জফি ভাবছে, আমায় আজ পাথরের চাইতেও দৃঢ় হয়ে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে হবে।—একবার এসো প্রিয়, আমায় শক্তি দাও! এ-সময় তোমায় হারালে, আমার সবই ব্যর্থ হবে, সব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঘরের মধ্যে গেল, আবার তখনি বাইরে এসে দাঁড়ালো, এমন অধীরতা তার জীবনে ঘটেনি।

দূরে একখানা মোটর-বাইকের শব্দ। জফির মনে হল, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে যা কিছু বহন করে আনবে, সে সবই সিরিনের বার্ত্তা! গাছের পাতা, পাখীর গান বাতাস সব কিছুই সিরিনের বার্ত্তা শোনাচ্ছে।

মোটর-বাইক থেকে একজন অফিসার নেমে এসে একখানা শীল করা খাম দিলে জফির হাতে। ঘরের মধ্যে আলোর কাছে নিয়ে গেল খুলতে—মনের চঞ্চলতায় বুকের স্পন্দন অভাবনীয়। খাম খুলেই—চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না,—এ কি, সিরিনের হাতের লেখা—

"জফি, আমি ভাল আছি। কাল সকালেই পৌঁছুবার তোমার কাছে।"

জফি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন কল্লে অফিসারকে,—কখন রওনা হয়েছে? কোথায় আছে?

অফিসার বল্লে,—পথে আটকে পড়েছেন। তাই আমায় বাইক দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন দূরে তাঁর মোটর আসছে, শীগগিরীই পৌঁছুবেন।

জফি মোটর-বাইকটা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল—তখন সিরিনের মোটর খানা চোখের সামনে এসে পড়েছে। ভোরের আধ-আঁধার-ভরা আলোতে দেখা গেল সিরিনকে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে জফির মোটর-বাইকের গতিও হলো অতি মন্থর?

সিরিনের প্রকাণ্ড সামরিক মোটর এগিয়ে এলো জফির মোটর-বাইকের সামনে। জফির অজ্ঞান্তেই মোটর-বাইকে ব্রেক্ করে থেমে গেছে। সিরিন বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে জফিকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। কতক্ষণ দু'জনের এই সংজ্ঞাহীন আলিঙ্গনে অন্তর-বিনিময় হল। উষাঙ্গিনীর

অন্ধকারাবরণ মুক্ত হয়ে অরুণোদয়ের রশ্মি এসে সিরিন ও জফিকে অভি-সিঞ্চিত করলে। সিরিন মুখ তুলে বল্লে,—জফি, এই যে নব অরুণোদয় আজ আমাদের অবগাহন করালো এই অকল্পনীয় পুনর্মিলনের দিনে—এই অরুণোদয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সার্থকতার আভাস পাচ্ছি।

জফি বললে—সমাজের চরম অসন্তোষ যে আগ্নেয় গিরির অগ্নিশিখা বহন করে, সেই কিশোর বয়স থেকে দুর্দ্দান্ত ভাবে তুমি সংগ্রাম করেছ, কোথাও সে আগুন নির্ব্বাপিত হয় নি,—বন্দীশালা থেকেও তার ফুলকি ছড়িয়েছো নিষ্পেষণে-শুষ্ক মানুষের বুকে। সেই অগ্নিকণা আজ সারা সমাজে লাভার স্রোত বহিয়ে দিয়েছে—প্রথম পর্য্যায এই সুরু—এখন বিরাট সংগ্রামের জন্য নব-শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে! আংশিক ভাবে দেশের কয়েকটা স্থানে সোভিয়েট গঠন হয়েছে মাত্র, দেশের ধনিকশ্রেণী জমিদার এবং রাজারাজড়ারা এখন সঙ্ঘবদ্ধ হবে, সাম্রাজ্যবাদীর সাহায্য নেবে,—সেই সংগ্রামের জন্য আজ প্রস্তুতির প্রয়োজন!

সিরিন বল্লে,—নিরন্তর বিপ্লবের ধারায সে কর্ম্মসূচী প্রস্তুত। আমরাও প্রস্তুত হয়ে আছি। যে আগুনের ফুলকি ছড়ানো হয়েছে, তা দাবানলে পরিণত হবে—নির্য্যাতন আর শোষণ-শুষ্ক সর্ব্ব-স্তরের জনগণের মলিন আবর্জ্জনা ভস্মসাৎ করে সে দাবানল সকলকে মানুষ করে তুলবে।

পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় আভাস! আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আজিকার এ রক্তমাখা মেঘ আরো গভীর আরো উজ্জ্বল!

শেষ

